প্রকাশিকা :
প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা
সম্পাদিকা,
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল
৫, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

১ম সংস্করণ, ১৯৬০

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

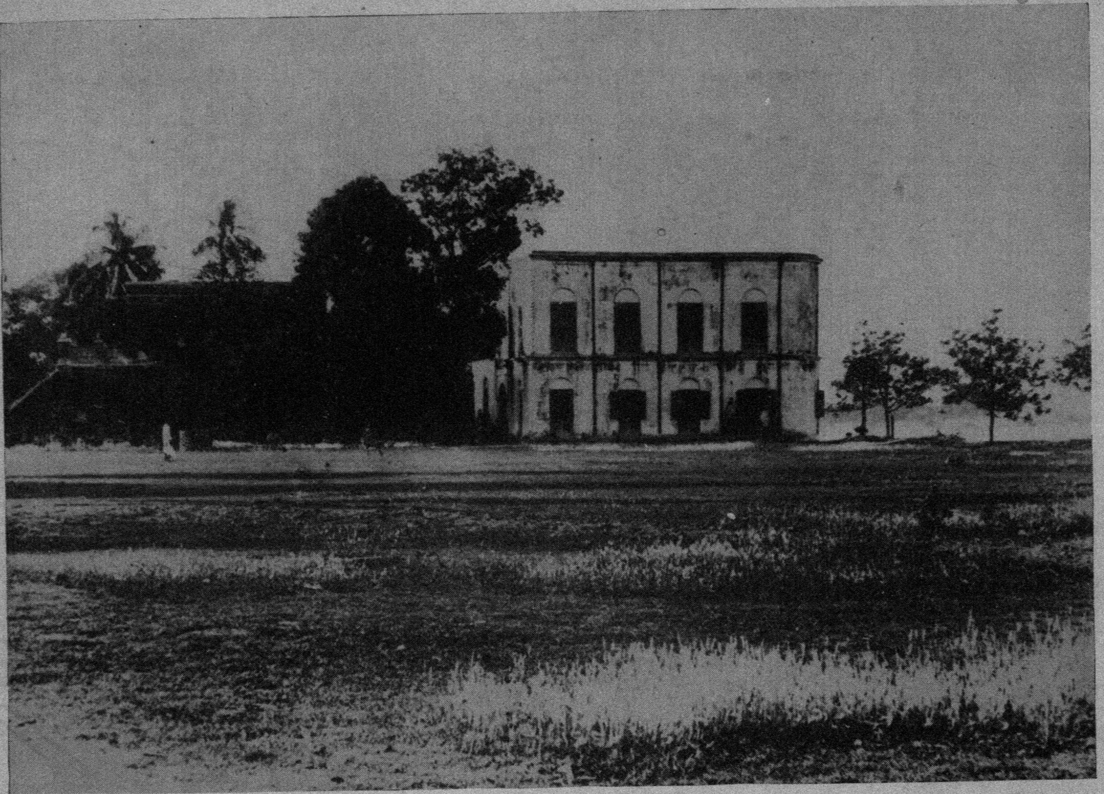


স্বামী বিবেকানন্দ

নিবেদন

আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে (২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডের এক আইরিশ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এক যুগ সন্ধিক্ষণে এ-দেশে তাঁহার আগমন। জাতীয় জাগরণের সেই মহাযুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার দান বিস্ময়কর। বাগবাজার ১৭নং বোসপাড়া লেনে তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহখানি সে-যুগের মনীষিবৃন্দের সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দেশনেতা, রাজনীতিবিদ্, বিপ্লবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রভৃতি দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই আসিতেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া মুগ্ধ, অভিভূত হইয়াছেন, দেশের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। আবার অনেকেই নিজ নিজ জীবন সাধনায় নিবেদিতার নিকট প্রেরণা ও সাহায্য লাভ করিয়াছেন। শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে, বস্তুতঃ জীবনের সর্বস্তরে তাঁহার অকুণ্ঠ অবদান দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি ছিলেন একাধারে দেশের মুক্তি-সাধিকা আবার নবভারতের সংগঠিকা।

ভগিনী নিবেদিতার ভারতবাসের কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিবার পর তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। স্বামীজীর নিকট তিনি আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ভারতে তাঁহার প্রথম পদার্পণ। উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশের নারীজাতির শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ। স্বামীজী তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া নূতন নাম দেন 'নিবেদিতা'। ঐ বৎসরই (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ) নভেম্বর মাসে নিবেদিতা বোসপাড়া লেনে একটি ক্ষুদ্র বিত্থালয় প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল নামে পরিচিত)। ঐ বিত্থালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পাশ্চাত্যে



গঙ্গাতীরস্থ বাড়ী — বেলুড় মঠ

গমন করেন এবং প্রায় আড়াই বৎসর কাল পাশ্চাত্যে অবস্থানের পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই তাঁহার কঠোর কর্ম-জীবনের শুরু। 'ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নয়'—স্বামীজীর এই নির্দেশ স্মরণ রাখিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে নীরব, অনলস কর্মের মধ্য দিয়া নিবেদিতা আত্মবিসর্জন করিয়া গিয়াছেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও কঠিন পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পাশ্চাত্যে গমন করিয়া প্রায় দুই বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করেন। বিদেশে অবস্থানকালেও তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভারত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পরম বান্ধবী মিসেস সারা বুলের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া পুনরায় তাঁহাকে পাশ্চাত্যে যাইতে হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে শেষবারের মতো ভারতে ফিরিয়া আসার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ঐ বৎসরেই ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙে শৈলক্রোড়ে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে তিনি কী বিপুল পরিমাণ কার্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মহৎ চিন্তা ও কর্ম কীভাবে সমগ্র দেশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নহে। তাঁহার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন মনীষিবৃন্দের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদনই ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য প্রদান করে।

এক সময় কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তাঁহার বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার তিনি ছিলেন একজন উচ্চদরের লেখিকা। তাঁহার লেখনীমুখে ভারতের মর্মকথা কী আশ্চর্যভাবেই না উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে! ভারতের আদর্শ, ধর্ম, ইতিহাস, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পাল-পার্বন প্রভৃতি গভীর অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়া তিনি বিশ্বের দরবারে উহাদের সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার



ভগিনী নিবেদিতা (পেন্‌সিল স্কেচ)

মধ্যে যে-সব তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মূল্য অপরিসীম। বস্তুতঃ তাঁহার রচনা পাঠ করিবার পর আমরা যেন নূতন দৃষ্টিতে ভারতকে দেখিতে ও তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখি।

ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। উহার মধ্যে The Master as I Saw Him, Kali the Mother ও The Web of Indian Life বিদ্বৎ-জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করে। পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ আয় ও গ্রন্থস্বত্ব তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে দান করিয়া যান। তাঁহার দেহত্যাগের পরেও কিছু কিছু রচনা সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ অদ্বৈত আশ্রম ও উদ্বোধন কার্যালয় এ যাবৎ ঐ পুস্তকগুলির প্রকাশক ছিলেন।

ভগিনীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐ সকল পুস্তক এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু রচনা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে রচনাবলীর (Complete Works of Sister Nivedita) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে। বলা বাহুল্য ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত জনসাধারণের বৃহৎ অংশ তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত নহেন। এ পর্যন্ত The Master as I Saw Him (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি), Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda (স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে), 'শিব' ও 'বুদ্ধ-যশোধরা' নামক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাহাতে ভগিনীর রচনার সহিত সকলে পরিচিত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার রচনাবলীর নির্বাচিত অংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইল। বর্তমান সঙ্কলনে এগারোখানি পুস্তক হইতে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ব্যতীত কয়েকটি প্রবন্ধ ও পত্রাবলী প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সঙ্কলনকালে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি রচনা কোন্ পুস্তকের অন্তর্গত তাহা সূচীপত্রে উল্লেখ করা হইল। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' পুস্তকদ্বয়ের অন্তর্গত



১৬নং বোস পাড়া লেন — বাড়ীর ছাদে

পরিচ্ছেদগুলি এবং 'বুদ্ধ-যশোধরা' ও স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী' প্রবন্ধদ্বয় কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া পূর্ববৎ রাখা হইয়াছে। উদ্বোধন পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত 'মা কালীর কাহিনী', 'ভারত-রমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা', 'রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় পরিকল্পনা' 'পথঘাট পরিষ্কার রাখার প্রস্তাব' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি শুদ্ধভাষা হইতে চলিত ভাষায় এবং প্রয়োজনস্থলে পরিবর্তন করা হইয়াছে। 'চিত্র পরিচিতি' প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

অধ্যাপিকা বেলা দে 'The Place of Woman in the National Life (জাতীয় জীবনে নারীর স্থান)', 'The Immediate Problems of Oriental Woman (প্রাচ্য নারীর বর্তমান সমস্যা)', 'Gopaler Ma (গোপালের মা)', 'The Story of Shiva, the Great God (মহাদেবের কাহিনী)', 'Guru and Disciple (গুরু ও শিষ্য)' এবং অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা 'Life in the Hindu Quarter of Calcutta (কলকাতার হিন্দু পল্লীর জীবন)', 'Our Zenana Terrace (আমাদের অন্দর মহলের চত্বর)', 'Rajgir : An Ancient Babylon (রাজগৃহ : প্রাচীন ব্যাবিলন)', 'The Civic Ideal (পৌর আদর্শ)', ও 'The Function of Art in Shaping Nationality (জাতীয়তার রূপায়ণে চারুকলা)' প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করিয়াছেন। 'The Eastern Mother (প্রাচ্য দেশীয় জননী)' প্রবন্ধটির অনুবাদে শ্রীমতী লীলা রায় এবং Manual Training as a Part of General Education in India (ভারতে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে কারিগরী শিক্ষা)' প্রবন্ধটি অনুবাদে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী ও শ্রীমতী রেখা চন্দ্র। শেষোক্ত প্রবন্ধটির কেবলমাত্র প্রথম অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়া হইল। ইঁহাদের এবং অন্যান্য যাঁহারা অনুবাদ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। উদ্বোধনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকের অন্তর্গত পরিচ্ছেদ ও প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা গ্রন্থটির সঙ্কলন, আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশন সংক্রান্ত অন্যান্য দিকে, বিশেষ করিয়া

প্রুফ দেখার কার্যে গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন বিদ্যালয়ের অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী ভারতী রায়।

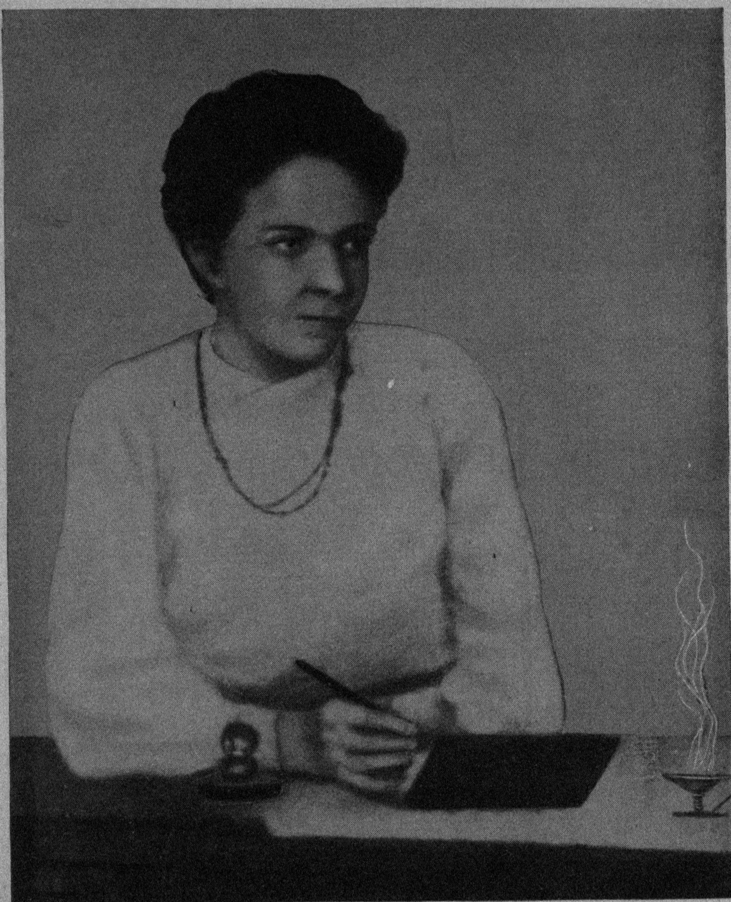
বলা বাহুল্য ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলীর অতি অল্প অংশেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। স্থানাভাবে উচ্চ চিন্তা ও ভাবপূর্ণ বহু রচনারই অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতে সমগ্র রচনার অনুবাদ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন কোন রচনায় সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁহার বর্ণনা, অভিমত অথবা মন্তব্য বর্তমানে আমাদের নিকট যুক্তিপূর্ণ বা সঙ্গত মনে না হইতে পারে। ঐ সকল স্থলে তদানীন্তন সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার রচনার বিচার করিতে হইবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তকখানি পাঠে পাঠক-পাঠিকা বিশেষ উপকৃত ও অনুপ্রাণিত বোধ করিবেন।

প্রকাশিকা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



ভগিনী নিবেদিতা

আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী

স্বামী বিবেকানন্দেব যে চারিখণ্ড গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগেরা ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয় সে তাহাব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পাবে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।*

অন্যত্র যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্র ভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীব উপরই নির্ভর করিবেন। ভারত হইতে ইংরেজি ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও ঐ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে। হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্য সম্পর্কে বিগতভী। এই উভয়বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সঙ্কট মুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া

* স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর ভূমিকা—৪ঠা জুলাই, ১৯০৭

তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি বিশেষের অভ্যুদয় ব্যতীত সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়েব মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নিজের সামান্তের বাহিরে অবস্থিত মানবসাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত। ইহা যে এই বারই প্রথম সংগঠিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবাব প্রতিবেশী দেশসমূহে জাতি গঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তাধারাব মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল—সেই আত্মগত একীকবণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নূতনভাবে সৃষ্ট হইল। আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশ: 'তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর।' ইহা সেই একই চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবরূপে রূপায়িত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উদ্গত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি বলিতেছিলেন, 'একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে।...সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।' এবং তিনি নিজের বক্তব্যের ভাবসম্প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আমরা হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ্য করি, তাহা নয়, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পার্শী-দিগের অগ্নির পূজা করি এবং খৃষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই। আমরা জানি, নিম্নতম বস্তুরতি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলব্ধি এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা মাত্র। সেইজন্য এই সকল কুসুম চয়ন করিয়া, প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পূজার জন্য একটি অপূর্ব

স্তবক রচনা করি।' এমন কেহই ছিলনা যে এই বক্তার হৃদয়ে বিদেশী বা পর; তাঁহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল।

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দু-ধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য। য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে—যেখানে মহাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক কালের প্রযত্ন এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুবরাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে—এই নগর-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপব বিস্তৃত—উত্তবের দ্যুতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, যূরোপের ঐতিহ্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই। এবং এই কেন্দ্রের সৃজনশীল জীবন ও ব্যগ্র কৌতূহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক ঐক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে সঞ্চরমাণ।

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর—তারুণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহা ছিল অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ। বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ পরিবেশেরই সম্মুখীন

হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক মহাসাগর—বহুযুগের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ, যাহার কালপঞ্জী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্ হইতে—এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের—এমন একটি জগৎ, যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ—একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধূলিকণা যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের পাদস্পর্শে পবিত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ—তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে পরীক্ষা করিয়াছে বহুবস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় সব কিছু—শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে-দেশের অধিবাসিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এইগুলি ছিল দুইপ্রকার চিত্তপ্রবাহ; যেন দুইটি বিশাল চিন্তাতরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক; ধর্ম-মহাসভার বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্য এই ব্যক্তির আধারে সংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্গত হয় নাই,—এমন কি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী। যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে

—মধ্যাহ্ন সময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ ঊষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য।

একই বক্তৃতা মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও অনেকে—বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার নিকট—তাঁহার নিজেরই ভাষায়—ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 'বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা।' তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন; তাহাদের একটি বা অপরটি—এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 'এগুলি সবই সূত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অনুস্যূত।...যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ।' বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে 'মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।'...এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ—সেই আদেশ: 'ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে'—ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, যিনি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও

বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে।

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিক ভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহাব নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।' প্রসঙ্গতঃ তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন: 'যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কার-সমূহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহু-পাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তি বিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এইমূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে

ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হইতেছে—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সর্বাবগাহিত্ব—প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিমা বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত: 'শোন অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন। আমি সেই মহান্ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে—সকল অজ্ঞানের উর্ধ্বে! তাঁহাকে জানিয়া তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।' এই তো সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে। 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান,—এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহায্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি উপাসক উপাসনা করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু 'ওঁ' এই শব্দব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মন্দির স্ব-স্বরূপে বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং—এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানব জাতির ধর্মসাধনার পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হইতেছে; সেই পুণ্য-পীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্ম পদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে—ইহার বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোষণা করে: সাধনার অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে নিরাকারে—কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য

এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না কেন, প্রতিটি অকপট ধর্ম বিশ্বাসকেই সে মহান্ ঊর্ধ্বগতির সোপান-স্বরূপ মনে করে এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহাব নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতার কৃষ্ণেব ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায়—ভারতীয় চিন্তা জগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি দ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশক রূপে—ব্যাখ্যাতা-রূপেই স্বামীজী বিরাজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন, তথাপি তাঁহার দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত; না আরও বেশী—ঐগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু থাকিত, ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত। যদি তিনি আবির্ভূত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগুলি আজ সহস্র সহস্র মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত। তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতো নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।

তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিলনা—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। এ-কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা

করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আর একটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, তিনি এমন এক তত্ত্ব—যাহাতে সাকাব নিরাকার দুইই আছে।'

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্ম-পদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দির দ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়। এক সময় তিনি

বলিয়াছিলেন, 'চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।'

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষা—সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় তুইটি ভাবজগতের যে-বৈষম্য এইভাবে তাঁহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থগুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়াছিল ; ইহা তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের ঋষিগণ আকস্মিকভাবে ইহা লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্তু ইহা ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়—সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন 'নরেন'—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের 'সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁহার জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত—মনের গতি বহু হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ। তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্য দর্শন লাভ করিত। 'জ্বরভাবের মতো' পরম জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা এই শিষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই

এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্জিকা লাভ করিয়াছিলেন।

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাব পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাঁহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

সুতরাং শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—যেন তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্ সঙ্গীত। এই বস্তুগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি। এইগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা—একই দীপাধারে প্রজ্বলিত, ভারতবর্ষ তাঁহার হাত দিয়া উহা জ্বালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানব জাতির পথ নির্দেশ করিবাব জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বৎসরের কর্মের মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই দীপ প্রজ্বলনের জন্য ও এই যে লেখমালা (record) তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য, স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাঁহারা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয়া উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

গঙ্গাতটস্থ শষ্পাবৃত ভূমি ও তরুরাজির মধ্যেই আমি, যাঁহার কার্যে আমি ইতিপূর্বেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই লোক-শিক্ষকের বিষয় সাক্ষাৎ ভাবে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের সময় (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি) বেলুড়ে সবেমাত্র একখণ্ড জমি ও একটি বাড়ি ক্রয় করা হইয়াছিল; উহাই পরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠরূপে পরিণত হয়। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে কয়েকজন বন্ধু আমেরিকা হইতে আগমন করেন, এবং স্বভাবসুলভ নির্ভীকতার সহিত ঐ ধ্বংসাবশেষপ্রায় বাড়িখানি অধিকার করিয়া উহাকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করিয়া লন। এই বন্ধুগণের অতিথিরূপে বেলুড়ে ঐখানে বাসকালে, এবং পরে কুমায়ুন ও কাশ্মীরে ভ্রমণকালেই, আমি তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষকে ভাল করিয়া চিনিতে, ও স্বামীজী নিজদেশে নিজজনের মধ্যে কিরূপ জীবন যাপন করেন, তাহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমাদের বাড়িখানি কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক উচ্চ সমতল ভূমির উপর নির্মিত ছিল। জোয়ারের সময় ছোট পানসিগুলি (এইগুলিই গঙ্গাতীরবাসিগণের পক্ষে গাড়ির কাজ করে) একেবারে সিঁড়ির নীচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের এবং অপর পারের গ্রামখানির মধ্যে নদীটি বিস্তারে অর্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল হইবে। উহার পূর্বতটে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানেই স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণপদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়িটি এই সময়ে মঠরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের বাড়ির দক্ষিণে প্রায়

অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই মঠ ও আমাদের মধ্যে অনেক-গুলি বাগান বাড়ি এবং অন্ততঃ একটি জলনির্গমপ্রণালী ছিল। একটি তালগাছের গুঁড়ির অর্ধাংশ দ্বারা নির্মিত এক পুলের উপর দিয়া উহা পার হইতে হইত; পুলটিকে দেখিলে উহা ভার সহিতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইত। আমাদের এই বাড়িখানিতেই স্বামীজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী বা কয়েকজন গুরুভ্রাতা সহ আগমন করিতেন। এইখানেই বৃক্ষতলে, আমাদেব প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত, আমরা বসিয়া বসিয়া একমনে স্বামীজীর সেই অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভারতীয় জগতের কোন-না-কোন গভীর রহস্য তিনি ঐ কালে আমাদেব নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতেন। উহাতে কদাচিৎ প্রশ্নোত্তর স্থান পাইত। এই কালের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হই, কি প্রকারে এরূপ চিন্তা ও অভিজ্ঞতাসম্ভাব সঞ্চয় করা যাইতে পারে, আবার সঞ্চয় করিলেই বা কি প্রকারে উহার বিতরণে এরূপ প্রবল শক্তি আসিতে পারে! যাঁহাদের উচ্চদরের কথোপকথনসামর্থ্য আছে, তাঁহাদের মধ্যেও স্বামীজীর একটি বিষয়ে বিশেষত্ব ছিল। কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তিনি যাঁহাদের সহিত বার্তালাপ করিতেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিতেন না। যাঁহারা একটি অব্যক্ত সহানুভূতি ও ভক্তির ভাব লইয়া কথোপকথনে যোগদান করিতেন, শুধু সেই সকল শ্রোতার উপস্থিতিকালেই তাঁহার গভীরতম উক্তিগুলি শ্রবণগোচর হইত, কিন্তু তিনি স্বয়ং এ বিষয় জানিতে পারিতেন, এরূপ মনে হয় না। কোন বাহ্য ঘটনা যে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে, এরূপ একেবারেই মনে হইত না। এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, তিনি উত্তেজিত হইয়া জোরের সহিত কথা কহিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল অবস্থা তাঁহার মনের অতি মধুর অবস্থাগুলির ন্যায়

কোন অজ্ঞাত কারণসম্ভূত ছিল; উঁহারা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ কারণসমূহ হইতে উদ্ভূত হইত; কোন ব্যক্তি বিশেষ উহাদের কারণ নহে।

এইখানেই আমরা ভারতীয় প্রচেষ্টাসমূহের সর্বজনবিদিত মূলমন্ত্র কি, এবং কি আদর্শ দ্বারা উহারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, কথোপকথনগুলিতে সর্বোপরি বিভিন্ন আদর্শেরই ব্যাখ্যা হইত। একথা সত্য যে, ইতিহাস, সাহিত্য এবং অপব সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হইত, কিন্তু উদ্দেশ্য সকল সময়েই সেই এক সিদ্ধি বা পূর্ণতালাভসম্বন্ধীয় কোন এক ভারতীয় আদর্শকে আরও বিশদ করা। আব এই আদর্শগুলিকে যত সহজবোধ্য মনে করা যাইত, সকল সময়ে তাহারা তত সহজবোধ্য হইত না। এই ভারতীয় জগতে সহজাত পরোপকাব প্রবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তদপেক্ষা চিত্তৈকাগ্রতা-বিষয়েই সমধিক পুষ্টিসাধনচেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ভারতের কল্যাণ অথবা অকল্যাণের হেতু, তাহা তর্কযুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিবার এখনও সময় আসে নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীজীর নির্ভীক উপদেশ এই যে, আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের গণ্ডি ছাড়াইয়া ঐসকলের প্রতি দৃষ্টি কবিতে হইবে। আমাদিগকে শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে, এই আদেশ অপেক্ষা 'সাক্ষিস্বরূপ হও', এই আদেশই অধিক শ্রুত হইত। জগতে আমার কোন শত্রু আছে, এইরূপ চিন্তা কবাই এই মনীষীর চক্ষে দ্বেষবুদ্ধির প্রমাণ। তিনি বিশেষভাবে বলিতেন, প্রেম 'অহেতুক' না হইলে প্রেমই নহে। পাশ্চাত্য বক্তা হইলে এই ভাবটিই 'উদ্দেশ্যবিরহিত' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বক্তার জোর কতকটা কমিয়া যাইত। ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমাদের সকল চিন্তার মধ্যে বিরাজ করিতেন শ্রীমহাদেব, যাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট ত্রৈলোক্যের

রাজত্ব বা পিতৃত্ব, ঐশ্বর্য বা সুখ, কিছুই প্রলোভিত করিতে পারে না; আবার যিনি সাংসারিক ব্যাপারে 'একজন অতি সাদাসিধা লোক', যাঁহার কোন কৌতূহল নাই, যিনি সহজে প্রতারিত হন এবং যিনি প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে তণ্ডুলমুষ্টি ভিক্ষা ক্‌রেন। তিতিক্ষা ধর্মজীবনের একটি চিহ্ন। আমরা পাশ্চাত্য দেশে ইহার একটি উদাহরণ দেখিতে পাই সেই সাধুতে, যিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, এবং যিনি তাঁহার অঙ্গুলিপর্বসমূহ হইতে কৃমিগুলি পড়িয়া যাইলে, হেঁট হইয়া উহাদিগকে তুলিয়া, 'খাও, ভাইসব', বলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিতেন। রঘুনাথের দর্শনলাভ জীবের চরমোৎকর্ষসমূহের মধ্যে অন্যতম, এবং যে সাধুটি সম্মুখে কয়েকটি বলদকে তাড়িত হইতে দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার পৃষ্ঠে সেই চাবুকের দাগগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি উক্ত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজী আমাদিগকে আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল পূর্বধারণা হইতে আকাশপাতাল তফাত একটি ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আহ্বান করিলেন; বলিলেন যে, দেহ-বুদ্ধির একান্ত অভাবই পূর্ণ সাধুত্বের লক্ষণ। এই দেহবোধরাহিত্য এত গভীর হয় যে, সাধু জানিতেই পারেন না, তিনি উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। কারণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে নগ্নতারও একটি উচ্চতর অর্থ আছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শিগণ বুঝিতে পারেন। পাশ্চাত্যে উহার বিকাশ ললিতকলায়; ভারতে উহার বিকাশ ধর্মে। আমরা যেমন একটি গ্রীক প্রতিমূর্তির সম্মুখে সৌন্দর্যাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই উপলব্ধি করি, হিন্দুও তেমনি উলঙ্গ সাধুতে শুধু মাহাত্ম্য ও বালকসুলভ পবিত্রতাই দেখেন।

কিন্তু এই নূতন চিন্তা-জগতে একটি আকাঙ্ক্ষা চিত্তৈকাগ্রতারই ন্যায় ধর্মজীবনে মুখ্যভাবে এবং সকল বিষয়ে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য ছিল—উহা জীবাত্মার স্বাধীনতা। চিন্তা, মতামত এবং কার্য, এসকল বিষয়ের ছোটখাট অধিকারগুলিও উহার অন্তর্ভুক্ত।

একমাত্র এই অধিকারটিকেই সাধুগণ নিজস্ব অধিকার বলিয়া সর্বোতভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন; একমাত্র এই সম্পত্তিটিতেই তাঁহারা কোন অনধিকার-প্রবেশ সহ্য করিতে পারেন না। আর দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমি দেখিলাম যে, ইহা একপ্রকাব ত্যাগের ভাবেই দাঁড়াইয়া যায়। যাহাতে বন্ধনশৃঙ্খল লুক্কায়িত রহিয়াছে, এমন কোন কিছু সুখকর হইলেও গ্রহণ না করা; এক কথায়, যাহাতে বন্ধনের ইঙ্গিতও আছে, এমন সকল সম্পর্ক ছেদন করিতে প্রস্তুত থাকা—যিনি এরূপ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত কিরূপ নির্মল হওয়া চাই, ইচ্ছাশক্তি কিরূপ বিশুদ্ধ হওয়া চাই! কিন্তু এই আদর্শ হইতেই আবাব অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাস-ধর্মের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিপুষ্টির যে ইহাই কারণ, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কাবণ, প্রাচীনকালে ধর্মজীবনের আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষগণ সর্বদা একাকী থাকিতেন, তা পরিব্রাজকই হউন, আর কুটিচকই হউন। আমাদের সন্নিকটস্থ মঠটিতে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাইতাম, যাঁহারা তাঁহাদের নেতার স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাক্যালাপ কবা পছন্দ কবিতেন না; অপর কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহাদের ক্রিযাকাণ্ডমাত্রেই আপত্তি ছিল। একজনের ধর্মকে শক্তিমানের পূজা দ্বারা প্রশমিত আস্তিকতা বলিয়া বর্ণনা কবা যাইতে পারে; অপর একজনের ধর্ম তাঁহাকে এমন অনুষ্ঠানপরম্পরায় প্রবৃত্ত করিত, যাহা আমাদেব অনেকেরই পক্ষে অসহ্য ভার বলিয়া বোধ হইবে; কয়েকজন ব্যক্তি মহাপুরুষ, ধ্যান ও অলৌকিক দর্শনাদির রাজ্যে বাস করিতেন; অপর কয়েকজন এইরূপ অর্থহীন ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তর্কের চুলচেরা বিচারসহায়ে আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। এই সকল ব্যক্তি যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে একত্র হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহারা যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ পথ নির্বাচন

করিয়া লইবার অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন, একথা নির্বিবাদে প্রতিপন্ন হয়। আবার আমি তখন এবং পরেও ইহা না ভাবিয়া থাকিতে পারি নাই যে, ভারতে প্রাচীন শাসনপদ্ধতিগুলির কোন কোন বিষয়ে বিফল হওয়ার কারণও উহাই। কারণ, যাহাতে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ নগর ও রাজ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় কার্যে আপনাদিগকে সম্যকরূপে নিয়োজিত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের এরূপ ধারণা থাকা খুবই আবশ্যক যে, এবংবিধ সঙ্ঘবন্ধন-কার্যই তাঁহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানজনক উদ্যম। কিন্তু প্রাচীনযুগের ভারতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আধ্যাত্মিক আদর্শসকলেই—এই স্বাধীনতাবোধও তাহাদের অন্যতম—এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে, নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত সুনিয়ম-স্থাপনের প্রতি তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইতেই পারিতেন না। আর ইহাতে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিধিব্যবস্থার যে সকল সুফল, তাহাদের কতকগুলিকে প্রমাণিত করিবার ভার আধুনিক ব্যক্তিগণেরই উপরে পড়িয়াছে। তথাপি এই সকল কার্যকে সম্যকরূপে ধারণা ও পোষণ করিয়া উহাদিগকে নিজ উন্নতির অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে হিন্দুধর্মের আছে, আমার বিশ্বাস, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য শ্রীবিবেকানন্দের উদ্ভব ও জাতীয় চিন্তাভাণ্ডারে তাঁহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট দান হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

যাহা আমরা শুধু নিজেদেরই কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে জোর করিয়া অপরের উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টাকে স্বামীজী পাশ্চাত্যগণের চরিত্রের এক মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর তিনি যে গম্ভীরভাবে আমাদিগকে ঐ দোষ-পরিহার-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার চিরাভীপ্সিত 'আদর্শ-বিনিময়ে'রই অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু

আবার যখন তাঁহার কয়েকজন আপনার লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি ইংরেজদের তাদের দেশে থেকে দেখে এসেছেন। আপনার মতে তারা কোন জিনিসটির সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষসাধন করেছে?' তখন তিনি উত্তর দেন, 'আত্মসম্মান বজায় রেখে কিরূপে আজ্ঞাবহ হওয়া চলে, এইটি তারা শিখেছে।'

কিন্তু বেলুড়ে আমরা শুধু স্বামীজীকেই দেখি নাই। সারা মঠই আমাদিগকে তাঁহাদের অতিথি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য এই অতিথিসৎকারপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ এবং কখনও সেবা-উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন। যে গরুটি আমাদের দুধ দিত, তাহাকে তাঁহারাই দোহন করিতেন, এবং যে ভৃত্যের উপর রাত্রিতে ঐ দুগ্ধ আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার ছিল, সে একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া আর যাইতে অস্বীকার করায়, সাধুগণের মধ্যে একজনই এই ভৃত্যজনোচিত কার্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভারতীয় গৃহস্থালীর নিত্য নূতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। আর একজনের উপর বাঙ্গালা শিখাইবার ভার ছিল। সঙ্ঘের পুরাতন সাধুগণ প্রায়ই লৌকিকতা-ব্যপদেশে বা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আর যখন স্বামীজী স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র গমন করিতেন, তখন ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ-না-কেহ অতিথিগণের সৎকার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনাকেই দায়ী ভাবিয়া নিয়মমত আগমন করিয়া প্রাতঃকালে চায়ের টেবিলে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। এইসকল এবং এইরূপ সহস্র অন্য উপায়ে, আমরা সেই সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, যাঁহাদের মধ্যে আমরা সেই উজ্জ্বল স্মৃতির প্রকাশ দেখিতে পাইতাম, যে স্মৃতিরূপ 'টানা'র উপর এই সমুদয় ত্যাগীর জীবন 'পড়েনে'র মত বোনা হইয়াছিল।

কারণ, এই যে সন্ন্যাসিগণ আমাদিগকে দর্শনদানে অনুগৃহীত করিতেন, ইঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যাগ্রণী স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ। স্বামীজী মাত্র তের-চৌদ্দ মাস হইল তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহাদের সেই প্রথমদর্শনজনিত আনন্দ ও বিস্ময় অপনীত হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার পূর্বে প্রায় ছয় বৎসরকাল তিনি তাঁহাদের নিকট একরূপ অদর্শনই ছিলেন। সত্য বটে, তিনি শেষাশেষি তাঁহাদের সহিত ঘন ঘন পত্রব্যবহার করিতেন, এবং কোন সময়েই তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার গতিবিধির একেবারে খেই হারাইয়া ফেলেন নাই। তথাপি যখন তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার আমেরিকায় প্রথম সফলতার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, 'ওর দ্বারা জগতের অনেক কাজ হবে'—তাঁহার গুরুদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি তাঁহাদেরই স্বামী বিবেকানন্দ।

যাঁহারা কোথাও কোন মহাত্যাগীর জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, নিজের আমিত্বকে দূর করিব, যে সকল বস্তু অতি তুচ্ছ ও যাহাদের কেহ খোঁজখবর রাখে না, এরূপ সব বস্তুর সহিত মিশিব, লোকসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া যাইব এবং লোকে আমার স্মৃতি পর্যন্ত মুছিয়া ফেলুক—এইরূপ এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগাগ্রহের একটি অঙ্গস্বরূপ। আমার মনে হয়, এইপ্রকার ধর্মের বহুকালব্যাপী মৌন ও নির্জনগুহাবাস এবং বন হইতে বনান্তর ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে অঙ্গে মৃত্তিকা-বিভূতি আদি লেপন প্রভৃতি যে সকল অসংখ্য আকারভেদ আছে, এবং পাশ্চাত্য দর্শক বাহির হইতে যাহার অর্থবোধ করিতে পারেন না, তাহাদের ইহাই ব্যাখ্যা। এই ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর প্রথম কয়েক বৎসর স্বামীজীর মনে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়; এবং তিনি যে বারবার, আর কেহ

কখনও তাঁহাব সন্ধান না পায়, এই উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, একথা নিশ্চয়। একবার তিনি এইরূপ একটি যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃমণ্ডলী শুনিতে পাইলেন যে, তিনি হাথরাসে পীড়িত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কারণ, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে, বিশেষতঃ স্বামীজীর সহিত, এমন প্রেমসম্বন্ধ ছিল যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মঠে আসিবার কয়েক মাস পরেই তাঁহার এক শিষ্যও মঠে আগমন করিলেন। ইহাকে তিনি ভ্রমণকালে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার সন্ন্যাস নাম স্বামী সদানন্দ। ইঁহারই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অথচ সতেজ ইংরেজি সাহায্যে কথিত বিবরণ হইতে আমি, এইকালে স্বামীজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্বাশ্রমের গৃহ হইতে কলিকাতা আসিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি রেলে চাকরী স্বীকার করেন। এই কার্যে তাঁহার দুই-তিন মাস লাগিয়াছিল। যখন তিনি মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন যে, স্বামীজী পুনর্বার যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, কেবল বাহির হইলেই হইল। কিন্তু তাঁহার জন্য স্বামীজী এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেইদিনই যে যাত্রা করিবার কথা, তাহা এক বৎসরের পূর্বে আর করা হয় নাই। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজীর এই প্রথম শিষ্য সগর্বে বলিলেন, 'স্বামীজীর জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ আমাকে নিয়েই।'

এই বৎসর আচার্যদেব 'একটানা চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করিয়া যাইতেন।' 'তিনি পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এত কাজ ছিল!' অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া 'জাগো, জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী', এই গানটি গাহিতে গাহিতে অপর সকলকে উঠাইতেন। তখন সকলে ধ্যান

করিতে বসিতেন এবং তৎপরে যেন অজ্ঞাতসারেই ভজন ও সৎ-প্রসঙ্গে উপনীত হইতেন। উহা দ্বিপ্রহর বা তারও পর পর্যন্ত চলিত। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। কখনও ইগ্নেশিয়াস্ লয়োলার[১] গল্প, কখনও বা জোয়ান অব আর্ক অথবা ঝান্সীব রাণীর গল্প হইত। আবার কখনও স্বামীজী কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' হইতে লম্বা লম্বা অংশ আবৃত্তি কবিতেন, এবং সকলে, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তুলিতে তুলিতে সমস্বরে 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক!' 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক!'—এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। অথবা তাঁহারা সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্ অব অ্যাসিসির কথায় তন্ময় হইয়া যাইতেন, এবং নাট্যকার যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে স্বভাববশেই নাটকীয় পাত্রগণের সহিত এক হইয়া যান, তাঁহারাও তেমনি উক্ত মহাপুরুষের 'এস, এস, ভাই মৃত্যু!'—এই বাক্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বেলা একটা-দুইটার সময় হয়ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—তিনিই একাধারে এই সঙ্ঘের পাচক, গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক এবং পূজারী ছিলেন—তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিত; এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দুইঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। অনেক সময় ইহাতেও তাঁহাদের তন্ময়-ভাব ভঙ্গ হইত না, আবার ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হইত; আবার তাঁহারা ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন। ছাদের উপর বসিয়া সময়ে সময়ে মধ্যরাত্রির অনেক পর পর্যন্ত তাঁহারা 'জয় সীতারাম!' বলিয়া নামগান করিতেন। সকল ধর্মের বিশেষ বিশেষ পর্বগুলি

১ Ignatius de Loyola (১৪৯১-১৫৫৬)—ইউরোপের বিখ্যাত জেস্যুইট-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

তদুপযোগী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় তাঁহারা বাঁকা-মাথা, লম্বা ছড়ি-হস্তে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের চতুর্দিকে অর্ধশয়ান থাকিয়া, কিরূপে এক জনকোলাহলশূন্য স্থানে কতকগুলি মেশপালক মেষযূথের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় কিরূপে দেবদূতগণ তাঁহাদিগের নিকট শুভাগমন করেন, এবং কিরূপে সেইদিনই জগতের প্রথম Gloria নামক[১] স্তুতি গীত হইল—এইসকল সম্বন্ধে অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেন। কিরূপে তাঁহারা একবার গুড-ফ্রাইডের উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে গল্পটি অতি কৌতুকাবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা ক্রমে, উক্ত উৎসবব্রতিগণের যে উৎকট ভাবাতিশয্য লাভ হইয়া থাকে, তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহারের নাম পর্যন্ত করা চলিবে না—তাঁহারা কয়েকটি আঙ্গুর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহারই রস বাহির করিয়া লইয়া জলের সহিত মিশানো হইল। সকলে একই পাত্র হইতে উহা পান করিবেন, এইরূপ আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় দ্বারে একজন য়ূরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল, 'কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।' অনির্বচনীয় আনন্দসহকারে তাঁহারা দশ-পনরজন মিলিয়া ছুটিয়া তাঁহার চতুর্দিকে একত্র হইলেন—সকলেই একজন খৃষ্টানের মুখ হইতে ঐ দিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তিনি মুক্তিফৌজের লোক, গুড-ফ্রাইডের কথা কিছুই জানেন না, তাঁহারা শুধু জেনারেল বুথের জন্মদিনে উৎসব করিয়া থাকেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, 'তিনি আরও কি কি বললেন, আমার মনে নেই।' বলিতে বলিতে বক্তার বদন ও কণ্ঠস্বর যেন বিষাদময় হইয়া গেল; তাহা হইতেই

১ 'স্বর্গে ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করুক!'—দেবদূতগণের গীতি।

সাধুগণ এই সংবাদশ্রবণে সহসা কিরূপ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বোধ হয় যে, তাঁহারা আশা-ভঙ্গের প্রথম মুহূর্তেই, 'আপনার এটি রাখবার অধিকার নেই' বলিয়া পাদ্রী বেচারার হস্ত হইতে বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে, তাঁহাদেরই একজন অন্য একটি দ্বার দিয়া চুপে চুপে ঘুরিয়া গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন, এবং কিঞ্চিৎ আহার্য প্রদান করিয়া গোপনে তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন।

যিনি এই সকল কথার বর্ণনা করিতেছিলেন, তিনি উৎসাহ-ভরে বলিতে লাগিলেন, 'সে সময় সর্বদা শশব্যস্ত থাকতে হোত, এক মুহূর্তেরও বিশ্রাম ছিল না। অনেক বাইরের লোক আসা-যাওয়া করতেন, অনেক পণ্ডিত তর্ক আলোচনাদি করতেন, কিন্তু স্বামীজী এক মুহূর্তের জন্যও কাজ ছাড়া থাকতেন না। কখনও কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকবার অবসর পেতেন; সেই সময় তিনি "হরিবোল, হরিবোল!" অথবা "মা, মা!" বলতে বলতে পায়চারি করতেন। এই সকল উপায়ে তিনি আপনাকে নিজের উদ্দিষ্ট মহৎকর্মের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। আমি সর্বদা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতাম, এবং কোন একটি অবসরে বলতাম, "আপনি খাবেন না?" প্রত্যেকবারেই তিনি কোন-না-কোন কৌতুকপূর্ণ উত্তর দিতেন।' কখনও কখনও রাঁধিতে রাঁধিতে অথবা ঠাকুর পূজার আয়োজন করিতে করিতে এইরূপ কথাবার্তা চলিত; এই সকল কর্মে সকলেই ভেদবিচার না করিয়া যোগদান করিতেন। এই সময় সাধুরা নির্ধন হইলেও অনেকে তাঁহাদের নিকট আহারপ্রার্থী হইয়া আসিত। তাঁহাদের নিজেদের সম্বল অতি অল্পই ছিল। মঠের বাহিরে গায়ে দিয়া যাইবার মত চাদর তাঁহাদের একখানি মাত্র ছিল। সেইখানি একগাছি দড়িতে ঝুলান থাকিত, এবং যিনিই বাহিরে যাইতেন, তিনিই উহা লইয়া

যাইতেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় উত্তরীয় রাখিবার সঙ্গতি ছিলনা। তথাপি কোন রকমে দরিদ্র ও অভ্যাগতদিগের জন্য আহার্য সংগৃহীত হইত। সাহায্য বা উপদেশলাভের জন্যও অনেকে আসিতেন। সাধুবা আবার অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েক শত গীতা ও Imitation of Christ ('খৃষ্টের অনুসরণ') ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পুস্তক ঐ সময়ে সঙ্ঘের বড় আদরের বস্তু ছিল। বহু বৎসর পরে ঐ পুস্তকের একটি মাত্র বাক্য স্বামীজী যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, 'ওহে লোকশিক্ষকসকল, চুপ কর! ওহে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থাম। হে প্রভো, একমাত্র তুমিই আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে কথা কও!' টমাস-আ-কেম্পিসের গ্রন্থের শুধু ঐ অংশটুকুই তাঁহার মনে ছিল। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের এই হিন্দুকুলোদ্ভব সন্তানগণের মন হইতে এই পুস্তকখানির প্রভাব যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া উহাকে শুধু স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত করিতেছিল, এবং তাহার পরিবর্তে গীতার সৌন্দর্য ও প্রভাবই দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয়না।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপরে স্বামীজী পওহারী বাবাকে[১] দর্শন করিতে গাজীপুরে গমন করেন। ইনিই সেই সাধু, যাঁহাকে স্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নেই আসন দিতেন। তথায় তিনি যে অমূল্যধন লাভ করিলেন, তাহা অপর সকলের সহিত একত্র সম্ভোগ করিবার জন্য তিনি দুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিলেন। সহসা সংবাদ আসিল যে, স্বামী যোগানন্দ নামক এক গুরুভ্রাতা বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া এলাহাবাদে পড়িয়া আছেন। অমনি কয়েকজন ভ্রাতা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য ছুটিলেন; স্বামীজীও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন।

১ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হোমাগ্নিতে নিজদেহ আহুতি দিয়া এই যোগী মানবলীলা সংবরণ করেন।

আমরা পুনরায় স্বামী সদানন্দের বর্ণনার অনুবর্তন করিব। এলাহাবাদে অনেক দিবস ধর্মচর্চায় ব্যয়িত হইল। স্বামী যোগানন্দের পীড়া যেন একটি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র হইল; যেন তাঁহার দ্বারা সকলকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হইল, আর সমস্ত নগরটি যেন মহা ব্যগ্রভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল। বহুদিন ও বহুরাত্রি ব্যাপিয়া লোক ক্রমাগত ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া আসিতে এবং দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামীজীর মনও এই সময়ে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ভাবসমূহে আপ্লুত থাকিত। একদিন তিনি এক মুসলমান পরমহংস সাধুকে দর্শন করেন; 'তাঁর অঙ্গের প্রত্যেক রেখাটি বলে দিল যে, ইনি একজন পরমহংস।' এই মিলন বাসরটি একটি অপূর্ব ক্ষণ ছিল, সন্দেহ নাই।

'দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥'

অর্থাৎ, আত্মবিৎ পরমহংসগণ কখনও দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান করিয়া, কখনও বল্কল বা চর্ম পরিধান করিয়া, কখনও জ্ঞানাম্বরে আচ্ছাদিত হইয়া, উন্মত্ত, বালক বা পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।—শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' হইতে এই পরমহংস-লক্ষণগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে শিষ্যের ভাষায় তাঁহাদের সারা রাত্রি সোৎসাহে আলোচনা চলিল। এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনাবৈচিত্রের মধ্য দিয়া সম্ভবতঃ এক পক্ষ কাল কাটিয়াছিল; তৎপরে তাঁহারা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া দুই-দুই বা তিন-তিন জন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বামীজী ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মহাদিগ্বিজয়ের পূর্বে তিনি আর তথায় প্রত্যাগমন করেন নাই।

এবার তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত যাত্রা করেন। ইনি তাঁহাকে আলমোড়া লইয়া গিয়া তথায় এক গৃহস্থের অতিথিরূপে রাখিয়া দেন। পূর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন তিব্বত যাত্রা করেন, সেই সময় এই গৃহস্থটি তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, পর্বতের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে স্বামীজী একদিন ক্ষুধায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। একজন মুসলমান তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া একটি শশা কাটিয়া আনিয়া খাইতে দেয়, এবং উহাতেই একপ্রকার তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। কতদিন ভ্রাতৃদ্বয় অনাহারে ছিলেন, জানি না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি আপনা হইতে না আসিলে তিনি উহা চাহিতে পারিতেন না। অন্ততঃ তিনি যে পরে একবার ঐরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এক ব্যক্তি স্বামীজীকে এই ভ্রমণকালে জানিতেন; তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন যে, এই কঠোর সাধনকালে তিনি পাঁচ দিনের অধিক অনশনে যাপন করেন নাই।

ইহার পর আমরা তাঁহার গতিবিধির সূত্র হারাইয়া ফেলি। তিনি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন, কিন্তু সাধুগণ নিজেরাই ছোড়ভঙ্গ হইয়াছিলেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা বড়ই নিরানন্দে দিনযাপন করিতেন। আবার প্রথম মঠবাড়িটিও পরিত্যাগ করিবার কথা হইতেছিল। কারণ, গৃহস্বামী উহা পুনর্নির্মাণ করিবেন বলিতেছিলেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী কিছুতেই তাঁহাদের গুরুদেবের ভস্মাবশেষ ছাড়িয়া যাইবেন না; তিনি অচল-অটল, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সম্পদে-বিপদে ঐ ভস্মাবশেষ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে, তাঁহারা পুনরায় ঠাকুরঘরে একত্র না হওয়া পর্যন্ত, কিছুতেই আচ্ছাদনবিহীন হইতে দিবেন না। ইনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি, স্বামী নির্মলানন্দ, মধ্যে মধ্যে

স্বামী প্রেমানন্দ নামক একজন এবং সঙ্ঘের বাসনমাজা ইত্যাদি কার্যে রত, নবাগত সেবক স্বামী সদানন্দ—এই চারি জন কিছু দূরে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের নিকটে, একটি গৃহে স্থান পরিবর্তন করিলেন, এবং পূর্বে যে মঠ বরাহনগরে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন আলমবাজার মঠ নামে অভিহিত হইল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সময়ে সর্বদা স্বামীজীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতে পাইতেন, স্বামীজী অমুক শহরে রহিয়াছেন; শুনিয়াই তথায় ছুটিতেন, গিয়া দেখিতেন, স্বামীজী এইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন; কোথায় গিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। একবার স্বামী ত্রিগুণাতীত গুজরাটের কোন এক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিপদে পড়েন। এই সময়ে একজন তাঁহাকে বলেন, 'এক বাঙালী সাধু রাজমন্ত্রীর বাড়িতে বাস করছেন; আপনি যদি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তো নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন।' তদনুসারে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই অজ্ঞাত সাধু স্বয়ং স্বামীজী। কিন্তু তিনি ভ্রাতার যে সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে বলিলেন, এবং নিজে একাকী চলিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের যে সারগর্ভ বাক্যগুলি তিনি সর্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহাই তাঁহার এই সময়ে মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল—'সিংহ যেমন সামান্য শব্দে ভয় পায় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তুমিও তেমনি গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর।'

আমরা এখন জানি যে, আলমোড়াতেই তিনি সংবাদ পান, তাঁহার শৈশবের প্রিয় ভগিনী শোচনীয় দারিদ্র্যের পীড়নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি, নিরুদ্দেশভাবে নিবিড়তর অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশে পলাইয়া যান। বহু বৎসর পরে একজন, যিনি স্বামীজীর জীবনের ঘটনাসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই

মৃত্যুতে স্বামীজীর হৃদয়ে অতি গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল—এত গুরুতর যে, উহার তীব্র যন্ত্রণার এক মুহূর্তের জন্য কখনও বিরাম হয় নাই। আর ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তাঁহার যে প্রবল আগ্রহ দেখা যাইত, তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ যে এই মর্মবেদনাপ্রসূত, তাহা আমরা বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি।

এই সময়ে তিনি কয়েক মাস এক পার্বত্য গ্রামের ঠিক উর্ধ্বদেশে একটি গুহায় বাস করিয়াছিলেন। মাত্র দুইবার আমি তাঁহাকে এই সময়ের অনুভূতির উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমাকে কাজ করতে হবে, এই ধারণা আমাকে এই সময়ে যত অভিভূত করেছিল, এমন আমার সারা জীবনে কখনও হয় নি। মনে হোত, কে যেন আমাকে সবলে সেই গুহা থেকে গুহান্তরে জীবনযাপন হতে বিরত করে নীচে সমতল প্রদেশে বিচরণ করবার জন্য ফেলে দিল।' আর একবার তিনি একজনকে বলিয়াছিলেন, 'সাধু কিরকম জীবন যাপন করছে, সেইটাই তার সাধুত্বের পরিচায়ক নয়। কারণ, একজন গুহার মধ্যে বসে থেকেও অনায়াসে মনে মনে, রাত্রে কখানা রুটি মিলবে, এই প্রশ্নের বিচারে ডুবে থাকতে পারে।'

সম্ভবতঃ এই কালের অবসানেই, এবং যে শক্তি তাঁহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই একটি নিদর্শন-স্বরূপে, তিনি কন্যাকুমারিকায় মাতা কুমারীকে পূজা করিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রতপালন তিনি ধীরে-সুস্থে করিয়াছিলেন। তথাপি উহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসর মাত্র লাগিয়া থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক বিষয়টি লক্ষ্য ও অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ের যেসকল গল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের আর শেষ নাই। তিনি এত বন্ধু লাভ

করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের সকলের নাম-নির্দেশ অসম্ভব। তিনি শিখদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট মীমাংসা-দর্শন এবং জৈনদিগের নিকট জৈন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন; রাজপুতরাজগণ কর্তৃক গুরুরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন; মধ্য-ভারতে এক মেথর-পরিবারের সহিত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন; মালবারের জাতি গঠিত আচারাদির ন্যায় কূট বিষয়সকল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার জন্মভূমির বহু ঐতিহাসিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে যখন কন্যা-কুমারিকা পৌঁছিলেন, তখন তিনি এত দরিদ্র যে, মাতা কন্যাকুমারীর মন্দিরের অদূরবর্তী শৈলদ্বীপটিতে যাইবার নৌকাভাড়া পর্যন্ত তাঁহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কল্পিত পূজাদানের পর তিনি, হাঙ্গর থাকা সত্ত্বেও, প্রনালীটি সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজ হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালেই তিনি, যাঁহারা তাঁহাকে আমেরিকা প্রেরণ করিবার হেতুভূত হইয়াছিলেন, সেই অনুরক্ত শিষ্যমণ্ডলী লাভ করেন। অবশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ আন্দাজ তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া উক্ত মহাদেশে যাত্রা করেন।

কিন্তু এই যাত্রা করিতেও তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যেরা বলেন যে, ঐ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রথম পাঁচশত মুদ্রা তিনি তৎক্ষণাৎ পূজা-দানাদিতে ব্যয় করিয়া ফেলেন, যেন তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার ভার তিনি নিজ অদৃষ্টের স্কন্ধেই জোর করিয়া চাপাইয়া দিবেন। এমন কি, বোম্বাই পৌঁছিবার পরও তিনি পাশ্চাত্যে গমন করাই সঙ্গত, এইরূপ নিশ্চয়বোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে না হয়, এইরূপ মানসিক চেষ্টা, করিতে করিতে তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার গুরুদেবের মূর্তি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত

হইয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। অবশেষে তিনি গোপনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে এই পত্র লিখিলেন যে, সম্ভব হইলে তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন ও আশীর্বাদ করেন; এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন তিনি পুনরায় তাঁহার পত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই নূতনরকমের উদ্দেশ্যের কথা কাহাকেও না বলেন। এই পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমার আন্তরিক উৎসাহ ও তিনি যে তাঁহার জন্য ভগবৎসমীপে সদা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইবার পর তবে তিনি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। এবার আর অদৃষ্টকে এড়াইবার উপায় নাই। যে আত্মগোপনেচ্ছায় তিনি মঠ পরিত্যাগ করেন, সেই ইচ্ছার বশেই তিনি ভারতের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবামাত্র নাম পরিবর্তন করিতেন। ইহার অনেক বৎসর পরে একজন তাঁহার নিকট শ্রবণ করেন, কিরূপে তাঁহার শিকাগো নগরীর সেই প্রথম বিখ্যাত বক্তৃতার পর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তিনি, এইরূপ বিজয়গৌরব-লাভ সত্ত্বেও, এই ভাবিয়া মর্মযাতনা ভোগ করেন যে, তাঁহার আত্মগোপনের আশা একেবারে নির্মূল হইল। তিনি এখন লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে দণ্ডায়মান। অজ্ঞাত ভিক্ষুক আর অজ্ঞাত থাকিতে পারিলেন না।

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার এই সকল ভ্রমণের মধ্যেই আমি, যে সত্যসমূহ আমার গুরুদেবে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণীকৃত হইয়াছিল, তাঁহার সেগুলির উপলব্ধির তৃতীয় ও শেষ উপাদান দেখিতে পাই।

আমার মনে হয়, একথা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিবিধ প্রভাবের ফলে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল: প্রথমতঃ, তাঁহার ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র—যিনি, সমুদয় শাস্ত্র যে জীবনকে একবাক্যে

আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরূপ ছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, আমার যতদূর মনে হয়, তাঁহার ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—যাহার বলে তিনি উহাদিগকে এমন এক বিপুল সজীব ধর্মশরীরেরই অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অশেষ মহিমান্বিত গুরুদেবও স্বয়ং যাহার সাকার বিগ্রহ ও বাণী মাত্র ছিলেন। আমার মনে হয়, এই তিনটি প্রভাব তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা হইতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেছেন ও জগতের সম্মুখে স্বদেশবাসিগণের দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি প্রধানতঃ প্রাচীনকালের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন; অবশ্য যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা শুধু ঐসকল গ্রন্থপ্রতিপাদ্য সত্যগুলি তাঁহার গুরুদেবের জীবনে একাধারে সমষ্টীভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়া। যখন তিনি বলিতেছেন, 'ভক্তির আরম্ভ, স্থিতি ও পরিণাম প্রেমে', অথবা যখন তিনি কর্মযোগের বিশ্লেষণ করিতেছেন, তখন আমরা যেন চক্ষের সম্মুখে তাঁহার গুরুদেবকেই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই যে, শিষ্য অপর একজনের পাদমূলে যে জ্যোতির্ময় রাজ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন, শুধু তাহারই কথা বলিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন মাত্র। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার শিকাগো মহাসভাকক্ষে পঠিত বক্তৃতা অথবা ঠিক ঐরূপই অদ্ভুত 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর', অথবা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরের যে বক্তৃতাগুলিতে তিনি হিন্দুধর্মের মুখ্য ও সাধারণ লক্ষণগুলি চিত্রিত করেন, সেইগুলি পাঠ করি, তখন আমরা এমন কিছুর পরিচয় পাই, যাহা তাঁহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। এই সকল বক্তৃতার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ভারতভূমে দীর্ঘ-ভ্রমণেরই ফল। মনে হয়, এই ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া শেষ করিবার নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে,

তাঁহার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রদ্ধা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ফল নহে, উহা এই প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত। এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অনুমান-প্রক্রিয়াও সতেজ ও বর্ধনশীল ছিল, উহা নূতন নূতন ঘটনা-সংগ্রহের জন্য সদা উন্মুখ থাকিত, এবং প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুমাত্র ভয় পাইত না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি কি, ইহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতীয়গণের সম্পর্কিত সাধারণ হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা উপাদানগুলিও খুব বড় বড় দেখাইয়াছে। তাঁহার দেশে যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষালাভ করিয়াও তিনি, কতকগুলি নব্যপন্থীর ন্যায়, সন্ন্যাসী বা কৃষককুলকে, যাঁহারা প্রতিমাপূজা করেন বা যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা দ্বারা পীড়িত, তাঁহাদিগকে 'উহারা অখণ্ড ভারতবর্ষের অঙ্গবিশেষ নহে', বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। আর এই যে কাহাকেও বাদ না দিবার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা তিনি যে উঁহাদের সহিত একত্র বহু বৎসর ধরিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপ।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি ধারণাকে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত কার্যকারণ-সম্বন্ধে জড়িত করিলেই যে উহার সম্যক বিশ্লেষণ করা হইল, তাহা নহে। আমাদিগকে এখনও সেই মূল প্রেরণার কারণ নির্দেশ করিতে হইবে, যে অফুরন্ত শক্তি আজন্ম লাভ করায় একজন জগতের দৃশ্যসমূহকে অন্যাপেক্ষা অধিকতর অর্থবান বলিয়া মনে করেন। আর শুনিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের আশৈশব এই অন্তর্নিহিত সংস্কার ছিল যে, তিনি দেশের উপকার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেক পরে তিনি এইকথা মনে করিয়া গর্ব অনুভব

করিতেন যে, আমেরিকাগমনের পর প্রথম প্রথম তাঁহাকে যেসকল অবস্থাবিপর্যয় সহ্য করিতে হইয়াছিল—যখন ওবেলার আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন, তাহার ঠিকানা ছিলনা, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে তিনি যেসকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় একক্ষণের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যেসকল মহাত্মা কোন বিশেষ কার্য সংসাধিত করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এইরূপ একটি অদম্য আশা বর্তমান থাকেই থাকে। ইহা ভাবী মহত্ত্বের একটি গভীর ধারণা, ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না; উহার একমাত্র প্রকাশ জীবনে। হিন্দুদের চিন্তাপ্রণালী অনুসারে, এই ভাবী মহত্ত্বের ধারণা এবং আত্মাভিমান—এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ এবং আমার মনে হয়, স্বামীজীর জীবনেও ইহার পরিচয় তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের তৎসম্বন্ধীয় প্রশংসা দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন, এসকল অতিশয়োক্তি মাত্র।

যখন তিনি আঠার বৎসরের বালক, সেই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর-দর্শনে আগত একদল লোকের সঙ্গে তথায় আসিয়াছিলেন, এবং কোন এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠের অসাধারণ মাধুর্য এবং তাঁহার সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা জানিতেন বলিয়া, তাঁহার গান গাহিবার কথা উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটি গাহিলেন।

ইহাই যেন সঙ্কেতস্বরূপ হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, এই তিন বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। বাবা, তুমি এতদিনে এলে!' ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেইদিন হইতে তিনি তাঁহার অনুগত বালকবৃন্দকে একমনঃপ্রাণ করিয়া এমন একটি সঙ্ঘে পরিণত করিতে ব্যাপৃত হইলেন, যাঁহাদের 'নরেন্দ্র'র

(স্বামীজীর তখন উহাই নাম ছিল) প্রতি অনুরাগ চিরকাল অটুট থাকিবে।

তিনি যে মহাযশের ভাগী হইবেন, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে, অথবা তাঁহার প্রতিভা যে অসাধারণ, তাহা উল্লেখ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। যদি অধিকাংশ লোকের দুইটি, তিনটি অথবা দশটি বা বারটি গুণ থাকে, তবে তিনি নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শুধু এই বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহস্রটি গুণ আছে; তিনি সত্য সত্যই 'সহস্রদল পদ্ম'। উচ্চাধিকারিগণের মধ্যেও, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যদি কাহারও যেসকল গুণ শিবত্বের লক্ষণ, এরূপ দুটি গুণ থাকে, তাহা হইলে নরেন্দ্রের অন্ততঃ আঠারটি ঐরূপ গুণ আছে।

কোন ব্যক্তি ভণ্ড কিনা, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ এত চিনিতে পারিতেন যে, উহা সময়ে সময়ে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত করিত। একবার তিনি একটি লোককে খাঁটি বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, যদিও উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত ধার্মিক বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর সত্ত্বেও লোকটা "চুনকাম-করা কবর"! রাতদিন শৌচাচারী থাকা সত্ত্বেও ওর উপস্থিতি অপবিত্রতাজনক, আর নরেন্দ্র যদি ইংরেজের হোটেলে গো-মাংসও খায়, তথাপি সে পবিত্রই থাকবে—এমন পবিত্র যে, তার স্পর্শমাত্রেই অপরে পবিত্র হোয়ে যাবে।' এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি সর্বদা এই শিষ্য—যিনি ভবিষ্যতে নেতৃত্ব-পদবী লাভ করিবেন এবং অপর সকলে—যাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়ক হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে গুণসমূহের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভ্যাস ছিল যে, কোন নূতন শিষ্য তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহার যত রকম সম্ভব শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কারণ, একটি কলের ছোট নমুনা

(মডেল) দক্ষ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে যেরূপ সর্বাংশে অর্থবান, মানব-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গটি তেমনি তাঁহার সুশিক্ষিত চক্ষুতে অর্থবান বলিয়া প্রতীত হইত। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটি—নবাগতকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া তাহার নিদ্রাকালীন মনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। শুনিয়াছি, যাঁহারা বিশেষ সংস্কারবান, তাঁহাদিগকে তিনি এই সময়ে আপন আপন পূর্বজন্মবৃত্তান্ত আপনা হইতেই বলিতে দিতেন; আর যাঁহারা তদপেক্ষা হীন অধিকারী, তাঁহাদিগের নিকট উক্ত বৃত্তান্ত প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হইত। 'নরেন্দ্র'কে ঐভাবে পরীক্ষা করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন উপস্থিত সকলকে বলিলেন যে, যেদিন এই বালক জানিতে পারিবে সে কে এবং কিরূপ উচ্চাধিকারী, সে আর এক মুহূর্তও এই দেহধারণরূপ বন্ধন সহ্য করিতে চাহিবে না—এই প্রতিবন্ধসঙ্কুল জীবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, স্বামীজী এই জগতেই পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে। এই বিশেষ শিষ্যটির নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সেবা লইতে পারিতেন না। পাখার-বাতাস করা, তামাক সাজা, এবং অন্যান্য হাজার রকমের ছোট-খাট সেবা, যাহা সচরাচর শিষ্যেরা গুরুর জন্য করিয়া থাকে, সে সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অপরে নিষ্পন্ন করিত।

প্রাচ্যের বহু অদ্ভুত আচারের মধ্যে, যিনি জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ নহেন, এরূপ লোকের রন্ধিত দ্রব্য ভোজন করাব বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার ন্যায় আর কোন আপত্তিই দৃঢ়মূল নহে। আর এই বিষয়ে স্বামীজীর গুরুদেব স্ত্রীলোকের ন্যায় অবহিত ছিলেন। কিন্তু যাহা তিনি নিজে খাইতেন না, তাহা তিনি অবাধে তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে খাইতে দিতেন; কারণ, তিনি বলিতেন, নরেন্দ্র 'জ্বলন্ত আগুন', সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আবার বলিতেন, এই বালকের ভিতরে যে ঈশ্বরীয় সত্তা ছিল, তাহা

পুরুষসত্তা, এবং তাঁহার নিজের ভিতরে যে সত্তা, তাহা স্ত্রীসত্তা। এইরূপে, এই বালকের প্রতি একটি প্রশংসার ভাব—কার্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাও যে উহার সহিত মিশ্রিত ছিল না, এমন নহে—পোষণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অনেক মহৎ কর্ম সাধিত হইবে, এমন একটি বিশ্বাসের তিনি সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে ঐ বিশ্বাস স্বামীজীর অনেক কাজে লাগিয়াছিল—উহারই বলে তাঁহার কার্যসমূহ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য এবং সমর্থিত হইয়াছিল। কারণ, স্বামীজীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি সর্ববিধ বন্ধনের মোচনকর্তা ছিলেন। আর এটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে এমন কতকগুলি লোক থাকিবেন, যাঁহারা তাঁহার আচার-উল্লঙ্ঘন ও অলস ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষীর আচার-উল্লঙ্ঘনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমার ভারতবাসের প্রথম ভাগে এটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে এবং বারংবার চক্ষে পড়িয়াছিল যে, এই সঙ্ঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আদেশগুলির এই অংশটি যারপরনাই নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন। যেসকল ব্যক্তির জীবন কঠোরতম আচার-নিষ্ঠার, এমন কি, তপস্যার ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারাও, তাঁহাদের নেতা যেসকল য়ুরোপীয়কে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিতে রাজী ছিলেন। হয়ত মাদ্রাজে কেহ কেহ স্বামীজীকে জনৈক ইংরেজ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছিল; হয়ত কেহ বলিল, তিনি পাশ্চাত্যবাসকালে কখনও কখনও মদ্য-মাংস স্পর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এসকল শুনিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাইত না। উহার ভালমন্দ বিচার করা, কারণনির্দেশ দ্বারা উহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, এমন কি, আদৌ উহার যথেষ্ট কারণ এবং ওজর ছিল কি-না, তাহা জিজ্ঞাসা করাও তাঁহারা নিজ কর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিতেন না। তিনি

যাহাই করুন না কেন এবং যেখানেই তাঁহাদিগকে লইয়া যাউন না কেন, তাঁহারা অবিকারে তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিবেন, এইটুকুই তাঁহারা জানিতেন। আর একথা নিঃসন্দেহ যে, যিনিই এই দৃশ্যের আলোচনা করিবেন, তিনিই ইহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইত, স্বামীজীর পশ্চাতে এই গুরুভ্রাতৃগণ না থাকিলেও তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম তেমনই বিফল হইয়া যাইত। প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে একজন সম্প্রতি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ার করিবার জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি তাহাই? না, জগন্মাতার এক অখণ্ড মহীয়সী বাণীর এক অংশকে তাহার অংশান্তর হইতে নিশ্চয়পূর্বক পৃথক করিয়া দেখা যেমন অসম্ভব, তেমনি এই দুই জনের জীবনকেও পৃথক করিয়া দেখা অসম্ভব? এসকল জীবনের সম্যক আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই জীবনের অর্ধ আলোকময় অংশে অনেকগুলি মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, এবং ইহাদের কোনটির সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যতার সহিত বলিতে পারা যায় না যে, এইখানে ইহার নিজ পরিধির শেষ, অথবা এইখানে ইহার সহিত অপর যেগুলির সম্বন্ধ, তাহাদের পরিধির শেষ।

কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত-পরিবার

স্বামীজীর একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল। তাঁহাব প্রভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে মহান্ দেখাইত। তিনি উপস্থিত থাকিলে, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সকল কেহ না বলিয়া দিলেও লোকে আপনা হইতে ধরিতে ও বুঝিতে পারিত। আর যদি কেহ তাঁহাদের দোষ ও ত্রুটিগুলিও দেখিতে পাইত, তাহা হইলে মনে হইত, যেন সেগুলিও দোষাবহ নহে—সেগুলিরও যথেষ্ট কারণ আছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য থাকে। কেহ মানুষের শুধু বাহ্য অবয়ব ও ক্রিয়াকলাপই দেখে ও বুঝে। কেহ বা তাহার গঠনপরীক্ষা দ্বারা উহা মোটামুটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা নির্দেশ করে এবং ঐ বাহ্য অবয়বে নানা জটিল ভাবপ্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতেরই চিহ্ন দেখিতে পায়। কিন্তু অপর কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা মানবজীবনের পশ্চাতে সংখ্যাতীত কারণপরম্পরার সমাবেশ দেখিতে পান—এক-একটি জীবন যাহাদের খণ্ড পরিণাম মাত্র। আমাদেব কথা ও কার্যসকল কতটা জ্ঞানের ফলস্বরূপ, তাহা আমরা নিজেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথমেই কলিকাতায় আসিয়া স্বামীজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎসম্বন্ধে আমার ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতাও কতকটা পূর্বোক্ত প্রকারের। ঐ দিন হইতে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত আমি তাঁহাকে সর্বদা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যেই দেখিতে পাইতাম। তথায় কোন ভক্ত য়ুরোপীয় পরিবারের ব্যবধানটুকু পর্যন্ত ছিলনা। আমিও তাঁহাদের একজন হইয়া গেলাম এবং তাঁহাদেরই সহিত স্বামীজীর প্রতিভাসৃষ্ট অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে,

প্রতিপদে তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন কোন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে নরনারী সকলের আকৃতি যেন স্বভাবের অপেক্ষা বড় দেখাইত।

প্রথম হইতেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, যত শীঘ্র সুবিধা হয় আমি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিব। আর স্বামীজীর অবলম্বিত প্রণালীর ইহা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আমাকে এই কার্যারম্ভের জন্য তাড়া না দিয়া, আমায় ভ্রমণ করিবার ও মনে মনে ঐ কার্যেব জন্য প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট অবসর দিয়াছিলেন। আমি বেশ জানিতাম যে, বিদ্যালয়টি খোলা হইলে উহা দ্বারা প্রথমে শুধু ইহাই পরীক্ষা হইবে, কিরূপ গঠন প্রদান করিলে উহা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। বালিকাগণের অভাব কি, তাহা আমায় প্রথমে জানিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মধ্যে আমার নিজের স্থান কোথায়, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে, এবং যে সমাজের উন্নতিকল্পে আমাব সমুদয় চেষ্টা প্রয়োগ করিব, তাহাকেও তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিতে হইবে। একটিমাত্র জিনিস আমি জানিতাম—তাহা এই যে, সকল শিক্ষা-ব্যাপারের মূলভিত্তি শিক্ষার্থীর বিদ্যাবুদ্ধি-অনুযায়ী হওয়া চাই; সে যেন উহা দ্বারা তাহাব নিজের নির্দিষ্ট মার্গে উন্নতিলাভ করিতে পারে। কিন্তু ঠিক এই প্রকার করিতে হইবে, আমার এমন কোন নির্দিষ্ট সঙ্কল্প ছিল না বা কোন নির্দিষ্ট আশাও ছিল না; কেবল এইটুকু মনে ছিল যে, শিক্ষাবিষয়ক এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা ভারতীয় নাবীকুলের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয় এবং সকল অবস্থায় খাটে।[১]

১ এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, উক্ত বিদ্যালয়টি আমি যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তদপেক্ষাও অস্থায়ী রকমের হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার ক্রিস্টীন নামক স্বামীজীর জনৈকা আমেরিকান শিষ্যা ভারতীয়

সম্ভবতঃ আবার অনেকে এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা অধিক চিন্তা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মুখে আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম যে, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির বাহিরে থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাকালে কাশ্মীরে বেরনাগ বনের তাঁবুতে এই সকল প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। আমরা সকলে একখানা জ্বলন্ত-গুঁড়ির চারিধারে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে স্বামীজী আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বর্তমানে কি করবে স্থির করেছ?' আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, 'আমি চাই, আমার যেন কোন সহকারী না থাকেন। আমি অতি সামান্যভাবে এই কাজ আরম্ভ করব এবং ছেলেরা যেমন বানান করে করে পড়তে শেখে, তেমনি একটু একটু করে নিজের প্রণালী নিজে বেছে নেব। আর সকলের ওপর, আমি এই শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মভাবে অনুরঞ্জিত করতে চাই। আমার মতে সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপকারী।'

স্বামীজী এইসকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আমার কোন ইচ্ছাকেই তিনি কখনও বাধা প্রদান করিতেন না। এস্থলেও তাহাই হইল। অতঃপর তিনিই যেন শিষ্য এবং আমি যেন তাঁহার শিক্ষক হইলাম। ভারতীয় নারীগণের যে শিক্ষাকার্য তাঁহার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, তাহাকে আমি যত ইচ্ছা সাম্প্রদায়িক করিতে পারি, ক্ষতি নাই। আমার উক্তির এই অংশের উত্তরে তিনি শুধু ইহাই বলিয়াছিলেন, 'তুমি সাম্প্রদায়িকতার ভেতর দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতায়

স্ত্রীশিক্ষা-কার্যটির সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়া উহাকে প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালিত করিতে থাকেন। এবং একমাত্র তাঁহার চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ ইহার ঈদৃশ উন্নতির কারণ। ১৮৯৮ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি যে ভাবে উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছিলাম, তাহাতে শুধু আমার নিজেরই শিক্ষালাভ হইয়াছিল।

পৌঁছুতে চাও।' একজন মহিলা আমার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; আমি তাঁহাকে লওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবামাত্র স্বামীজী সে নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। শুধু একটি বিষয়ে তিনি অচল অটল রহিলেন—আমি ইহার পূর্বেই আর অল্প যে কয়জনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি কোনমতে তাহা সমর্থন করিলেন না। ভারতীয় চরিত্ররূপ মহা-সাগরের গভীরতা-পরিমাপক কোন যন্ত্র আমার এখনও ছিল না, এবং প্রথম হইতেই ভুল করিয়া বসা অপেক্ষা কাহারও সাহায্য না লইয়া অগ্রসর হওয়াও তিনি শতগুণে নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্যই আমি নভেম্বর মাসের প্রথমে একাকী কলিকাতায় পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে নগরের উত্তরপ্রান্তে আমি রাস্তা চিনিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। দ্বীপে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা স্বভাবতই কতকটা সামাজিক কঠোরতার পক্ষপাতী। সেই কারণেই বোধ হয় আমি কলিকাতার উত্তরপ্রান্তে পৌঁছিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্র বাস করিব, এই বলিয়া জেদ করিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে সেই সময়ে স্বামীজী কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারই সাহায্যে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, ভক্তগণের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নিকটেই স্ত্রীভক্তগণসহ বাস করিতেন। সেই দিনই আমি তাঁহার গৃহে একটি খালি ঘরে বাস করিবার অনুমতি পাইলাম। আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা আসে, যাহাদের দিকে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের তৎকালীন সাহস শুধু আমাদের অজ্ঞতারই ফল। ইহা বিধাতারই কৃপা বলিতে হইবে। তাহা না হইলে অন্য কিরূপে এরূপ সমস্যাগুলির সমাধান হইতে

পারিত, তাহা তো ভাবিয়া পাই না ; আবার একটা কিছু সমাধান না করিলেও গত্যন্তর ছিল না। তথাপি, যদি আমি এই সময়ে বুঝিতাম, আমার এই হঠকারিতায় শুধু আমার নিরপরাধা আশ্রয়-দাত্রীর নহে, তাঁহার দূরগ্রামস্থিত জ্ঞাতিকুটুম্বগণেরও কতটা সামাজিক গোলযোগের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে আমি কখনই সেইরূপ করিতে পারিতাম না। তাহা হইলে আমি যেমন করিয়াই হউক ঐ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, আমি মনে করিলাম, জাতিভেদ বুঝি নির্বোধ লোকদের ব্যক্তিগত কুসংস্কার মাত্র—বিদেশী লোকেরা নিশ্চয়ই অনাচারী হইবে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাই উহার কারণ, এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইলে উহা আপনিই চলিয়া যাইবে। এইরূপে, সমস্ত অজ্ঞতাটুকু তাঁহারই, হৃষ্টচিত্তে এইরূপ ধারণা করিয়া, আমি জোর করিয়া এই ভারতীয় মহিলার গৃহে অতিথি হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে স্বামীজীর প্রভাব সর্ববিজয়ী হইল—সমাজ আমাকে গ্রহণ করিলেন। আট-দশ দিনের মধ্যেই খুব নিকটে আমার জন্য একটি বাড়ি মিলিল। কিন্তু তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ঘরেই অতিবাহিত করিতাম। তারপর গ্রীষ্ম আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে আমি তাঁহার গৃহেই শয়ন করিতে লাগিলাম। তথায় অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত ছিল। তখন আর আমার জন্য কোন পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল না। অপর সকলে যে ঠাণ্ডা সাদাসিধা ঘরটিতে শয়ন করিতেন, আমিও সেখানে শয়ন করিতাম। লাল সুরকির পালিশ-করা মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছান, তাহার উপর এক-একটি বালিশ ও মশারি—ইহাই ঘরটির শয়নের আসবাব।

এখন আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইলাম, তাহা এক অদ্ভুত রকমের। নীচের তলায়, প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের ঘর দুইটির একটিতে এক সাধু থাকিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই এরূপ

উৎকট তপস্যা করিয়া আসিতেছিলেন যে, যৌবন অতিক্রম না করিতেই ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘরে আমি বাঙ্গালা শিখিতে যাইতাম। পিছনের রান্নাঘরে তাঁহারই এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম করিতেন। ছাদ ও বারান্দাসমেত সমস্ত উপরতলা আমাদের—মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অদূরেই গঙ্গা; উপরতলা হইতে গঙ্গাদর্শন হইত।

আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির যিনি কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াই যেন ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কথা সকলেই জানেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পর তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ[১] বয়স পর্যন্ত তাঁহার স্বামী তাঁহার কথা ভুলিয়া যান। পরে তিনি মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহার পল্লীগ্রামের গৃহ হইতে পদব্রজে গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে স্বামীর সকাশে উপস্থিত হন। পতির দাম্পত্য-বন্ধনের কথা স্মরণ হইল; কিন্তু তিনি যে জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কি আদর্শ, তাহা বলিতে লাগিলেন। পত্নীও প্রত্যুত্তরে তাঁহার ঐ পথে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিয়া শুধু শিষ্যার ন্যায় তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। সেই সময় হইতে তিনি স্বামীর নিকট সেই বাগানেরই একটি বাড়িতে বহু বৎসর যাবৎ বিশ্বস্তভাবে বাস করেন। তিনি একাধারে সন্ন্যাসিনী ও ধর্মপত্নী ছিলেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের মধ্যে বরাবরই সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। যখন তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, তখন তিনি অল্পবয়স্কা ছিলেন; পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কত বিভিন্নমুখী ছিল, তাহার বর্ণনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব

১ তৎপূর্বে প্রধানতঃ একবার চতুর্দশ বৎসর বয়সে, কামারপুকুরে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে কিছুদিন বাস ঘটিয়াছিল।—অনুঃ

জিনিস গুছাইয়া রাখার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং অতি তুচ্ছ বিষয়ে, যেমন প্রদীপ জ্বালিবার সাজসরঞ্জামগুলি দিনের বেলায় কোথায় রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পর্যন্ত তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। তিনি কোন বিষয়ে কৃপণতা দেখিতে পারিতেন না, এবং উগ্র কঠোরতা সত্ত্বেও লালিত্য, সৌন্দর্য ও চালচলনে ধীর গম্ভীর ভাব বিশেষ পছন্দ করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে এই সময়ে একটি গল্প শুনা যায়। তিনি একদিন হর্ষোৎফুল্ল শিশুর ন্যায় আগ্রহ ও গর্বভরে এক ঝুড়ি ফলমূল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে উহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কিন্তু এত বেশী বেশী কেন?' সহসা বিফল-মনোরথ হইয়া বালিকা-পত্নীর সমস্ত আনন্দ কোথায় অন্তর্হিত হইল। 'অন্ততঃ এ আমার জন্য নয়'—শুধু এই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া নীরবে অশ্রুপূর্ণলোচনে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাছে যে বালকগুলি বসিয়াছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোদের মধ্যে একজন কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্যন্ত উড়ে যাবে।'

তিনি তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন! তথাপি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একটি প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার আরাধ্য পতির বিষয়ে কথা কহিবার সময়, তিনি নিজে যেন কেহই নহেন, এই ভাবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক কথাটি যে সত্য হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পদে বিপদে 'অচল, অটল, সুমেরুবৎ'—তাঁহার সকল ভক্তই একথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করেন, এবং তাঁহার কথাবার্তায় এমন একটি শব্দও থাকে না, যাহাতে 'আমি তাঁহার অমুক' এই বলিয়া এতটুকু আত্মগরিমা প্রকাশ পায়। যে তাঁহার পরিচয় জানে না, সে তাঁহার কথাবার্তা হইতে ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারিবে না যে, উপস্থিত অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার

শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অধিক স্বত্ব আছে, বা তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার সম্বন্ধ নিকটতর। মনে হয়, যেন তাঁহার 'তিনি পতি, আমি পত্নী', এই ভাব বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। তৎস্থলে আছে শুধু 'তিনি গুরু, আমি শিষ্যা', এই ভাব; পত্নীর ন্যায় নিষ্ঠাটুকু পূর্বভাবের পরিচয় দিতেছে মাত্র। তথাপি তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও, তাঁহার সহিত একত্র ভ্রমণকালে, রেলগাড়িতে তাঁহার বেঞ্চির উপরের তাকে স্থানগ্রহণ করিবেন না। এস্থলে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল। তাঁহার উপস্থিতিই তাঁহাদের নিকট পরম পবিত্রতাস্বরূপ।

আমার বরাবর এইরূপ মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই। কিন্তু তিনি কি এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণস্থল, অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল? অত্যন্ত সরল স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি আমার চক্ষে তাঁহার সাধুত্ব যেরূপ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার সম্ভ্রান্ত কুলোচিত শিষ্টাচার ও মহদুদার মনও প্রায় সেইরূপ অসাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। যত নূতন বা জটিল প্রশ্নই তাঁহাকে করা হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনও উদার ভাবের মত প্রকাশে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। সারাজীবন ধরিয়া তিনি নীরবে অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা করিয়াই আসিতেছেন। তাঁহার যত কিছু অভিজ্ঞতা, সকলের মূলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস রহিয়াছে। তথাপি তিনি সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা দিতে সদাই তৎপর। তাঁহার পরিবারস্থ কেহ যদি দুষ্টামি দ্বারা তাঁহাকে উত্যক্ত করে, তাহা হইলে এক অদ্ভুত শান্ত ও প্রগাঢ় ভাবমাত্র তাঁহার আননে প্রকাশ পায়। যদি কেহ তাঁহার বুদ্ধির অতীত নূতন কোন সামাজিক পাকচক্রে বিপদে পড়িয়া বা কষ্ট পাইয়া তাঁহার নিকটে আসে, তাহা হইলে তিনি অভ্রান্ত

অন্তর্দৃষ্টিবলে তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয়ের সমস্ত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশ্নকর্তাকে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ বলিয়া দেন। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহার জন্য তাঁহাকে কঠোর হইতে হইবে, তাহা হইলে অনর্থক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হইয়া তিনি কদাপি তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করেন না। যে ব্রহ্মচারীকে তিনি ভিক্ষা করিয়া এত বৎসর কাটাইতে হইবে বলিয়া আদেশ দিবেন, তাঁহাকে সেই ঘণ্টার মধ্যেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে! তাঁহার চক্ষে যে ব্যক্তি শ্লীলতা ও সাধুতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সে আর কদাপি তাঁহাকে মুখ দেখাইতে পারিবে না। এইরূপ অপরাধে অপরাধী এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'দেখছ না যে, তুমি ওর ভেতরকার নারীত্বকে আঘাত করছ? এরকম করা মহা হানিকর।'

তথাপি তাঁহার জনৈক শিষ্যা, তাঁহার গীত-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিই সেইরূপ 'সঙ্গীতে ভরপুর' ছিল। তাঁহার কোমলতা ও কৌতুক-প্রিয়তা অসাধারণ ছিল। তিনি যে ঘরটিতে পূজাপাঠাদি করেন, তাহা মাধুর্যে পূর্ণ হইয়া থাকে।

মাতাঠাকুরানী পড়িতে জানেন এবং তাঁহাব অধিকাংশ সময় রামায়ণপাঠে ব্যয়িত হয়। তিনি কিছু লিখেন না। তথাপি কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, তিনি একজন অশিক্ষিতা রমণী। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে শুধু কিরূপে সংসাব চালাইতে হয়, কি করিলে প্রকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয়েই কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থগুলির অধিকাংশ দর্শনও করিয়াছেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে তিনি মানুষের ভাগ্যে যতদূর চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব, তাহা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন

অভিনব ধর্মভাবকে তৎক্ষণাৎ সম্যকরূপে বুঝিয়া লইবার ক্ষমতাতে ইঁহার যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই শক্তির প্রথম পরিচয় আমি কয়েক বৎসর পূর্বে, তিনি একবার ঈস্টারের দিন অপরাহ্ণে যখন আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে প্রাপ্ত হই; তৎপূর্বে আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই আমি, তিনি জীবনে যে আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতাম; সুতরাং তাঁহাকে ইহার বিপরীত কোন অবস্থায় লক্ষ্য করিবার কথা আমার মনেই উঠে নাই। যাহা হউক, যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ আমাদের সমস্ত বাড়িখানি ঘুরিয়া দেখিবার পর ঠাকুর-ঘরটিতে বসিয়া খৃষ্টানদিগের এই উৎসব সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তারপর আমাদের ছোট ফরাসী অর্গ্যানটির সহযোগে ঈস্টার-দিবসোচিত গীত ও বাদ্য হইল। খৃষ্টের পুনরুত্থানসম্বন্ধীয় এই সকল স্তোত্র বিদেশীয় ও অপরিজ্ঞাত হইলেও, মা অক্লেশে উহাদিগের মর্ম বুঝিয়া লইলেন এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই মর্মানুধাবন ও সহানুভূতিতেই আমরা সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্মরাজ্যে অসাধারণ উন্নতিলাভের একটি অতীব হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইলাম। তাঁহার অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই এই শক্তির অল্প-বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাতে এই শক্তির সেইরূপ একটা জোর ও নিশ্চয়তা দেখা যাইত, যাহা কোন উচ্চদরের সুগভীর পাণ্ডিত্যে দেখা যায়।

আর একদিন সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁহার এই গুণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তপরিবৃত

হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে য়ুরোপের বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা করিতে বলিলেন। যথেষ্ট হাস্যকৌতুকসহকারে আমরা, তাঁহার কথামত, একবার পুরোহিতের অংশ, পরক্ষণেই বরকন্যার অংশ, অভিনয় করিয়া দেখাইতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহের শপথটি শুনিয়া মাতাঠাকুরানীর মনে যে ভাবোদয় হইল, আমাদের উভয়ের কেহই সেইরূপ হইবে বলিয়া অনুমান করিতে পারি নাই।

'সম্পদে বিপদে, ঐশ্বর্যে দারিদ্র্যে, রোগে স্বাস্থ্যে—যাবৎ মৃত্যু আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে'—এই কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মা যেমন ঐ কথাগুলির প্রশংসা করিলেন, এমন আর কেহই নহে। তিনি বারংবার ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করাইলেন এবং বলিলেন, 'আহা, কি অপূর্ব ধর্মভাবপূর্ণ কথা!'

যেসকল রমণী এই সময়ে প্রায় সর্বদা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গৃহে বাস করিতেন—গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা সকলেই বিধবা; গোপালের মা এবং লক্ষ্মী দিদি আবার বালবিধবা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা ছিলেন—তিনি যে সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বাস করিতেন, সেই সময়কার শিষ্যা। লক্ষ্মীদিদি তো তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীই ছিলেন, এবং এখনও তাঁহার বয়স তেমন অধিক হয় নাই। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি একজন বহুগুণশালিনী রমণী, এবং সকলেই তাঁহাব গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে চান। কখনও তিনি কোন যাত্রার পালা হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কোন ধর্মভাবমূলক কথোপকথন আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কখনও বা দেবদেবী সকলের বিভিন্ন মূর্তিগুলির নকল করিয়া নীরব গৃহটিকে হাস্যমুখরিত করিয়া তুলেন। একবার কালীমূর্তির,

পরক্ষণেই সরস্বতীমূর্তির, কখনও বা জগদ্ধাত্রীর, আবার কখনও বা কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির নকল করিতেন, এবং উহাতে নাটকীয় উপাদান অল্প থাকিলেও তিনি উহা হইতে বেশ আসর জমাইয়া লইতেন।

শুনা যায়, এই প্রকারের আমোদপ্রমোদে শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিশেষ অভিমত ছিল। স্ত্রীভক্তগণেব মুখে শুনিয়াছি, তিনি নিজেই ধর্মভাবোদ্দীপক কোন নাটক ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া, কবিতাকারে গ্রথিত সেই সকল স্তবপূজাদির গূঢ় মর্ম সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

গোপালের মা অতি বৃদ্ধা ছিলেন। পনের-কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন তিনি তাঁহাব কামারহাটির গঙ্গাতীরস্থ কুটীরখানি হইতে একদিন মধ্যাহ্নে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিতে আসেন, তখনই তিনি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—যেন তিনি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গোপালের মা দীর্ঘকাল যাবৎ বালগোপাল মূর্তির উপাসক ছিলেন, তিনি নিকটবর্তী হইবামাত্র যেন ধ্যাননেত্রে দেখিলেন, তাঁহার ইষ্ট-মূর্তি সম্মুখে বিবাজ করিতেছেন। তাঁহার এই বিষয়েব নিষ্ঠা চিরকাল অপরিসীম ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এখন হইতে মাতা জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এবং ইহাব পর গোপালের মা যতদিন জীবিতা ছিলেন, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কদাপি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নাই। আমিও তাঁহাকে কখনও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর উল্লেখকালে 'বউমা' ছাড়া অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই।

যে কয়মাস আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও তাঁহাব স্ত্রীভক্তগণ সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম, গোপালের মা কখনও কলিকাতায় থাকিতেন,

কখনও বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কামারহাটিতেই বাস করিতেন। এক পূর্ণিমা-রজনীতে আমরা কয়েকজন তাঁহাকে তথায় দর্শন করিতে যাই। ক্ষুদ্র নৌকাখানি যখন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন গঙ্গাবক্ষে কি অপরূপ শোভা বিরাজ করিতেছিল! এক দীর্ঘ সোপানশ্রেণী জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, উন্নতঘাট অতিক্রম করিয়া, শষ্পাবৃত প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাও কি সুন্দর দেখাইতেছিল! তাহারই দক্ষিণে বারান্দা। এই বারান্দার এক প্রান্তের একটি ছোট ঘরে গোপালের মা বহু বর্ষ ধরিয়া বাস ও ধ্যানজপ করিয়াছেন। তাহারই পার্শ্বে এক বৃহৎ অট্টালিকা; এই অট্টালিকারই কোন কর্মচারীর জন্য এই ছোট ঘরটি প্রথমতঃ নির্মিত হইয়া থাকিবে। অট্টালিকা এখন শূন্য। গোপালের মার ছোট ঘরখানিতেও আসবাবপত্রের নামগন্ধ নাই। প্রস্তরময় ঘরের মেঝেই তাঁহাব শয্যা। আর অতিথিগণকে তিনি যে মাদুরে বসিতে দিলেন, তাহাও তাকের উপবে গুটানো ছিল; নামাইয়া লইতে হইল। যে একমুঠা খই-বাতাসা তাঁহাব একমাত্র সম্বল ছিল, এবং যাহা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তিনি অতিথিগণকে সংবর্ধনা করিতে পারিলেন না, তাহা একটি শিকায় ঝুলান মাটির পাত্র হইতে লওয়া হইল। কিন্তু স্থানটিতে এতটুকু ময়লা নাই; তিনি নিজে কষ্ট করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া উহা সর্বদা ধৌত করিয়া থাকেন। তাঁহার হাতের কাছে একটি কুলুঙ্গীতে একখানি পুরাতন রামায়ণ, তাঁহার বৃহৎ জীর্ণ চশমাখানি ও তাঁহার হরিনামের ঝুলিটি রক্ষিত ছিল। এই মালা জপ করিয়াই গোপালের মা সিদ্ধা হইয়াছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বহু বৎসর যাবৎ তিনি দিবারাত্র ঐ মালাজপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

শুভ্রোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বাহিরের গাছপালা ও ফুলগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন এক শ্বেতমর্মরের স্বপ্নরাজ্যে কতকগুলি কালছায়ামূর্তি নড়িতেছে ও ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে।

কিন্তু আমাদের এই সদাব্যস্ত জগতের মধ্যে গোপালের মার নীরব গভীর শান্তির স্মৃতিমণ্ডিত এই ছোট ঘরখানি যেসকল চিন্তার উদয় করিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কোন কিছুই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে না। আমাদের এই স্থান-দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'আহা! তোমরা যা দেখছ, তাই হচ্ছে প্রাচীন ভারত—যখন লোকে সজলনয়নে প্রার্থনাপরায়ণ থাকত, যখন রাত্রিজাগরণ ও উপবাস লোকের নিত্যকার ব্যাপার ছিল। সে ভারত ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে, আর কখনও ফিরে আসবে না।'

কলিকাতার বাড়িতে একজন য়ুরোপীয় রমণী থাকার জন্য গোপালের মার আশী বৎসরের সংস্কারে যে একটি আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, হয়ত অন্যের অপেক্ষা তাঁহার এই বিষয়টা একটু বেশী চক্ষে ঠেকিয়াছিল। কিন্তু একবার এই ভাবটিকে জয় করিবার পর তিনি বদান্যতার প্রতিমূর্তিস্বরূপা ছিলেন। রক্ষণশীল তিনি বরাবরই ছিলেন, কিন্তু জিদ করিয়া কোন কুসংস্কারকে কদাপি ধরিয়া রাখিতেন না। যেভাবে আমাদের প্রত্যহ দিন কাটিত, তাহাতে তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ নিজ আশ্রম ও মাতাঠাকুরানীর বাড়ির পূজার্চনাদি কর্মের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। দিবারাত্র শান্তি ও মধুরতা বিরাজ করিত। সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই এক এক করিয়া সকলে নীরবে গাত্রোত্থান করিতেন, এবং মাদুরের উপর হইতে চাদর ও বালিশ সরাইয়া ফেলিয়া, মালা লইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া জপ করিতে বসিতেন। তৎপরে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও স্নান আরম্ভ হইত। কোন পর্বদিনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও অপর একজন পাল্কী করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত রামায়ণপাঠে সময় অতিবাহিত হইত।

তারপর শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরে পূজা আরম্ভ করিতেন। অল্পবয়স্কা রমণীগণ সকলেই সেই সময়ে দীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধূপ-ধুনা

দেওয়া, গঙ্গাজল আনা এবং পুষ্প-নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন। গোপালের মা পর্যন্ত এই সময়টিতে ফলমূলাদি ছাড়াইয়া সাহায্য করিতেন। পরে মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন হইত। অপরাহ্নটিতে সকলে বিশ্রাম করিতেন। তৎপরে সন্ধ্যা হইবামাত্র ঝি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাইয়া যাইত, অমনি আমাদের গল্পগুজব বন্ধ হইয়া যাইত। সমবেত সকলেই উঠিয়া পড়িতেন, এবং আমাদের প্রত্যেকেই দেবমূর্তি বা চিত্রের সম্মুখে প্রণাম করিতেন, এবং গোপালের মার ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর চরণবন্দনা করিতেন। অথবা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছাদে তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিতেন। আর যিনি ইহার পর কন্যার ন্যায় মাতাঠাকুরানীর সান্ধ্যধ্যানকালে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গুরুপ্রণাম শ্রবণ করিতে পাইতেন, তিনি যে পরম ভাগ্যবতী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পূজার আদিতে ও অন্তে তিনি এই গুরুপ্রণাম করিতেন।

ভারতের পরিবারমাত্রই আপনাকে সর্বদা আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগানে রত বলিয়া মনে করে। তাঁহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার ও দৈহিক শুচিতার অভ্যাসও যেন অনির্বচনীয় মূল্যবান ও পবিত্র; উহা যেন জাতির একটি চিরন্তন রত্ন, সুদূর অতীত হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যেন উহাকে নিখুঁত অবস্থায় ভাবী বংশধরদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতে হইবে। এই চিন্তাপ্রণালীই আদর্শ পবিত্রতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মাতৃত্বের পূজারূপ দুইটি বস্তুর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া সমগ্র ভারতীয় চরিত্রের সঞ্চালিনী ও সংযমনী শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশ সরলতার উপাসক, এবং কোন ইতরজনোচিত ভাব যে প্রাচ্য জাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, তাহার একটি প্রধান কারণ ইহাই।

কিন্তু কেহই ঠিক তাহার প্রয়োজন মুহূর্তে এরূপ একটি রহস্য

আবিষ্কার করিতে পারে না; তাহার অতি সহজ কারণ এই যে, কেহই নিজেকে নিজের মনের গণ্ডির এতটা বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না, যেখান হইতে সে দেখিতে পায় যে, অপরে শুধু যে পৃথক পৃথক সংস্কারসমষ্টি লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাই নহে, অধিকন্তু ঐসকল সংস্কারের মূল্য সম্বন্ধে তাহাদের জন্মগত এক একটা পৃথক ধারণা আছে। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীজীকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, এবং তাঁহাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে যেসকল পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ লক্ষিত হইত সেইগুলি লইয়া মাথা ঘামাইয়া, আমি এই তথ্যটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, এবং তাহাতে অনেক জিনিস আমার নিকট সহজ হইয়াছিল। অন্য সকলেব অপেক্ষা তিনি পরিষ্কারভাবে জানিতেন যে, চবিত্রই সব, অথবা তাঁহার ভাষায়, 'দেশাচার কিছুই নয়'; তথাপি যে সকল আচার-ব্যবহারাদির সহিত তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন, তাহাদের শ্রেষ্ঠতা ও অর্থবত্তা বর্ণনা করিতে করিতে কেহই তাঁহাব ন্যায় আত্মহাবা হইয়া যাইতে পারিতেন না। তাঁহার স্বদেশবাসিগণের আচার-ব্যবহার তিনি কবির চক্ষে ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার কল্পনা-সহায়ে দেখিতেন। 'দেশাচার যে কিছুই নয়,' তাহা তিনি সেই সময়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, যেসকল জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত, তাহাদিগের মধ্যেও আদর্শ নারীচরিত্র ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং দেখিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সান্ধ্য পরিচ্ছদগুলিতেও লজ্জা-সরমের যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু এই সকল দেখিয়াও তাঁহাদের স্বদেশের লোকাচারগুলির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। বিধবার নিরাভরণ শ্বেত অবগুণ্ঠন তাঁহার নিকট শুধু শোকের চিহ্ন বলিয়া নহে, পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়াও বোধ হইত। সন্ন্যাসীর গৈরিক কৌপীন-বহির্বাস-ধারণ, মেঝের উপর মাদুরমাত্রে রচিত শয্যা, থালার পরিবর্তে কলাপাতায় আহার, হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তোলা এবং জাতীয় পরিচ্ছদ-পরিধান—এগুলিকে

তিনি যেন সত্যসত্যই মহাপবিত্র ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এইগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির বা মানবহৃদয়ের কোমলতার কোন-না-কোন রহস্যের ইঙ্গিত পাইতেন। আর, তিনি এই সকলের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠার ভাব পোষণ করিতেন যে, সাধ্য হইলে তিনি যেন সমগ্র জগৎকে জয় করিয়া উহাদের পদানত করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, আর তাহাতে অক্ষম হইলে যেন মনে করিতেন যে, উহাদের পরাজয়ে ভাগী হওয়াই ইহজীবনে স্বর্গসুখভোগ।

এইরূপে তিনি আমাকেও এই মধুর সঙ্গীত গাহিতে শিখাইয়াছিলেন; সত্য বটে, ক্ষীণ ও কম্পিতকণ্ঠে, তথাপি এই মহান্ সঙ্গীতের অপরাপর গায়কগণের সহিত কতকটা এক সুরে। তাঁহাদের সহিত ঐ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আমি উহাব মধ্য দিয়া একটি জাতির আদর্শ ও হৃদয়-সম্বন্ধীয় কি রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তাহাই নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতাম।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত এই কয় মাসের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা বেশ আনন্দ দান করিয়াছিল। আমার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি কালীপূজার দিনে আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বয়ং আসিয়া প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি অতি মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণকে আশীর্বাদ করিলেন; গোলাপমা তাহা সকলকে শুনাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হোয়ে ওঠে।' কেন তাহা জানি না, কিন্তু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর উচ্চ মন ও হৃদয়ে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটির স্মৃতি বর্তমান থাকিয়া তাঁহাকে উহার কল্যাণার্থ প্রার্থনায় প্রবৃত্ত করে, এইটুকু জানাই আমার নিকট অপূর্ব আশীর্বাদ বলিয়া বোধ হয়, উহাতে হৃদয় ভরিয়া যায়। ভবিষ্যতের শিক্ষিতা

হিন্দু স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।

স্বামীজী সচরাচর কলিকাতা হইতে তিন-চার মাইল দূরে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত মঠে বাস করিতেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন, এবং প্রতিবারই আমাকে হয় মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত ভোজন করিতে ডাকিয়া পাঠাইতেন, এবং যাঁহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অতি সামান্য কার্যগুলিতেও অনেক সময় এমন অর্থ নিহিত থাকিত, যাহা নূতন লোকের চক্ষে পড়ে না। একদিন যখন তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকে তাঁহার জন্য কোন পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই অনুরোধের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। তারপর যখন আমি শুনিলাম যে, উহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তিনি উহার অতি অল্পই নিজে গ্রহণ কবিয়া অবশিষ্টাংশ অপর সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, তখন আমি দুঃখিতই হইয়াছিলাম। আমি তখন বুঝি নাই যে, এই ব্যাপারের একটা ধর্মানুগত অভিপ্রায় আছে। কি গভীর দৃষ্টি ও দয়ার সহিত তিনি, এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও, সর্বদা আমাকে হিন্দু-সমাজে (আমি ত একজন বিদেশী) আশ্রয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বুঝিবার শক্তিলাভ করিতে আমার অনেক মাস লাগিয়াছিল। তিনি আমায় কাশ্মীরে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সারা জীবনের উদ্দেশ্য 'খৃষ্টীয় ও ইসলাম ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মকে অপর মতের উপর প্রভবিষ্ণু করা,' আর যেসকল উপায়ে তিনি ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার প্রয়াস করিতেন, এইটি তাহার অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তিনি যে ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন,

তাহাতেও তাঁহার ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির আদান-প্রদান-সঙ্ঘটন ও উহাদিগকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা।' এই সংজ্ঞাটি কত উৎকৃষ্ট ও ভারতের বর্তমান অবস্থার কিরূপ উপযোগী, তাহা যত দিন যাইতেছে, ততই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার মতে হিন্দু-ধর্মকে নিজ মতবাদ লইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না; উহাকে দেখাইতে হইবে যে, সমগ্র আধুনিক উন্নতিটাকেই আলিঙ্গন ও বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার আছে। তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায়ের জোড়াতাড়া দেওয়া সমষ্টিমাত্র নহে, উহা অখণ্ড, সজীব এবং সকল ধর্মের মাতৃস্থানীয়; মাতার ন্যায় হিন্দুধর্ম তাঁহার সকল সন্তানকেই স্বীকার কবিয়া থাকেন, নূতনগুলি হইতে ভয় পান না; তিনি তাঁহার সকল দেশের সকল সন্তানেরই ভালবাসার জন্য লালায়িত, প্রাজ্ঞ, দয়াশীল। তিনি নিজেই নিজেকে পরিচালিত করেন; তিনি সকলকে পরস্পরের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। সর্বোপরি তাঁহার নিজের একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি আছে, জগতের জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার জন্য তাঁহার একটি বিশেষ বার্তা আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের গুণ এইরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি চরিত্রবল ব্যতীত অন্য কোন শক্তির উপরই নির্ভর করিতেন না। সত্য বটে, তাঁহার ধর্মমতরূপ মন্দিরটি নির্মাণ করাই আসল জিনিস; কিন্তু তজ্জন্য অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে, এবং জগতের স্বাভাবিক গতিও উহার অনুকূল। তাঁহার নিজের এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু উত্তম ইষ্টক বাছিয়া লওয়া। আর এই নির্বাচন, তিনি যাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বা আকর্ষণী শক্তি বা বলের পরিমাণ দেখিয়া করেন নাই; তিনি সর্বদা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সরল একনিষ্ঠতার জন্য, এবং যতদূর বোধ হইত, একমাত্র তাহারই জন্য উহাদিগকে নির্বাচন করিতেন। একবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার পর তিনি সকলের

সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করিতেন—মুক্তি নহে, ত্যাগ; আত্মানুভূতি নহে, আত্মত্যাগ। আবার ইহাও অনেকটা মানুষের পক্ষ হইতে—ভগবানের প্রীত্যর্থ বলিস্বরূপে নহে। যাহা কিছু কর, মানুষের জন্য কর—শিষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট তিনি এই কথাই বার বার বলিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন শিষ্যা যেন কদাপি মঠে একদিনকার পুণ্য অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত না হন—যেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষস্বরূপেই যেন স্বামীজী তাঁহাকে শিবপূজা করিতে শিখান, এবং তৎপরে ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া ঐ শুভ কর্ম সমাধা করেন। একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া, তিনি যেন তাঁহার নিকট যে-কেহ উপদেশ লইতে আসিবে, সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণবিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'

পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজীর সহিত কয়েকটি দিন

আমরা ৩১শে জুলাই লণ্ডন পৌঁছিলাম, এবং যে সমুদ্র-যাত্রাটি আমার নিকট এত চিরস্মরণীয় হইয়াছিল, তাহারও অবসান হইল। স্বামীজী উইম্ব্‌ল্‌ডনে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু বৎসরের এই সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের অধিকাংশই লণ্ডনে ছিলেন না। এদিকে আমেরিকা হইতে তাঁহার নিকট ক্রমাগত নিমন্ত্রণপত্র আসিতেছিল। এই কারণে অল্পদিন পরেই তিনি ঐসকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য—সেখানে হাড্‌সন্ নদীতীরবর্তী এক রমণীয় পল্লীনিবাসে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে অতঃপর কোথায় কার্য করিতে হইবে, এই বিষয়ে ভগবানের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিবেন। এই ইঙ্গিত যে আসিবেই, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একমাস পরে আমি সেই ভবনেই অতিথি হইলাম, এবং ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ ছয়-সাত সপ্তাহ কাল প্রত্যহ তাঁহার দর্শনলাভ করিতাম। ঐ তারিখে আমরা সকলে পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম এবং স্বামীজী তৎপরে নিউইয়র্ক ও তৎপার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ মাসের শেষে তিনি শিকাগো হইয়া কালিফোর্ণিয়া গমন করেন—তখন আমি শিকাগোতেই ছিলাম। পরবর্তী জুন মাসে (১৯০০ খৃঃ) আমি পুনরায় নিউইয়র্কে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করি। সেখানে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এবং পরে প্যারিসেও কয়েক সপ্তাহ তাঁহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ পাইতাম; শেষে সেপ্টেম্বর মাসে, ব্রিটানিতে আমি তাঁহার সহিত একই ভবনে আমেরিকাবাসী বন্ধুগণের অতিথিরূপে একপক্ষ কাল অতিবাহিত করি। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শিক্ষালাভের যে অমূল্য স্মৃতি আমার মনোমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি এখানেই।

কারণ, ইহার পর যখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে আমি আচার্যদেবকে ভারতবর্ষে দর্শন করি, সে শুধু তাঁহার শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার এবং অন্তিম বিদায় লইবার জন্য।

শিষ্যমাত্রকেই নিজে একটা কিছু না করিয়া সর্বদা শান্ত-সংযতভাবে গুরুর আদেশ পালন করিয়া যাইতে হয়; কিন্তু যখন গুরু স্থানান্তরে গমন করেন, তখন ঐ শিষ্যকেই আবার তৎক্ষণাৎ যথাশক্তি উদ্যম ও কার্যকারিতা প্রকাশ করিতে হয়। এই শেষোক্ত-রূপ আচরণই স্বামীজী তাঁহার শিষ্যগণের দিকট সর্বদা প্রত্যাশা করিতেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, যখনই কোন যুবক সাধু কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস মঠবাসের পর 'এখনও কিছু শিখলাম না,' বলিয়া অভিযোগ করিত, তখনই তিনি তাহাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পূর্বাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন; সেখানে গেলেই সে দেখিতে পাইত, বাস্তবিক সে কতটা জিনিস অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার নিকট বিদায় লওয়ার অর্থই যেন এই ছিল যে, তিনি সেই শিষ্যের হস্তে একটি যুদ্ধ পতাকার ভার অর্পণ করিলেন। একবার এক অল্পবয়স্কা রমণী, যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বামীজী চুপি চুপি তাঁহাকে বলিলেন, 'বীরহৃদয় রাজপুতরমণীরা নিজ নিজ পতিকে হাসিমুখে বিদায় দিতেন; তুমিও তাঁদের মতো হও।' কথাগুলি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য করিল। শিকাগো নগরে অল্পকাল সাক্ষাতের পর যখন আমি তাঁহার নিকট বিদায় লই, তখন তাঁহার শেষ কথা এই ছিল, 'মনে রেখো, ভারত চিরকালই ঘোষণা করছে—আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতিই আত্মার জন্য!'

১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমি ব্রিটানি হইতে তাঁহার নিকট বিদায় লই, তখন আমি একাকী ইংলণ্ডে ফিরিয়া

আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম ; ইচ্ছা, তথায় ভারতবর্ষীয় কার্যের জন্য সহায় ও অর্থ মিলে কি না, চেষ্টা করিয়া দেখিব। কতদিন আমি তথায় থাকিব, তখনও তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। আমি কোন কার্যপ্রণালী পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখি নাই। সম্ভবতঃ এই চিন্তাও স্বামীজীর মনে উদিত হইয়া থাকিবে যে, পুরাতন সম্পর্কগুলি বিদেশে নূতন সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি এত লোককে কথা দিয়া কার্যের সময় পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াছিলেন যে, মনে হইত, অন্য যে কেহও ঐরূপ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার এই শিষ্যার পক্ষে সে সময়টি একটি সঙ্কটমুহূর্ত ছিল, এবং তিনিও ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমার ব্রিটানি অবস্থানের শেষ দিন সন্ধ্যার পর আমার লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারদেশে সহসা আমি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তখন রাত্রিকালীন আহার সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটু রাত্রিও হইয়াছে। তিনি আমাকে উদ্যানে যাইবার জন্য ডাকিতেছিলেন। আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত তাঁহাদের উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট কুটীরে যাইতেছেন—আমাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে ; লোকে বলে, তারা এত গোঁড়া যে, কোন শিশু জন্মিবামাত্র তারা তাকে এই কথা বলে রাস্তায় ফেলে দেয়, "যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মর, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।" তারা শিশুর প্রতি যা বলে থাকে, আজ রাতে আমি তোমাকে তাই বলছি ; কিন্তু ঠিক উল্টোভাবে—"সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ কর, এবং যদি আমি তোমায় সৃষ্টি করে থাকি, তবে সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হও। আর যদি মা ব্রহ্মময়ী তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বেঁচে থাক।" '

তথাপি তিনি পুনরায় পরদিন প্রাতঃকালে, সূর্যোদয়ের একটু পরেই, আমাকে বিদায় দিবার জন্য আসিলেন। য়ূরোপ ভূখণ্ডে ইহাই আমার তাঁহাকে শেষ দেখা। এই দিনটির কথা স্মরণ করিতে গিয়া আবার আমি সেই কৃষকগণের পণ্যবাহী শকটখানি হইতে পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া প্রভাত-গগনের সম্মুখভাগে তাঁহার মূর্তি দেখিতে পাইতেছি—দেখিতেছি, তিনি আমাদের ল্যানিয়ঁস্থ কুটীরের বহির্দেশে যে রাস্তা ছিল, তাহার উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া অভিনন্দন করিতেছেন। প্রাচ্যদেশীয়গণের নিকট উহা অভিবাদন এবং আশীর্বাদ, দুই-ই।

স্বামীজী এই কয়মাস কাল য়ূরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে জীবনযাপন করিতেন, তাহা হইতে লোকের সর্বাপেক্ষা ইহাই অধিক মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আশপাশের জগৎকে মোটেই যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। সচরাচর লোকে জিনিসকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, তিনি তৎপ্রতি আদৌ খেয়াল করিতেন না। অত্যধিক সফলতা লাভ করিয়াও তিনি কদাপি এতটুকু চমকিত বা সন্দিহান হইতেন না। বিস্মিত না হইবার কারণ—যে মহাশক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছিল, তাহার মাহাত্ম্য তিনি অতি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কার্যে বিফলমনোরথ হইলেও তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেন না। জয়-পরাজয় উভয়ই আসিবে এবং চলিয়া যাইবে; তিনি তাহাদের সাক্ষিমাত্র। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, 'যদি জগৎটাই অদৃশ্য হয়, তাতেই বা আমার কি? আমার দর্শনের মতে সেটা ত একটা চমৎকার জিনিস হবে।' পরক্ষণেই সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যা কিছু আপাততঃ আমার প্রতিকূলে রয়েছে, সমস্তই শেষে আমার স্বপক্ষে আসবে। আমি কি তাঁর (মহামায়ার) সৈনিক নই?'

তিনি নির্ভীকভাবে এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া পাশ্চাত্যের

বিলাসিতার মধ্যে বিচরণ করিতেন। ভারতে আমি যেমন তাঁহাকে অবিচলিতভাবে সাধারণ লোকদের মত বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, মেঝেয় বসিয়া হাতে করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে দেখিয়াছি, ঠিক তেমনই কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না করিয়া তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জগতের সব শ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগ করা এবং সে-সব ত্যাগ করা, এই দুয়েরই মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান। অতীতযুগে ভারত নির্ধনতাকেই সকল গৌরবে মণ্ডিত করে তুলেছিল। ভবিষ্যতে সম্পদ্‌কেও কতকটা গৌরবদান করতে হবে।' কিন্তু যাঁহাবা বিদেশে লোকের দ্বারে দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের অদৃষ্টে দ্রুত অবস্থা-বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। মনে হইত, তিনি এই সকল অবস্থা-বিপর্যয়কে গ্রাহ্যই করিতেন না। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডি বা কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাঁহাকে সহৃদয় মানবমাত্রের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত না। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরীয় সত্তা বিরাজমান, একথা তিনি প্রায়ই বলিতেন; সেই ঈশ্বরীয় সত্তায় তাঁহার এরূপ পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি সকল লোককেই ঐ সত্তার বিষয়ে এমন প্রত্যক্ষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, কি প্রভুত্বপ্রয়াসী উচ্চকুলশীলাভিমানী ব্যক্তিগণের এবং আমেরিকার ধনকুবেরদিগের সহিত কথা কহিবার সময়ে, কি অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জরিতপ্রায় দীনদুঃখী লোকদের সহিত বাক্যালাপকালে, তাঁহার এবিষয়ে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। কিন্তু তাঁহার প্রেম ও সৌজন্য দীনদরিদ্রদিগের প্রতিই শতধারে প্রবাহিত হইত।

আমেরিকায় ভ্রমণকালে যখন দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন শহরে লোকে তাঁহাকে কাফ্রি মনে করিয়া হোটেলে ঢুকিতে দেয় নাই, তখন তিনি কখনও একথা বলেন নাই যে, তিনি আফ্রিকা

মহাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরে যখন স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ, এইরূপ আচরণ দ্বারা তাঁহার প্রতি অপমান করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন, তখন যেমন তিনি নীরবে এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকায় কাফ্রিজাতি তাঁহাকে স্থান দান করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের আতিথ্যও তিনি ঠিক তেমনি নীরবে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে এক ব্যক্তি বিস্ময়সহকারে তাঁহাব এই জাতিগোপন করার বিষয়ে উল্লেখ করিলে তাঁহাকে আপন মনে বলিতে শুনা গেল, 'কি! আর একজনকে ছোট করে তবে বড় হতে হবে! আমি সেজন্যে এ পৃথিবীতে জন্মাইনি।' সন্ন্যাসীর এটি চাই, ওটি চাই বলিয়া জোর করিবার অধিকার নাই; তিনি সকল অবস্থাকেই নির্বিকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে অনেক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহাব নিকট, শ্বেতকায় জাতিগণ তাহাদিগকে অধিকার হইতে কিরূপ বঞ্চিত রাখিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিত। স্বামীজী উত্তরকালে প্রায়ই সেই সকল করুণ কাহিনীর উল্লেখ করিতেন। একটি ঘটনায় তিনি যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলেন, এমন আনন্দ তিনি অতি অল্প ঘটনাতেই পাইয়াছিলেন। একবার তিনি একটি স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় রেলের একজন কাফ্রি ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, 'আমি শুনেছি যে, আমাদের জাতির মধ্য থেকে একজন বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জন করেছেন—সে আপনি। আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে চাই।' যাক্ সে সকল কথা; তাঁহার সম্মুখে কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি নিজেদের সামাজিক উচ্চতা লইয়া ইতরজনোচিত উল্লাস দেখাইতে পারিত না। অমনি তিনি তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। ইহার এতটুকু আভাস পাইলেই তিনি কি কঠোর ভাব ধারণ করিতেন! কি তীব্রভাবে তাহাকে তিরস্কার করিতেন! সর্বোপরি,

এই সকল মানবসন্তান ভবিষ্যতে কখনও হয়তো অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবে, এই বিষয়ে তিনি এক অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতেন। অধিকার-প্রাপ্ত জাতিসমূহ নিজেদের উৎপত্তির যে অসত্য বিবরণ প্রদান করেন, তিনি ঘৃণাভরে উহার প্রতিবাদ করিতেন। বলিতেন, 'যদি আমি আমার শ্বেতকায় আর্য পূর্বপুরুষগণের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, তবে আমার পীতকায় মোঙ্গলীয় পূর্বপুরুষগণের কাছে অনেক বেশী কৃতজ্ঞ, আর সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ কৃষ্ণকায় কাফ্রিজাতির কাছে।'

তাঁহাব নিজের শারীরিক গঠনের মধ্যে, তিনি তাঁহার মোঙ্গলীয়-সদৃশ চোয়ালের জন্য যারপরনাই গর্ব অনুভব করিতেন। তিনি উহাকে 'বুলডগের লক্ষণ—কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার চিহ্ন' বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মোঙ্গলীয়দিগের এই বিশেষ গুণটি আর্যজাতির সকল শাখাপ্রশাখায় অনুস্যূত হইয়া আছে। ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'দেখছ না ? তাতাব জাতিই যে আর্যজাতির মদিরাস্বরূপ। তাতার জাতিই সকলের রক্তে শক্তি ও বল সঞ্চার করেছে!'

কেন তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহকে গ্রাহ্য করিতেন না, তাহাব গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি সর্বদাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন, কোথায় সর্বাপেক্ষা উত্তম চিন্তার সহায়তা হয়। প্রত্যেক পরিবারকে, গৃহস্থালীর প্রত্যেক মুখ্য উপকরণটিকে, তিনি ততটুকু মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, যতটুকু তাহারা উচ্চতম চিন্তাশীল জীবনগঠনের পক্ষে চিত্তের এবং ভাবের আবশ্যকীয় স্থৈর্য প্রদান করিতে পারিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাইকেলমাস[১] দিবসে কয়েকজন লোক স্বামীজীর সহিত স্যাঁ মিশেল পাহাড় (Mont Saint Michel) দর্শন করিতে যান। তাঁহাদের

১ ২৯ সেপ্টেম্বর।—অনুঃ

মধ্যে একজন স্বামীজীর নিকটেই ছিলেন—স্বামীজী সে সময়ে মধ্যযুগের কয়েদীদের জন্য যেসকল অন্ধকার, খাঁচার মত ঘর নির্দিষ্ট থাকিত, তাহাই দেখিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—স্বামীজী অনুচ্চস্বরে বলিতেছেন, 'আহা, কি চমৎকার ধ্যানের যায়গা!' যাঁহারা তাঁহাকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর আতিথ্যদানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ বর্তমান আছেন। পাশ্চাত্য দেশে প্রথম পদার্পণ করিয়া সর্বদাই গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়ার অভ্যাসটি দূর করিবার জন্য স্বামীজীকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বর্ণনা করেন। তিনি ট্রাম গাড়িতে উঠিয়া বিশেষ কোন চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, কখন তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন, তাহার হুঁশই থাকিত না; ফলে তাঁহাকে কোন একটি জায়গায় যাইবার জন্য হয়তো দুই-তিন বার সমস্ত রাস্তাটির ভাড়া দিতে হইত। যেমন বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল এবং বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, তিনি ক্রমশঃ কতকটা তৎপরতা ও লৌকিক ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের এইরূপ পরিবর্তনগুলি অত্যন্ত ভাসাভাসা হইয়াছিল। ভিতরে তাঁহার সেই পূর্বেরই ন্যায় জ্বলন্ত ইচ্ছাশক্তি বিরাজ করিত, এবং মন সর্বদা ভাবমুখে অবস্থান করিত। মনে হইত, যেন কোন প্রতিকূল শক্তি তাঁহাকে 'বল ছোড়ার মত এক স্থান হইতে অপর স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে, আর ঐরূপে তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া আনিতেছে'—ইহা তাঁহার নিজমুখের অলঙ্কারময়ী ভাষা। একবার তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'আমি জানি যে, আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, কিন্তু ভারতে আমি শুধু একটি ধ্যান করবার গুহাই খুঁজে বেড়িয়েছি, আর কোন কিছু নয়!'

ইহা সত্ত্বেও কিন্তু সর্বদাই তিনি সকল বস্তুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখিতেন। তিনি আগ্রহের সহিত যাতুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য লইতেন। তবে কোন স্থানেরই রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা অনুভব করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিলেন না বলিলেই হয়। প্রত্যেক জিনিসটি যে ভাবরাশি অভিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তদ্বারাই তিনি উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডযাত্রাকালে তিনি একদিন গাঢ় নিদ্রার পর ডেকের উপর আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদেশেব বিবাহসম্বন্ধীয় আদর্শগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহাদের উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু জিনিস আছে, যাহা জগতের কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাঁহাব শেষবার আমেবিকা হইতে প্রত্যাগমনের পব তিনি আমাকে বলিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় পেয়ে আমি তার প্রতি বিশেষ-ভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলুম, কিন্তু এখন আমি প্রধানতঃ তার অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি। অপর সকলের মতো আমিও না ভেবে চিন্তে ধরে নিয়েছিলুম যে, কলকব্জা দ্বারা কৃষিকার্যেব মহা উন্নতি হবে; কিন্তু আমি এখন দেখছি যে, কলকব্জা দ্বারা আমেরিকার জমিদারের সুবিধা হোতে পারে, কারণ তাঁকে বহু বর্গমাইল জমি চাষ করতে হয়, কিন্তু ভারতীয় চাষীদের ছোট ছোট জমির পক্ষে এতে লাভের চেয়ে যেন ক্ষতিই অধিক হবে। ভারতের সমস্যা ও আমেরিকার সমস্যা যে সম্পূর্ণ পৃথক, অন্ততঃ এ বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নেই।' তিনি সকল বিষয়েই—সকল লোকের মধ্যে ধনের সংবিভাগরূপ সমস্যাটি সম্বন্ধেও—যাহা দুর্বল বা দরিদ্র শ্রেণীসমূহের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহে, এমন সব তর্কের প্রতি সন্দিগ্ধভাবে কর্ণপাত করিতেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়

এবিষয়েও তিনি, অজ্ঞাতসারে হইলেও, সম্পূর্ণরূপে যেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই প্রতিমূর্তিস্বরূপ ছিলেন। দলবদ্ধ হইবার প্রবল অভ্যাস কোন জাতির মধ্যে দেখিলে তিনি উহার প্রশংসা করিতে জানিতেন, কিন্তু হিংস্রপ্রকৃতি বৃকযূথের দলবদ্ধ হওয়ার মধ্যে কেহ কি কোনও সৌন্দর্য দেখিতে পান?

তিনি বিদেশে ভারতের অভাব বা সমস্যাসমূহের আলোচনা করার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে ঐরূপ করা হইলে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেন। পক্ষান্তরে, কোন স্বদেশবাসীকে, সমগ্র জগৎ বিপক্ষে থাকিলেও, সাহায্য করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। যদি কোন ভারতবাসী বিষয়বিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী য়ূরোপীয়দিগের শত যুক্তি-তর্কও তাঁহার নিকট ভাসিয়া যাইত। বালকের ন্যায় সরলভাবে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি এই উত্তর দিতেন, 'আশা করি আপনি আরও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করবেন এবং আরও নিখুঁতভাবে মাপজোখ করবেন, যাতে আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণিত হোতে পারে।'

এইরূপে, যদিও অপর সকলে তাঁহাকে সমগ্র জগতেরই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্র, এবং দেশবিদেশের না হইয়া সমগ্র বিশ্বেরই অধিবাসী নামে অভিহিত করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন, তথাপি তিনি নিজে সর্বদা ভারতভূমে জন্মগ্রহণের জন্যই আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। আর রাজোচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নানা সুযোগের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও, তিনি যে সন্ন্যাসী, লোকের নিকট দিন দিন তাহাই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাইত।

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত (মাহিষ্য)-কুলোদ্ভবা ধনাঢ্যা রাণী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারী ব্রাহ্মণগণের অন্যতমরূপে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; সে প্রভাবের সম্যক পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের শিষ্যগণ যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে উদ্ভূতা জনৈকা রমণীই এক হিসাবে সেই সমস্ত ব্যাপারটির মূলকারণস্বরূপ ছিলেন। মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকিলে পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচার-কার্যও হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পূর্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী-নির্মাণের উপরই এই সমগ্র ব্যাপারটি নির্ভর করিয়াছে। উহাও আবার নিম্নকুলোদ্ভবা জনৈক ধনাঢ্যা রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ ছিল। স্বামীজী স্বয়ং আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছিলেন যে, এদেশ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হিন্দুরাজগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে এই জিনিসটি কদাপি ঘটিতে পারিত না। ইহা হইতেই তিনি ভারতে সার্বভৌম শাসকবৃন্দের জাতিভেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার গুরুত্ব অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি ছিলেন তাঁহার সময়ের একজন বীরহৃদয়া রমণী। কিরূপে তিনি কলিকাতার ধীবরদিগকে অন্যায্য করভার হইতে

রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীকে তাহা দিতে সম্মত করাইয়া, তৎপরে নদীতে যাহাতে বিদেশীয়দিগের জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়, তজ্জন্য জেদ করিয়া বসিলেন। সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠে তাঁহার যেসকল রাস্তা ছিল, সেই সকল রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা কেন দেবপ্রতিমাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা লইয়া তিনি ঐরূপ আর এক তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তিনি এক প্রকার বলিয়াই ছিলেন যে, যদি ইংরেজরা ভারতবাসিগণের ধর্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে রাস্তা দিয়া মিছিল বাহির হয়, তাহার আপত্তিকর অংশগুলিতে দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হইল—উহাতে আর বেশী হাঙ্গামা কি আছে? আর সেইরূপ করাও হইল। উহার ফল এই হইল যে, কলিকাতায় 'রতন রো' নামক চমৎকার রাজ-পথটি মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। পতিবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহাকে তাঁহার ব্যাঙ্কারদিগের নিকট যে বিপুল অর্থ জমিয়াছিল, তাহা নিজ হস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তিনি উহা নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কার্যটি কঠিন হইলেও তিনি উহা অসীম বুদ্ধি ও দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি নিজের সমস্ত কার্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। অনেকদিন পরে তাঁহার একটি বড় মকদ্দমায় তিনি কৌঁসুলীর দ্বারা যেসকল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে চলিত কথার ন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আশপাশের সকল লোক এই মহাসাধককে ধর্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছে, তখন তিনিই ইঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই তাঁহার জন্য

কোনরূপ কাজকর্ম না করিয়া বরাবর বৃত্তি ও বাসস্থান ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে মথুর বাবু তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরানীর প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতেন। রাণী রাসমণি প্রথম হইতেই ধর্মবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত সেই প্রথম ধারণাই বলবতী রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তথাপি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকুমাররূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, জনৈক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক উক্ত মন্দির নির্মাণ এবং তদুদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়াছে, একথা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাদিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজাদি কার্যে সাহায্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদৌ সম্মত হইলেন না। শুনা যায়, সকল কার্য শেষ হইলে এবং সমাগত লোকজন চলিয়া গেলে তিনি সেই রাত্রে বাজার হইতে এক মুঠা ছোলাভাজা কিনিয়া সমস্ত দিন উপবাসের পর তদ্দারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

পরে তিনি কালীবাটীতে যে পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটি নিশ্চয়ই তাহার অর্থকে গভীরতর করিয়াছে। তিনি কদাচ ভ্রমবশতঃ কৈবর্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জগতে তাঁহার কার্য কি, তাহা জানিতে পারেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, বাল্যে পল্লীগ্রামে তিনি যে কঠোর আচার-নিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্যের পোষক না হইয়া বরং প্রতিকূল ছিল। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, তাঁহার সমগ্র জীবন, তিনি যে ধর্মরাজ্যে সকল মানবের সামাজিক-পদনির্বিশেষে সমান প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন, এই কথাই ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের আচার্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই উহার জীবনের ব্রত। খেতড়ীর রাজার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য যখন তিনি আমেরিকায় ফনোগ্রাফসম্মুখে কয়েকটি কথা বলেন, তখন আপনা হইতে এই বিষয়টিই তাঁহাব মনে আসিয়াছিল। বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, 'কখনও ভুলো না, "স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি সাধনই" আমাদের মূলমন্ত্র।'

একথা সত্য যে, সমাজে যখন নানা দলের সৃষ্টি হইতে থাকে, সেই সময়েই তাহাব শক্তির সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়, এবং স্বামীজী এই কথাটি খুব চিন্তা করিতেন যে, যাহা একবার কোন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর জীবনসঞ্চার করিতে বা অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। তাঁহার মতে 'নির্দিষ্ট আকারপ্রাপ্ত' ও 'মৃত', এ দুইটি একার্থক শব্দ; যে সমাজ চিবকালের জন্য একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যেন যাহার বৃদ্ধি হওয়ার কাল অতীত হইয়াছে, এমন একটি বৃক্ষের ন্যায়। উহা হইতে যদি আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, সে কেবল মিথ্যা ভাবুকতামাত্র হইবে, আর স্বামীজী ভাবুকতাকে স্বার্থপরতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কারণ উহা 'ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাসমাত্র'।

স্বামীজী জাতিভেদ-ব্যবস্থাটির সর্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন, বরং সর্বদা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন। উহাকে মানবজীবনেরই একটি অনিবার্য ব্যাপার বলিয়া দেখিতে পাওয়ায়, তিনি উহাকে শুধু হিন্দুধর্মেরই একটি বিশেষ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারিতেন

না। জনৈক ইংরেজ, তিনি যে একবার মহীশূরে গোবধ করিয়াছিলেন, ভদ্রলোকদের সম্মুখে একথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'লোকের স্বজাতিব মতামতই তাকে ধর্মপথে রাখবার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।' তারপর তিনি দুই-চারি কথায় এই দুই প্রকার আদর্শের পার্থক্যের বর্ণনা করিলেন—এক প্রকার আদর্শ শিষ্ট ও দুষ্টের মধ্যে, অথবা ধার্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে, কি প্রভেদ তাহাই নির্দেশ করে, আবার অপর এক প্রকার সূক্ষ্মতর নৈতিক আদর্শ আছে, যাহা ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মন দেয়, যাহা আমাদিগের মধ্যে আমাদের সমানপদস্থ অল্পসংখ্যক মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু এই প্রকারের মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। সন্ন্যাসী জীবনকে শুধু সাক্ষিস্বরূপে দেখিয়া যাইবেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার নিকট এমন সব প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি উহাদের অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সেগুলিকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এপর্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাচরণ বলিয়া অভিহিত করিতেন, তৎপ্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, 'আর যা হয় হোক, ওটি যেন কখনও না হয়!'

বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার নিকট, যাহা কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী এইসকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। যাহারা চঞ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তাভ্রষ্ট, শত বাহ্য পারিপাট্য সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেখিতেন যে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীন কালের ন্যায় একান্ত নির্ভর ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুরগৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকালসুলভ নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি তাঁহার নিকট 'আদর্শ হিন্দু পত্নী' বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক-দেখানো ব্যাপার নহে। আর যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষাপদবাচ্যই নহে।

ভাবী আদর্শ রমণীর গুণাবলীর সূচনা যদি দৈবাৎ কোথাও মিলিয়া যায়, তিনি সর্বদাই তাহার সন্ধানে থাকিতেন। তিনি ভাবিতেন, কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহ ও হয়তো কতকটা নিজের পছন্দমত পতিনির্বাচন, এ দুইটিও আসিবেই। সম্ভবতঃ অন্য সকল উপায় অপেক্ষা ইহাই বাল্যবৈধব্য-জনিত সমস্যাসমূহের প্রকৃষ্টতর সমাধান। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথার সূত্রপাত হয়, তখন সমাজ উহা ইচ্ছাপূর্বকই করিয়াছিলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে অপর যেসকল দোষের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ উপায়ে তাঁহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালসুলভ ধ্যানশক্তিবর্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে

আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাব ত্যাগ করিয়া নহে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা সমগ্র সমাজ-শরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্তন আনয়ন করিবে তাহাই আদর্শ শিক্ষা হইবে। আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করিবে।

অতীতকালের প্রত্যেক জ্বলন্ত উদাহরণটি পৃথকভাবে নিজ নিজ কার্যসাধন করিয়াছে। রাজপুত-ইতিহাস জাতীয় আদর্শ নারী-জীবনের তেজ ও সাহসে ভরপুর। কিন্তু ঐ অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতুকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার প্রয়োজন। ভারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাণী অহল্যাবাঈ তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। দেশের সর্বত্র তাঁহার লোকহিতকর কীর্তিগুলি দেখিয়া একজন ভারতীয় সাধুর পক্ষে ঐরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের ঠিক প্রতিরূপমাত্র হইবে না; উহা তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। আগামী যুগের নারীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। পবিত্রতা শান্তি ও স্বাধীনতার আধারভূতা সাবিত্রী যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত আদর্শ। কিন্তু ভবিষ্যতে নারীগণকে ইহার সহিত মলয়মারুতের ন্যায় কোমলতা ও মাধুর্যেরও বিকাশ দেখাইতে হইবে।

নারীগণকে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে হইবে, উহার হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম, বা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের যেকোন পরিকল্পনা তিনি করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত ভূমির ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন, যাঁহারা ঐ স্থানে বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যানসংরক্ষণ এবং পশুচর্যা, এগুলি নিত্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া চাই।

ধর্ম, এবং সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম মধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ দেখা যায়, সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ এই নূতন ধরনের ব্যাপারগুলির অস্থিমজ্জাস্বরূপ হইবে; ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ঐগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এবংবিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয় মাস কাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপে এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্মরাজ্যে 'বাশি-বাজুকদিগেরই'[1] সদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহারাই নারীগণের সমস্যার সমাধান করিবে। তাহাদের অন্য কোন গৃহ থাকিবে না; যেখানে তাহারা কাজ করিবে, তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে; ধর্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অপর কোন বন্ধন থাকিবে না; এবং গুরু, স্বদেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ, এই তিনের প্রতি ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি কোনও প্রীতি থাকিবে না। তাঁহার কল্পনা কতকটা এইরূপই ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন এবং তিনি এইরূপেই উঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তিনি একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন—উহা শক্তি। কিন্তু শক্তি কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি কি কঠোরভাবে বিচার করিতেন! নিজেকে জাহির করা অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ দু'য়ের কোনটিরই তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন,

---

১ Bashi-Bazouks—ইহারা খলিফাদিগের শরীর-রক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ প্রথা ছিল যে, যেসকল সৈনিককে তুর্কী রক্ষিদলে ভর্তি করা হইত, তাহাদিগকে শৈশবে সকল দেশ ও জাতির মধ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া লালনপালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্মে অতিশয় অনুরাগ ছিল এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ ছিল। সমগ্র য়ুরোপে তাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ন তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

মাধুর্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্রসমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেই সঙ্গে আবার বর্তমান যুগে ভারতে চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার আছে। সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি তিনি আদৌ সহিতে পারিতেন না। যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্র ও মনেব রমণীসুলভ দুর্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন; এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসার্হ হইবেন।

বিধবাগণের মধ্য হইতেই প্রথম শিক্ষয়িত্রীদল সংগৃহীত হইবে, তিনি স্বভাবতঃ এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইহারা পাশ্চাত্য দেশের মঠাধিকারিণীদিগের অনুরূপ হইবে। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও কোনরূপ নির্দিষ্ট সঙ্কল্প করেন নাই। তিনি শুধু বলিতেন, 'জাগো! জাগো! সঙ্কল্পগুলো কালে আপনা থেকেই পরিপুষ্ট এবং কাজে পরিণত হয়।'—ইহা তাঁহারই কথা। তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে—উহা যেখান হইতেই আসুক না কেন—তিনি উহাকে সাদবে গ্রহণ কবিতেন। কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক দৃঢ় ও সরল চরিত্র এবং বুদ্ধির সহায়তায় সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিতে পারিবেন না, এ বিষয়ে তিনি কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। অসৎকর্মহেতু মনের উপর বোঝা থাকিলেও তাহা অকপটতা দ্বারা দূর করা চলিবে। নারীগণের উন্নতিবিধায়ক আন্দোলন সম্বন্ধে যিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, এরূপ এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, 'সকল উচ্চ উদ্দেশ্যকে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা চাই।' স্বামীজীও স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না এবং ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ

করিতেন না। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা-বিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈ চৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা, এসকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি সাধিত হওয়া চাই। প্রথমে নারীগণকে সমাজের আদর্শগুলি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালিনী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদেশ ও সুযোগগুলি অধিক পরিমাণে বুঝিতে থাকিবেন। ঐসকল নির্দেশ পালন করিয়া এবং ঐসকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয়ভাবাপন্ন হইবেন, এবং উন্নতির এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন যাহা প্রাচীন ভারত কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আমাদের জাতীয় জীবনধারা যে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করায় স্বামীজীর স্বাধীন চিন্তার যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোন বিষয়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিকট কোন প্রথার নূতন আকারটি সর্বদাই পুরাতন পবিত্র সংস্কারসমূহের দ্বারা পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার মতে দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কিত করাই 'তাঁহাকে পূজা করা'; ভৈষজ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই 'রোগ ও ময়লারূপ দানবদ্বয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা।' প্রাচীনকালের ভক্তিপূর্বক গোসেবা হইতে এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি সরবরাহ করা, পশুগণের জন্য চারণ ভূমির ব্যবস্থা করা ও সকল প্রকারে তাহাদিগের পরিচর্যা করা ইত্যাদি ভাব পূর্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির যতদূর সম্ভব অনুশীলন করাকে তিনি ধ্যান-ধারণাদির শক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার

মতে অধ্যয়নই তপস্যা, এবং হিন্দুদিগের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভের একটি উপায়। সকল কার্যই এক প্রকারের ত্যাগ। গৃহ ও পরিবারবর্গের প্রতিও যে ভালবাসা, তাহাকেও সর্বদা মহত্তর ও বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দিতেন যে, হিন্দুগণের নিকট সকল লিখিত শব্দই সমান পবিত্র ; সংস্কৃতও যেমন, ইংরেজি ও পারসিক শব্দও ঠিক তেমনি। কিন্তু তিনি বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার বাহ্য চাকচিক্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সমালোচনা শুধু বাহিরের ব্যাপারগুলিকেই নূতন করিয়া সাজাইতে চায়, তাহাতে তিনি কর্ণপাত করিতেই পারিতেন না। যখন তিনি দুইটি সমাজের মধ্যে তুলনা করিতেন, তখন তিনি সর্বদা দেখাইয়া দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং কি আধুনিক, কি মধ্য যুগে, এই লক্ষ্যসাধনে কে কতটা সুফলকাম হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তিনি তাহাদের সাফল্য ও অকৃতকার্যতার বিচার করিতেন।

সর্বোপরি; তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে ধারণা এরূপ ছিল যে, তিনি বক্তা ও যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, এই দুই জনের মধ্যে এতটুকু ভেদ রাখিতে দিতেন না। কাহারও সম্বন্ধে 'তাহারা' বলিয়া উল্লেখ করাই তাঁহার নিকট ঘৃণার কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইত। তিনি যাহাদিগের ত্রুটি বা দোষ দেখানো হইতেছে, সর্বদা তাহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি জগৎকে সত্যসত্যই ঈশ্বর ও শয়তান নামক দুই পৃথক ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া কল্পনা করা চলিত, তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের উপর সেনাপতি আর্কেঞ্জেল মাইকেলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, যাঁহার উপর তিনি বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই সদাপরাজিত শয়তানেরই পক্ষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই ভাবটি, তিনি শিক্ষা দিতে বা সাহায্য করিতে সমর্থ,

এই আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ছিল না—পরন্তু উহা শুধু কেহ চিরদিনের মত যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারই অংশ গ্রহণ করিবার আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্প-প্রসূত। কেহ কোথাও জন্মের মতো দারুণ কষ্টে নিপতিত হইয়াছে দেখিলে, তাহার সবটুকু নিজে গ্রহণ করিয়া আবশ্যক হইলে তিনি বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে কোন কোনখানিতে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দয়ারূপ ভিত্তির উপরেও নরসেবাব্রতকে ঠিক ঠিক দাঁড় করানো যায় না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক। তিনি ওরূপ পৃষ্ঠপোষকতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, দয়া তাহাকেই বলে, যাহা অপরকে জীবজ্ঞানে সাহায্য করে; কিন্তু প্রেম সকলকে আত্মা জ্ঞান করিয়া সেবা করিয়া থাকে। এতএব প্রেমই পূজাস্বরূপ, এবং এই পূজাই ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। 'সুতরাং অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র কার্যপ্রবৃত্তির হেতু।' কোন উচ্চ সেবার ভারপ্রাপ্তির সহিত আর কোন উচ্চাধিকারই তুলিত হইতে পারে না। একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন, 'যিনি কাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সন্তুষ্টচিত্তে যাইবেন; যাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে, তিনি নহেন।' পুরোহিতগণকে যেমন বাহ্যান্তরশুদ্ধি করিয়া উৎসুকভাবে অথচ সসম্ভ্রমে এবং সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও অবিচলিত থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূজাকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষারূপ পবিত্র কার্যের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সেইভাবে কার্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী, মহারাষ্ট্র মহিলা মাতাজী মহারাণীর কথাগুলি স্বামীজী মনে রাখিয়াছিলেন এবং প্রায়ই উহাদের উল্লেখ করিতেন। যে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া তিনি

বলিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, আমার কোন সহায় নেই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীদের পূজো করি; তারাই আমাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।'

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের শিক্ষার প্রতি স্বামীজী যে ভাব পোষণ করিতেন, তাহাতে ঐরূপ এক প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সেবার ভাবই প্রকাশ পাইত। তাঁহার মতে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীসমূহের যেমন বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের অধিকার আছে, তাঁহাদের এই নিম্নশ্রেণীর ভ্রাতৃগণেরও ঐ বিষয়ে ঠিক তেমনি অধিকার আছে। এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তাহারা স্বাধীনভাবে ভিতর হইতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণয় করিয়া লইবে। পুরোবর্তী এই কার্যটি সম্বন্ধে পূর্বোক্তভাবে চিন্তা করিয়া তিনি শুধু, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত ভারতে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। যে যুগে উপনিষদের জ্ঞান শুধু আর্যদিগেরই বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে আবির্ভূত হইয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে ত্যাগের দ্বারা নির্বাণলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে দেশে এবং যে কালে সিদ্ধ আচার্যগণেব প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য রামানুজ সেই দেশে এবং সেই সময়ে কাঞ্চীনগরীর গোপুরে আবোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র সকল পারিয়া বা চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। এখন ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়কাল; এখন ভারতবাসিগণ ঐহিক জ্ঞান দ্বারা মানুষ হইতে শিখিবে। সুতরাং কিরূপে ইতর লোকদিগের মধ্যে ঐহিক জ্ঞানের বিস্তার করা যাইতে পারে, তাহাই স্বভাবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়াছিল।

অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতে পুনরায় ঐহিক সম্পদের অভ্যুদয় করিতে হইলে সমগ্র জাতিটির শক্তি ও সমবেত চেষ্টার

প্রয়োজন। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, 'যে ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরা রুটি দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গবাস দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না!' সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশটি, সে যে মহান্ চিন্তা ও ধর্মোৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতর সাধারণের সহিত আদানপ্রদানসম্বন্ধ-স্থাপনের এক বিরাট আন্দোলন উত্থাপিত করিলেই উচ্চশ্রেণীসমূহের ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনদপ্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটিকে সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা সুমার্জিত যে কাণ্ডজ্ঞানকে লোকে প্রতিভা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা হলচালনাকারী কৃষকের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্ভবপর। যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পদ হইত, তাহা হইলে তান্তিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।

তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের শ্রমজীবিকুলকে শিক্ষা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য, অপর কাহারও নহে। বিদেশী লোকের দ্বারা বিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন হইলে তাহাতে যে কি অশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কখনও এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার নিকট লুকায়িত ছিল না।

তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন, ফটোগ্রাফের ক্যামেরা এবং রাসায়নিক পরীক্ষার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণের সাহায্যে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিতে বলিতেছেন, তাহার অর্থই এই। আবার, সাধুরা যখন ভিক্ষা উপলক্ষ্যে নিম্নশ্রেণীব লোকদের সহিত মিশেন, সেই সময় তাঁহারা যেন কিছু কিছু ঐহিক শিক্ষাও উহাদিগকে প্রদান করেন, একথাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এইগুলি নবশিক্ষার সহায়ক ও প্ররোচনা মাত্র হইবে। সেই আসল শিক্ষাব জন্য প্রত্যেককে একাকী বা দলবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা কবিতে হইবে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, একটি বৃহৎ জাতিকে তাহার বোধসীমাব বাহিরে একটি চিন্তা ও জ্ঞানের বাজ্য রহিয়াছে, প্রথমে এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই নূতন শিক্ষাকে সর্ব-সাধাবণের মধ্যে প্রচাব করিবার প্রথম সোপান। সুতবাং স্বামীজীর এই প্রকার নানা কল্পনা করা খুবই সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি নিজে যে আচার্যোচিত কার্যের সূত্রপাত ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুধার্ত বা পীড়িতদিগের কোন বিশেষ প্রকাবের সেবারূপে প্রকাশ পাইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগনিবাবণকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবকদল প্রেরণ করিয়া পল্লীনগবাদিব স্বাস্থ্যরক্ষাব যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, এবং যাহা অদ্যাবধি তাঁহারা কবিয়া আসিতেছেন, তাহা আরম্ভ কবিবার উপযোগী অর্থ স্বামীজীই সংগ্রহ কবিয়া দেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে যে কয় বৎসর ছিলেন, ভারতের অন্ত্যজদিগের সেবাকার্যে যাহারা ব্রতী হইতে সক্ষম, সর্বদা এমন সেবকগণের সন্ধানে থাকিতেন, এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে নীচ জাতীয় কলেরা রোগীদিগের সেবা করিতে দেখিয়া তিনি যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন, এমন আর কিছুতেই হন নাই। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'পূর্বে বুদ্ধের সময় যা

ঘটেছিল, আমরা এখন আবার তা দেখতে পাচ্ছি!' তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার প্রেম ও দয়ার সর্বকনিষ্ঠ-সন্তান প্রতিম কাশীস্থ ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটির প্রতি এক বিশেষ প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব কবিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়েও কম আকৃষ্ট হইত না। এগুলির সহিত তাঁহার তেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইহারা আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারই ছিল। যেসকল মাসিক পত্রের সহিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল, তাহাদেব হিতাহিত, এবং মুর্শিদাবাদের অনাথাশ্রম হইতে যে শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহা—এগুলি তাঁহার চক্ষে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতের বর্তমান অবস্থায় মাসিক পত্রগুলি অনেক সময় একাধাবে একপ্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা এক দিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবাব যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামীজী উহাদের এই শিক্ষাসংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজ সংস্কার প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয়তো একপৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা-জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগসন্ধিকালের সাধারণ লোকের মনের গতি কোন্ দিকে, তাহারও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আপাত-বিসংবাদী সত্য ব্যাপারটি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বামীজী নিজেই বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুরা মনে করে যে, ধ্যানের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হবে; এটি তাদের পক্ষে বেশ খাটে—যখন বিষয়টি গণিতশাস্ত্র

হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলের বেলায়ও তারা স্বাভাবিক সংস্কারের বশে ঐ উপায় গ্রহণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়; ঐ উপায়ে যে ভূগোলের বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়না, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।'

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভাবিক দয়াপ্রবৃত্তি শুধু যে ভারতবাসিগণের কথাই চিন্তা করিত, তাহা নহে।. যেসকল লোক মনে করে যে, ব্যবসা যত অধিক মূলধন লইয়া হইবে, ততই ভাল হইবে, তিনি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া, বরং যাহাদের অল্প জমির চাষ আছে, অথবা যাহারা অল্প পুঁজিতে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্বদা তাহাদিগকেই সমর্থন করিতেন। উহা তাঁহার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের অনুরূপ কার্যই হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, এক্ষণে যে দয়া-দাক্ষিণ্যময় যুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার প্রধান কার্যই হইবে—'শ্রমজীবী' বা 'শূদ্র'দিগের সমস্যার সমাধান করা। যখন তিনি পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে তথাকার আপাতপ্রতীয়মান অধিকার-সাম্য দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারি। পরে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, উহার পশ্চাতে যে ধনীদিগের স্বার্থপরতা ও বিশেষাধিকারলাভের জন্য প্রাণপণ সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাহা তিনি বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং একজনকে চুপে চুপে বলিয়াও ছিলেন যে, এখন পাশ্চাত্য জীবন তাঁহার নিকট 'নরক' বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিপক্ক বয়সের বহুদর্শিতার ফলে তিনি যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্য যেকোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশ অপেক্ষা চীন দেশই মানবীয় নীতিজ্ঞানের আদর্শধারণার সর্বাপেক্ষা অধিক সমীপবর্তী হইয়াছে। তথাপি, সমগ্র জগতের লোকদিগের নিকটেই আগামী যুগ যে ইতর সাধারণের বা শূদ্রজাতির কল্যাণের কারণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'আমাদের শূদ্রজাতির সমস্যার সমাধান করতে হবে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ,

কি ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে সেটা সঙ্ঘটিত হবে!' তিনি যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিতে করিতেই কথা বলিতেছিলেন ; তাঁহার কণ্ঠস্বর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় লোকের কানে বাজিতেছিল। কিন্তু যদিও শ্রোতা উৎসুকভাবে আরও শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি স্বামীজী নির্বাক হইয়াই রহিলেন, এবং গভীরতর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটা বিপর্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তিপূজার এরূপ এক মহান্ উদ্বোধন ধ্বনিত হইয়াছে। জগন্মাতাই একাধারে এই সকল বিপরীত ভাবের সমন্বয়স্থল। তিনি ভালমন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্যস্থান তিনিই। স্বামীজী যখনই মাতৃপ্রণাম-মন্ত্রগুলি সুরসংযোগে আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটিমাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহু-যন্ত্রোত্থিত মৃদুধ্বনির ন্যায় ঐতিহাসিক নাটকের এই মহা সমবেত-সঙ্গীত শুনিতে পাই। তিনি আবৃত্তি করিতেন—

'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ।
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।'[১]

তৎপরে যেমন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতগণের এক সাধারন আশা ও ভয়ে সম্মিলন, সেনাসমূহের সগর্ব পদসঞ্চার এবং জাতিসমূহের

১ যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। হে দেবি, বিশ্বকে প্রতিপালন কর। (চণ্ডী, ৪।৫)—অনুঃ

সংক্ষোভ মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পষ্টতরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, অমনি সে সকলকে ছাড়াইয়া এই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতি-গোচর হইল—

'প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।'[1]
'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।'[2]

১ তুমি সকলের গুণত্রয়প্রকাশকারিণী প্রকৃতি, তুমি প্রখর রাত্রি, মরণরূপ রাত্রি এবং দারুণ মোহরাত্রি। (চণ্ডী, ১।৭৮)—অনু:

২ সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে শিবে, হে সর্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণি, হে শরণাগত-রক্ষয়িত্রি, হে ত্রিনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার। (ঐ ১১।১০)—অনু:

গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানি

স্থান—বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোটবাড়ি
কাল—মার্চ হইতে ১১ই মে পর্যন্ত

গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরা মাতার ক্ষুদ্র বাড়িখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।'

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব এবং বাহিরে প্রতি জিনিসটি সমান সুন্দর ; শ্যামল বিস্তৃত শষ্পরাজি, উন্নত নারিকেলবৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের গ্রামগুলি—সবই সুন্দর ! অদূরে এক গাছের উপর যেন সদাশিবের আশীর্বাদ আমাদের নিকট আনিয়া দিবার জন্যই একটি নীলকণ্ঠ কুলায় নির্মাণ করিয়াছিল, সেটিও সুন্দর। সকালবেলা ছায়া বাড়ির পিছনদিকে পড়িত, কিন্তু বৈকালে আমরা সামনের দিকে বসিয়া, যেন সিংহগৌরবে গরীয়সী জননী জাহ্নবীর মানস পূজা ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে পাইতাম।

যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামীজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম ; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে তাঁহার নাম-পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধির কথা এবং যাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা কেবল প্রেমিক হৃদয়েরই অনুভবগম্য, পরার্থে স্বামীজীর সেই পবিত্র মর্মবেদনার কাহিনীও আমরা শ্রবণ করিতাম। আর স্বয়ং স্বামীজী তথায় আসিতেন, উমা-মহেশ্বরের ও রাধা-কৃষ্ণের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন।

কোন একটা পৌর্বাপর্যের ভাব না রাখিয়া, পর পর অনেকগুলি

সুস্পষ্ট অথচ পৃথক পৃথক অনুভূতির উদয় করাইয়া মানবচিত্তকে যে উচ্চতর অবস্থায় পরিণত করিবার প্রথম উপকরণ দেওয়া হয়, তাহা তিনি দিতে জানিতেন বলিয়া মনে হয়; কারণ ঐভাবে প্রথম উপকরণগুলি দিতে পারিলেই শিক্ষার্থীর মন আপনা হইতেই উহাদিগকে যথাসম্বন্ধ সাজাইবার প্রয়াসে প্ররোচিত হয়। তিনি ইহা জানুন আর নাই জানুন, অন্ততঃ এই শিক্ষাবিজ্ঞান-নীতি অনুসারেই তিনি অজ্ঞাতসারে অধিকাংশ কার্য করিতেন, আজ একটি, কাল একটি এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন,—তাঁহাব যখন যেমন খেয়াল হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু কেবল যে তিনি ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচাবের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। রাস্তবিক, তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

আর একটি বিষয়ে মনস্তত্ত্বের আর একটি গভীর রহস্য তিনি যথার্থভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাহা এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা আমাদের নিকট কঠিন বা অরুচিকর বোধ হয়, তাহাতে কখনও মৃদুতার আবোপ করিতে চেষ্টা না করা। ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে হয়তো হরগৌরী মিলনাত্মক এক কবিতা[১] আবৃত্তি করিতেন—

---

১ অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রম্—শঙ্করাচার্য

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২

চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ
বিভ্রাট্‌ফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৩

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ
প্রফুল্লপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৪

প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ায়ৈ
ত্রৈলোক্যসংহারক-তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৫

চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ
কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৬

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ
সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮

তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হওয়ায় আমরা এই সকলের মর্মে প্রবেশ করিতে, এমন কি সেই প্রথমাবস্থাতেও অল্পস্বল্প অর্থবোধ করিতে সমর্থ হইতাম।

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অদ্বয় অনন্তের কথায় পর্যবসিত হইত। বাস্তবিক জগৎকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা আচার্যদেবের অদ্বৈতবাদে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া আমার মনে হয়। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্তমাত্র

তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। বন্ধন-মাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং যাহারা 'শৃঙ্খলকে পুণ্যের আবরণে ঢাকিতে চাহে' তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চদরের রসশিল্পের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। একদিন আমরা কয়েকজন য়ূরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন:

'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত!'—এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, তাহার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।' তাঁহার কথাবার্তা সরস উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেইদিনই অপরাহ্নে, কোন রাজনৈতিক বিষয়ে বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে যে, একটি জাতিগঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে।'

কয়েকমাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাঁহার জগতে কোন কোন বিশেষ কার্য করিবার আছে, তাঁহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবদেবীর কথা কহি না। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্মবীরগণের উদ্ভব।' তথাপি ভক্তিই যে এই সময়ের প্রত্যেক আলোচনার লক্ষ্য ছিল, তাহা তিনি তখন জানিতে পারিতেন কি-না, এ কৌতূহল কখন কখনও আমার মনে উদিত হইয়াছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে যাঁহাদের মানসিক শক্তিহ্রাসের সম্ভাবনা আছে তাঁহাদের জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা

থাকিলেও, ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিস, তাহার আভাস তিনি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে এইসব গান সুর-সংযোগে গাহিতেন—

'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বাবী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বল্‌চে রে সদাই, প্রেম বিলারে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই!
ডাক্‌ছে বাঁশী—আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে।'[1]

তিনি তাঁহার বন্ধুবচিত[2] গোপ গোপীগণেব উত্তর প্রত্যুত্তর-সূচক ভাবগম্ভীর গীতটিও গাহিয়া শুনাইতেন:

'পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়,
কালা ব্রজেব রাখাল ধবে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি, বাঁকানয়ন গোপীব মন মুজে।
পাণ্ডবসথা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজেব ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়।'

এমন একটি দিন (৯ই মে) কখনই ভুলিবাব নহে। তরুতলে বসিয়া আমবা কথাবার্তা কহিতেছিলাম, এমন সময় সহসা ঝড় আসিল। আমরা প্রথমে নদীর তীরে পোস্তায় ও পরে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলিত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার আর দেখা গেল না। চতুর্দিক

---

১ কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক হইতে।

২ নাট্যাচার্য গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। শুধু মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপতনশব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, আর থাকিয়া থাকিয়া ঘোর বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল।

তথাপি বাহ্য প্রকৃতির এই সকল আলোড়নের মধ্যে আমাদের ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহা অপেক্ষাও এক গভীরতর অভিনয় তন্ময়ভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একমাত্র অভিনেতা পাদচারণা করিতেছিল; একই কণ্ঠে সকল অভিনেতার ভূমিকা পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং জীবের ভগবৎ প্রেমই আমাদের সমক্ষে অভিনীত নাটকীয় বিষয় ছিল। অবশেষে সেইভাব আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় সেই সময়ের জন্য এরূপ উর্জিত প্রেমের উদ্দীপন হইল যে, বেগবতী স্রোতস্বতী তাহা নির্বাপিত কবিতে এবং প্রবল ঝঞ্ঝা তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারিত না। 'বিপুল জলরাশি ও কি কখনও প্রেমের নির্বাপণ করিতে পারে; অথবা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে গ্রাস করিতে পারে?' ফলে এই জড়ে প্রাণ সঞ্চাবক নবদেব আমাদের নিকট বিদায় লইবার পূর্বে আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম এবং তিনিও আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কবিলেন।

১৭ মার্চ। আমাদের কুটীরবাসের প্রারম্ভে একদিন স্বামীজী ধীরামাতা এবং জয়া নাম্নী শিষ্যাদ্বয়কে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর নিকট লইয়া গেলেন; তিনি স্বামীজীর নিমন্ত্রণে তাঁহার পল্লীগ্রামের বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা একজন অভ্যাগতা মহিলাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। সেই দিনটি ইহার নিকট জীবনের এক মহামহোৎসবের দিন বলিয়া স্মৃতিপথে জাগরিত রহিয়াছে। সে দিনের ভাগীরথীর মধুর প্রভাব, আচার্যদেবের সহিত দীর্ঘ কথোপ-কথন, আর প্রভাতে জয়ার সনির্বন্ধ ও সাদর অনুরোধে পরম নিষ্ঠাবতীগণেরও অগ্রগণ্যা সেই হিন্দু মহিলাকে তাঁহার শিষ্যাস্থানীয়া

বিদেশিনীগণের সহিত একত্র ভোজনে সম্মত করাইয়া তাঁহার মহৎ অনুষ্ঠান, এবং সেইদিনকার সকল মধুর পবিত্র বন্ধনের সূত্রপাত —এই সকলের কোনটিই সেই অভ্যাগতা মহিলার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবার নহে।

২৫শে মার্চ। এক সপ্তাহ পরে বুধবার অপরাহ্নে সেই অভ্যাগতা পুনরায় তথায় গমন করিলেন এবং শনিবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা তথায় অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় আগমন করা —ইহাই স্বামীজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে—শুক্রবার ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের[১] দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিনজনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানান্তে একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পূজাশেষে আমরা উপরতলায় গেলাম। স্বামীজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া এক ঘণ্টাকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তারপর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎ কার্য সম্বন্ধে নানা সন্দেহ এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জিলিঙ যাত্রা করিলেন এবং প্লেগ সংক্রান্ত ঘোষণা-শ্রবণে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের দিবস পর্যন্ত আমরা ইতিমধ্যে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

---

১ The Day of Annunciation—যেদিন দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের জন্মকথা জ্ঞাপন করেন।

তরা মে। তারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনৈতিক গগন তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সূচনা দেখা যাইতেছিল। সেই সময় প্রতি রজনীতে আরক্ত কুয়াসামণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্র দৃষ্ট হইত। সাধারণের ধারণা—ইহা প্রজাগণের মধ্যে অশান্তিব সূচক। ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহাবা কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান শুভের ন্যায় অশুভ-রূপেও আত্মপ্রকাশ কবেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পূজা করিতে সাহসী হয়।'

তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং যথাসম্ভব আবার পূর্বের ন্যায় দিন কাটিতে লাগিল; যথাসম্ভব—কেন না মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধাবণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সব দিক আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল।

অমরনাথ

কাল—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই হইতে ৮ই অগাস্ট পর্যন্ত
স্থান—কাশ্মীর

২৯শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীব ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটানো হইলে কখনও কখনও তিনি মালাহস্তে তথায় আসিতেন। আজ রাত্রিতে আমাদেব মধ্যে দুইজন বওয়ানেব চতুর্দিক ঘুবিয়া দেখিতে লাগিলেন। বওয়ান জায়গাটি একটি পল্লীগ্রামের মেলার মতো—সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরামাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন কবিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবাবে আমরা পহলগামে পৌঁছিলাম; উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কি না তদ্বিষয়ে স্বামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'স্বামীজী, ইহা সত্য যে আপনাব শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহা প্রকাশ কবা উচিত নহে!' বলিবামাত্র স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনির চারিধারে ঘুবাইয়া আনিলেন—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা তাঁহাকে শক্তিমান

বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে আমাদের ঠিক সম্মুখে খরস্রোতা লিডার নদী ও অপরতীরে পাইনবৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বতমালা বর্তমান ছিল এবং খুব উচ্চে একটি বন্ধ্রের অপর পারে একটি তুষারবর্ত্ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্য পুরা একদিবস অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রিগণ রওনা হইল।

৩০শে জুলাই। প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন ছাউনিটি স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমবা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যূষে জলযোগ কবি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাহাদের পটনিবাস বিদ্যমান ছিল, সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পরবর্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ি যাইবার রাস্তাটি কি সুন্দর! চন্দনবাড়ির একটি গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত বৈকালবেলা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বামীজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তাব জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভৃত্যগণের এবং অন্যান্য যাত্রিগণের নিকট হইতে অনেক ছোটখাট বিষয়ে যে অশেষ সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলাম, তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী; তুই পশলা বৃষ্টির মধ্যের অবকাশটিতে আমি গাছপালা-সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত-আট রকমের Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে তুইটি আমার নিকট নূতন। তৎপরে আমি আমার ফার গাছটির ছায়ায় ভিড়িয়া যাইলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপটপ করিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় চটির রাস্তাটি অন্য সব চটির রাস্তা অপেক্ষা কঠিন ছিল। মনে হইতেছিল বুঝি উহা অফুরন্ত। চন্দনবাড়ির সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন যে, 'ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম' বলিয়া আমাকে উহা খালি পায়ে অতিক্রম করিতে হইবে।' জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটি-নাটিটির উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই বহু সহস্রফিটব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তাহার পর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিতে এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তৎপরে রাস্তাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফিট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮,০০০ ফিট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলিরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসিলদারের, স্বামীজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধ্যাবেলায় সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত হইল। কিন্তু উহা ভাল জ্বলিল না, আবার তুষারবর্ত্মটিও বহু ফিট নিম্নে বিদ্যমান ছিল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর আমি আর স্বামীজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলনস্থল 'পঞ্চতরণী' যাইবার রাস্তাটা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনির সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সবগুলিতেই একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণ-

রূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এ বিষয়ক আইনটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

আহা, কি সুন্দর সুন্দর ফুল! পূর্ব রজনীতে (না অন্ধকার রাত্রে?) বড় বড় নীল ও সাদা Anemone ফুল আমার তাঁবুতে বিছানার নীচে জন্মিয়াছে এবং এখানে অপরাহ্ণে নিকট হইতে তুষারবর্ত্ম দেখিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে চলিয়া গিয়া আমি Gentian, Sedum, Saxifrage এবং ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ সলোম পত্রবিশিষ্ট এক নূতন রকমের ফর্‌গেট-মি-নট্ ফুল দেখিলাম, ঘন-সন্নিবিষ্ট পাতাগুলি রাশীকৃত মখমলের মতো দেখাইতেছিল। এমন কি জুনিপারও এস্থানে অতি বিরল ছিল।

এই সকল উচ্চ অংশে আমরা প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষার শৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধিসমূহের মধ্যে রহিয়াছি—এই নির্বাক বিপুলায়তন পর্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২রা অগস্ট। ২রা অগস্ট মঙ্গলবারে অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে প্রথম যাত্রিদল নিশ্চয়ই রাত্রি দুইটার সময় ছাউনি হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে। আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌঁছিলে সূর্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে গতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। অজাযূথের গতিবিধি-পথের মতো একটি 'পগ্‌ডাণ্ডী' প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া অপর পার্শ্বে—উতরাই-এর অংশে—শষ্পাচ্ছাদিত জমির উপর একটি ক্ষুদ্র সোপান পরম্পরায় পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দুচার পা অন্তর কমনীয় কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজি এবং বন্য গোলাপ ফুটিয়া ছিল এবং ভয় হইতেছিল পাছে লোকে উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার লোভে হাত পা ভাঙ্গে বা প্রাণ হারাইয়া বসে! পরে কোনমতে

ওপারের উতরাইটির তলদেশে পৌঁছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল। গন্তব্যস্থানের মাইলখানেক আগে বরফ শেষ হইল এবং উহা হইতে প্রবাহিত জলধারায় যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। এমনকি, যখন আমরা প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ হইতেছিল, তখনও পর্যন্ত আমাদের পাথবের উপর দিয়া আরও একটি বেশ কঠিন চড়াই কবিতে বাকি ছিল।

স্বামীজী ক্লান্ত হইয়া ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আমি, তিনি যে পীড়িত হইতে পাবেন, তাহা মনে থাকায়, কঙ্কর-স্তূপগুলির নিম্নদেশে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন এবং 'স্নান করিতে যাইতেছি' মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসব হইতে বলিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধবৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে তথায় একটি গির্জা ধরিতে পারে এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ কবিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাব দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃদপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল—

'ও যখন নিজেকে জান্‌তে পারবে; তখন আর এ শরীর রাখবে না।'

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। আর সেখানে কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসা ছিল না, কোন কিছু মন্দ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই!'

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তেব মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষ পালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। 'তাহারা কোন এক নিদাঘ-দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্বদা ইহাও বলিতেন, 'সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যুবর দিয়াছেন।' আর আমাকে তিনি বলিলেন, 'তুমি এখন বুঝিতেছ না। কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে এবং ইহার ফল ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।'

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তন করিলাম উহা কি সুন্দর রাস্তা। সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটিভর

রাস্তা চলিয়া একটি তুষারময় গিরিসঙ্কটে রাত্রির জন্য ছাউনি ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়া যাইবার সময় নিতান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্য এবং আমরা যে খুব শীঘ্রই আসিতেছি—এই কথা জানাইবার জন্য আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়েব বহু পূর্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ কবিলাম। সম্মুখে সূর্য উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, এমন সময় আমরা হতিয়ার তলাও (Lake of Death) নামক হ্রদের উপরিভাগের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সেই হ্রদ—যাহাতে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোত্রপাঠের কম্পনে স্থানচ্যুত একটি তুষাবপ্রবাহ (avalanche) কর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল! একটি ক্ষুদ্র পগ্‌ডাণ্ডী খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া এবং ঐ পথে চলিয়া যথেষ্ট দূবত্ব কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহা একপ্রকার হামাগুড়ি দিয়া যাওয়ারই কাছাকাছি ছিল এবং সকলকেই উহা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উহার নীচে গ্রামবাসিগণ প্রাতঃকালীন জলযোগের মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত ছিল, চাপাটি সেঁকা হইতেছিল এবং চা-ও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিবার অপেক্ষা। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে প্রধান দল হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটি একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর পাইন্ কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এবং শতরঞ্জি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ন্যাসীটি আমাদের সহিত যোগ দিলেন এবং যথেষ্ট কৌতুক-পরিহাসাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আমরা বসিয়া রহিলাম—উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, নদী খরবেগে প্রবাহিতা এবং চারিদিকে বিরাজমান অসংখ্য পার্বত্য পাইন্ বৃক্ষ—এইসব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

৮ই অগস্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম এবং সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল।

প্রাচ্য দেশীয় জননী

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপ প্রাচ্য রমণীকে নিয়ে কাব্যময় স্বপ্ন দেখেছে। কারণ এশিয়া অখণ্ড; বাইজান্টাইনের সময় থেকে গতকাল পর্যন্ত সকল খৃষ্টীয় শিল্পকলাবর্ণিত আশ্চর্য কুমারীর (Maiden) মূর্তিটি কার?—তিনি একজন সাধারণ প্রাচ্যদেশীয় জননী—এ ভিন্ন তাঁর অন্য আর কী পরিচয় আছে? আমরা তাঁর উপবাস এবং বাত্রি জাগরণের বিষয়ে কি কি জেনেছি যা তাঁব নিজের কাছেও অজ্ঞাত নেই, বা যা তাঁকে সাধিকা শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত করেছে? এক প্রগাঢ় বিনতি, যাঁর পরিচ্ছদই তাঁর অবগুণ্ঠন, একটি সুগভীর নীরবতা, এবং তাঁরই ছায়ায় বর্ধিত সেই দেবশিশুর (child) ঢলঢলে অপরূপ লাবণ্য থেকে অনুমান করতে পারি তাঁর সেই মহিমময়ী মাতৃত্বের ঐশ্বর্য—এইগুলি ছাড়া সেই মহিমান্বিতা কুমারীব (Blessed Virgin) বিষয় অধিক আর কি জানতে পারি?

এর অধিক কিছু জানবার বাসনা থাকলে প্রাচ্য দেশ বা ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে জানা যায়। ইসলাম যখন যাযাবর জীবনের বেগে চালিত হোয়ে চাল্‌ডিয়া (chaldia) অতিক্রম করে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, যখন পর্যন্ত মরুভূমি জয় করবার আক্রমণাত্মক অভিযান করেনি, প্যালেস্টাইন ও লেবানন যখন ক্রুসেড জাতীয় (crusade) ধর্মান্দোলনের বিদ্বেষ বহ্নির শিকার রূপে ভস্মীভূত হয়নি, যখন সে দেশগুলিতে কৃষি যোগ্য ভূমি ছিল এবং সেখানে প্রাচীন যুগের কৃষক বাস করত—সেই খৃষ্টপূর্ব যুগের শেষ শতাব্দী গুলিতে সিরিয়ার সাধারণ জীবনের সঙ্গে আজকের হিন্দুজীবনের অধিকতর সাদৃশ্য ছিল। ফারিসী ও সাতুসীদের (Pharisees and sadducees) আনুষ্ঠানিক শুদ্ধিপর্ব, রূপার তৈজসপত্রের নিয়ত শুচিকরণ, অভ্যাস অনুযায়ী একটি মাত্র নাম বা প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি

যা পরে খৃষ্টীয় চেতনায় 'মিথ্যা বা অসার' বলে নিন্দিত—এইগুলি কেবল হিন্দুধর্মের অনুরূপ ছিল তা নয়—আজ যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে জানি তারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। এশিয়ার যে বিরাট জীবন জাল (web of life) ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত স্পর্শ করেছে, সেই বিরাট জীবনজালের অন্তর্ভুক্ত সূতা মাত্র ছিল।

মাতা এবং সন্তানের মতো এমন মৌলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মাচার্য গণ কেবল জাতির বার্তাকে উদ্দীপিত করতে আসেন। ধর্ম প্রবর্তক যীশু কি বলেননি যে, কোন ব্যক্তি যখন তার জননীর চরণ চুম্বন করে, সেই সময়টিতে সে স্বর্গে অবস্থান করে ?

অথচ এমন ভক্তির সঙ্গে পূজিত সেই জননী কত না ক্ষীণ, নবীনা এবং সাধারণ ! সিস্টিন চ্যাপেলের কোন ম্যাডোনার মূর্তির ললাটে সেই পবিত্রতা অথবা কুমারীর সেই নিষ্কলুষ মধুর চাহনি দেখা যায় না, যা দেখতে পাই যে কোন একজন হিন্দু জননীর মধ্যে, যখন তিনি বাম ক্রোড়ে শিশুপুত্র নিয়ে দাঁড়ান,—যখন তাঁর মুখখানি অর্ধেক অবগুণ্ঠনে ঢাকা এবং অর্ধেক অনাবৃত থাকে।

এই ছবিখানি ভারতবাসীর জীবনকেন্দ্রে এমনভাবে বিরাজিত যে সে আদর্শ আবার সাহিত্যেব ভিতর দিয়ে রূপায়িত হবার অপেক্ষা রাখে না। আদর্শ পত্নীকে নিয়ে বহু কাব্যময় এবং পৌরাণিক প্রশস্তি রচিত হয়েছে, জননীর সম্পর্কে একটিও হয়নি। কেবল ঈশ্বরই নরনারীর এবং জননীগণকর্তৃক দেবশিশুরূপে (Holy child) পূজিত হয়েছেন।

নিজের মায়ের কাছে সন্তান চিরদিনই শিশু থাকে। এই সত্য গোপন করা পুরুষোচিত হবে না। তথাপি সর্বাগ্রে সেই জননীর স্বার্থেই শিশু সন্তানের মানুষ হোয়ে ওঠা প্রয়োজন, যাতে অভাবে ও দুঃসময়ে তিনি নিঃসন্দেহে নির্ভর করার অবলম্বন পান।

গার্টডের (হ্যামলেটের মাতা) অপরাধ সম্বন্ধে তাদের যে

বিভীষিকা তা প্রায় অতিরঞ্জিত; তথাপি হ্যামলেট যখনি ঐ বিষয়ে উল্লেখ করেন সেই মুহূর্তেই হ্যামলেট সম্বন্ধে তাদের মোহ বিনষ্ট হয়। সন্তানের কাছে জননীর পাপও তিরস্কারের উর্ধ্বে। নিজেরই অপরাধ ভিন্ন আর কোনও ভাবে এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত নয়।

প্রাচ্যের মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা এবং হাস্য কৌতুকের বিশেষ অভাব দেখা যায়। (প্রাচ্যের) মাতা যে কক্ষে প্রার্থনারতা, সেখানে দিনের পর দিন, তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের উপদ্রব চলতে থাকে, এমন কি হয়তো ঠিক সেই সময়ে তারা ঘরটি দখল করতে উদ্যত, এবং ছেলে মেয়েরা নিরীহ মায়ের পিঠের উপর লাফালাফিও করতে পারে; কারণ তারা ভাল করেই জানে যে, তাদের মাতার শান্ত বিবেক অখণ্ড নীরবতার উপর এতই নির্ভরশীল যে তিনি কেবলমাত্র মিষ্টি হাসির দ্বারাই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। জনৈকা জননী তাঁর পূজার্চনায় এই-ভাবে ব্যাঘাত ঘটানো সম্বন্ধে তাঁর পরিবারের পুরোহিতের কাছে আবেদন জানালে তিনি উত্তরে বলেন,—'কেন মা, ঈশ্বর জানেন যে, তুমি হোলে মা এবং তিনি এই সব ব্যাঘাত মার্জনা করেন।' প্রাচ্য গৃহে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যে শিশুরা পরমশ্রদ্ধায় পিতামাতাকে সম্বোধন করতে শেখে, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তাদেরই দৌরাত্ম্য যা প্রায় বর্বরতারই নামান্তর, তাকে সহ্য করলেও কন্যাসন্তান যদি কেবল পিতার অগ্রে গমন করে, তবে তার দিক থেকে ভদ্রতার সেটুকু সীমা লঙ্ঘনও অনুমোদন যোগ্য নয়। পিতামাতার স্নেহ সন্তানের এই শ্রদ্ধার সমতুল্য এবং এই সুগভীর অনুভূতির রহস্য তখনি হৃদয়ঙ্গম করি, যখন দেখি প্রত্যেকটি শিশু জীবনের প্রথম দুইটি বৎসর সম্পূর্ণরূপে মাতা কর্তৃক প্রতিপালিত। শৈশবের নিবিড়তম অন্তরঙ্গতা ভঙ্গের বহু পূর্ব থেকে শিশুর হৃদয়ে এই চেতনা (অন্তরঙ্গতা) এমন কি চিন্তা পর্যন্ত জাগ্রত করা হয় এবং সে এমন

এক নির্ভরতা যা পাশ্চাত্যে আমাদের নিকট অস্পষ্ট কল্পনামাত্র, কিন্তু যা প্রাচ্যের পুরুষ অথবা নারীর নিকট জাগ্রত স্মৃতি।

কেমন করে এই ভাবটি পূর্ণরূপে দৃঢ়মুদ্রিত হোয়ে যায়, তা কেবল 'মহান্' (Great) বলে যে মোগল সম্রাটকে স্মরণ করা হয় তাঁর ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। আকবরের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা হুমায়ুন পলায়ন কবে এক রাজপুত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই আকবরের জীবনের প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। ঐ রাজপুত গৃহে ছিল আকবরের এক পালিত ভ্রাতা (foster brother)। আকবরের জননীর মৃত্যুর পর সেই রাজপুত সম্রাজ্ঞী শিশু আকবরকে তাঁর নিজ পুত্রের সঙ্গে মানুষ করার ভার গ্রহণ করেন এবং উভয়কে সহোদব ভ্রাতাব ন্যায় একত্র লালনপালন করেন। যদিও আকবর যে অতিথির পুত্র তিনি ছিলেন তৈমুববংশীয় মুসলমান, আর তাঁর নিজ পুত্র ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিন্দুবংশজাত। ঘটনাপ্রবাহে বালকদ্বয় শৈশবেই পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং অদৃষ্টক্রমে ভারত-বিজেতার বংশে জন্মগ্রহণ করেন যে আকবব, তিনিই বহু বৎসর পরে ভারত সম্রাট-রূপে দিল্লীর সিংহাসনে আবোহণ করেন। ঐ সময়ে তিনি দেখলেন, রাজপুত প্রজাগণকে বশ্যতা স্বীকার করানো অতীব কষ্টকর। বারবার তাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ ঘোষণা চলতে লাগল। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিদ্রোহীদের তালিকায় একটি নাম দেখা যেত, এবং যেভাবে পরাক্রান্ত শাসক ঐ নামটিকে প্রশ্রয়ের সঙ্গে উপেক্ষা করতেন, তা দেখে সকলেই বিস্ময়বোধ করতেন। অবশেষে একজন সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করে সম্রাটের দৃষ্টি ঐ দিকে আকর্ষণ করে বলে উঠলেন,—'এবার ন্যায় বিচার হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।' সভাসদের দিকে ফিরে সেই মহান্ সম্রাট বললেন, 'বন্ধু, তুমি বিচারের কথা বলছ। 'আমি এবং সেই ব্যক্তি এক মাতৃদুগ্ধে

প্রতিপালিত, এ ঘটনা ন্যায় বিচারের নামে অতিক্রম করা যায় না।'

এই দীর্ঘ শৈশব এমন একটি বন্ধনের সৃষ্টি করে, যা কোন প্রকারেই ভঙ্গ করা যায় না। ভারতীয় পুরুষের দৃষ্টিতে রমণীর চিন্তারাজি বা অনুভূতি কদাপি উপহাসেব বিষয় হোতে পারে না। জননী যে সন্তানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে অসমর্থ তা তাঁর (পুত্রের) নিকট কোনক্রমেই লজ্জার বিষয় নয়, বরং জননীর এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়াই তাঁর নিকট সঙ্গত ও স্বাভাবিক। চরম অধঃপতন হয়েছে এমন ব্যক্তি ভিন্ন কেহই রমণীর দুর্বলতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নির্দয় আচরণ করতে পারে না। যদি কোন কঠোর কর্মীকে বৃদ্ধ বয়সে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর পরিশ্রমের অভ্যাস এবং খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় অধ্যবসায় তিনি কিরূপে লাভ করেছেন, তাহলে উত্তরে খুব সম্ভব তিনি শৈশবের প্রতি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, যখন তাঁর তরুণী মাতা—যিনি বহু পূর্বে পরলোক গমন করেছেন, পুত্রের সম্বন্ধে অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অথবা যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে স্থির করতে না পেরে বিমূঢ় বোধ করছে, স্বভাবতই সে বালকের ন্যায় জননীর স্ত্রীসুলভ স্বতঃসঞ্জাত বিচারের আলোকে সমস্যাটির সমাধান নির্ণয় করবে। খুব সম্ভবতঃ উক্ত জননী একেবারেই অশিক্ষিত; কিন্তু পুত্র মাতার মনের সরলগতি বিশেষরূপে অবগত আছে এবং ঠিকই বিচাব করে যে, ভালবাসা ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে; আক্ষরিক জ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি অল্প।

পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এমন এক ব্যক্তির ছয় বৎসর বয়সের একটি ঘটনা সত্যই অতি মধুর। জনৈকা জননী লজ্জাবশতঃ তাঁর বিদ্বান স্বামীর নিকট লেখাপড়া শেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে না পেরে গোপনে পুত্রের নিকট তা প্রকাশ করেন।

অতঃপর দিনের পর দিন বালক পুত্র শ্লেটপেন্সিল হাতে গ্রামের পাঠশালা থেকে ছোট ছোট পা ফেলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং আর একবার মার সঙ্গে সকালের পাঠের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এইভাবে পরস্পরের গোপন ব্যবস্থায় নিজ পুত্রের নিকটেই জননী লেখাপড়া শেখেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট তাঁদের মাতার ভালবাসা এক দুর্নিবার অনুভূতি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যু হয়েছে এমন এক বিখ্যাত বাঙ্গালী বিচারপতির সম্বন্ধে একটি ঘটনা শোনা যায়। এমন কি, যে সব ইংরেজ বিচার সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত শুনতেন, তাঁরা পর্যন্ত তা লিখে নথীভুক্ত করে রাখতেন এবং নজীবরূপে উল্লেখ করতেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় তাঁব মা একদিন স্নানের পর পুত্রকে দেখতে আসার সময় কক্ষের চৌকাঠে বাধা পেয়ে পড়ে যান এবং পায়ে আঘাত লাগে। মুহূর্তের মধ্যে ঐ ব্যক্তি দুর্বল শরীরে হামাগুড়ি দিয়ে জননীর সামনে এসে বারংবার তাঁর আহত চরণ চুম্বন করেন এবং আঘাতের জন্য নিজেকে ধিক্কৃত করে তপ্ত অশ্রুদ্বারা জননীর চরণ ধৌত কয়েন। এই কাহিনীগুলি ভারতীয় সমাজে পুনঃপুনঃ স্মরণ ও উল্লেখ করা হয়। তার কারণ এ নয় যে, ঐগুলি বিস্ময় উদ্রেক করে, পরন্তু ঐ সব কাহিনীর স্মরণ ও উল্লেখ দ্বারা ঐ ব্যক্তিব নামই মহিমাপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির প্রথম জীবনে এই সম্পর্ক (মাতাপুত্রের) অটুট থাকে, পরবর্তী জীবনে তার চরম অধঃপতন কখন ঘটতে পারে না; অথবা তার সিদ্ধান্তগুলি যতই বিরুদ্ধ বা ক্ষতিকর মনে হোক্, আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ঘৃণ্য বলে গণ্য হোতে পাবে না। প্রিয়তম পুত্রের জননীর প্রতি ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ সম্পর্কে যে সব তর্ক বিতর্ক খৃষ্ট সমাজকে আলোড়িত করে তাদের কতই না বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়? সেই মহান্ পুত্রের জীবনে তিনি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, তা কি স্বতঃ প্রমাণিত নয়? জননীর প্রতি পুত্রের মধুর

আবেগ ও সম্বোধন অপেক্ষা পুত্রের সঙ্গে একত্ব অনুভবের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আর কী হোতে পাবে? সুতরাং বিস্ময়কর সরলতার সঙ্গে প্রাচ্যের মহান্ হৃদয় আমাদের অসার তর্কসমূহ দূরে নিক্ষেপ করে সত্যকেই সামনে তুলে ধরে।

কিন্তু ভারতে শুধু মহাপুরুষগণই মাতৃপূজা করেন না। মার্চের এক উত্তপ্ত দিনের দীর্ঘ প্রহরগুলির কথা আমি কিছুতেই বিস্মৃত হোতে পারি না—যেদিন আমি প্লেগরোগে আক্রান্ত এক মুমূর্ষু বালকের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। তার বাসগৃহ ছিল খড়ের চাল দেওয়া অতি সামান্য একটি মাটির কুঁড়ে ঘর। পরিবার জাতিতে শূদ্র বা শ্রমিক। এমন কি, তার পিতাকেও মনে হোল নিরক্ষর। বালকটির বয়স এগারো বারো, পিতামাতার একটিমাত্র সন্তান এবং তার মৃত্যু আসন্ন! রোগীকে যারা দেখতে আসত, তাদের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন ছিল রোগ বিস্তারের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন।

যে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে বালকটি শায়িত ছিল, তার অপর দিক দিয়ে অবগুণ্ঠিতা রমণীগণ নীরবে যাতায়াত করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সময় পেলেই নিঃশব্দে বালকের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হতেন এবং এক অজ্ঞতাপ্রসূত অসাবধানতার সঙ্গে নিজেকে ঐ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির সংস্পৃষ্ট করছিলেন। অবশেষে যতদূর সম্ভব শান্তভাবে আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এবং বালকটির কাছ থেকে কিছু দূরে থাকতে অনুরোধ জানালাম, যাতে তিনি নিজে এবং অন্যান্য সকলে বিপদ থেকে রেহাই পান।

নিঃশব্দে তিনি আদেশ পালনেব জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু চলে যাবার সময় তাঁর শীর্ণ গণ্ডদেশ প্লাবিত করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। শাড়ীর অঞ্চল প্রান্ত তুলে চোখ মুছে ফেলে তিনি ক্রন্দন রোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু একেবারে সফল হলেন না। ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে কয়েকটি কথা

আমার কানে এল, 'ও যে ছেলেটির মা!' কল্পনা করা যেতে পারে তখন আমি কী করলাম! সহসা আবিষ্কার করলাম, বালকটিকে বাতাস করা প্রয়োজন এবং সেখানে বাতাস চলাচলের পথের বাইরে বালকের শিয়রে বালিশের পশ্চাতে একটি জায়গা আছে। সেখানে বসে বালকটির মাথা প্রায় নিজের পায়ের কাছে ন্যস্ত রেখে এখন থেকে তার মা মুহূর্তগুলি ছেলের সেবায় আনন্দে অতিবাহিত করতে লাগলেন।

প্রায়ই বিকারের ঘোরে ছেলেটি মার উপস্থিতি ভুলে যাচ্ছিল। ঐ সময় সে বিছানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাথা চালনা করত এবং জ্বরতপ্ত দৃষ্টিতে শূন্যভাবে আমার দিকে তাকিয়ে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করত, 'মা, মা, মাতাজী, মাতাজী, মাগো।' আমার মতো পাশ্চাত্য রমণীর কানে বস্তির এক শিশুর এই ক্রন্দন আশ্চর্য বলে মনে হোত। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলে সে তার মা মনে করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসত। একবার সহসা আমার হাতটি ধবে নিজের ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করল। হে মাধুর্যময়ী অপরিচিতা মা, তোমার প্রাপ্য এই ভালবাসা তোমার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করার জন্য আমাকে ক্ষমা কর—যে ভালবাসা পরিপূর্ণ প্রসন্নতা এবং গভীর আবরণ ভেদ কবে স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়েছে!

হায়, ঐদিনই ছিল তাদের একত্র অবস্থানের শেষ দিন। সারাক্ষণ পীড়িত বালকটি ভগবানের নাম উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। দিনের শেষে সহসা একটি স্তোত্র তার মনে পড়ল। পথে ঘাটে ঐ স্তোত্রটি তখন বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই তার পক্ষে আবৃত্তি করা সম্ভব হোল না। তখন আমার কাজ হোল, তার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলি বারংবার আবৃত্তি করা। স্বস্তির স্মিত হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হোয়ে উঠল। মুহূর্তকালের জন্য সে শান্ত হোয়ে রইল। তারপর

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হোয়ে এল এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মাতার অপলক দৃষ্টির সামনে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

অগণিত লক্ষ লক্ষ হিন্দু এই ধাতুতেই গড়া। মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হোলে পাশ্চাত্য ব্যক্তির মুখে যখন কোন প্রার্থনা বা শপথ গ্রহণ শোনা যায়, তখন শিশু যেমন চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে স্মরণ করে জননীকে, তেমনভাবেই হিন্দু 'মাগো' বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

এমন বহু বহু উদাহরণ দেওয়া সহজ। আমরা চাই মাতৃ-মহিমার সেই মহাকাব্য—প্রত্যেক জননী ও তাব সন্তান যে মহাকাব্যের এক একটি পংক্তি বা শ্লোকমাত্র; আমবা চাই জাতির সেই সর্বগ্রাসী কল্পনা যা ব্যক্তির মাধ্যমেই চিরকাল অভিব্যক্ত হবে।

আমরা হাল্কা ভাবে দান্তের 'নবক-দর্শনে'র কথা বলে থাকি। আমাদেব মধ্যে কয়জন সেই নরক দর্শন করেছে, অথবা দূব থেকেও তার একটা আভাস পেয়েছে যাতে নরক গমনের যথার্থ অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব? যখন উন্মাদগ্রস্ত হোয়ে কোন ব্যক্তি তার নিকটতম প্রিয়জনকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়, যখন কোন ভয়াবহ কল্পনার অভিশাপ আমাদেব আচ্ছন্ন করে বাখে, তখন কোন্ প্রেমিক বা সন্তান বা সেবক আমাদের সেই পঙ্গু এবং ব্যর্থ অবস্থার মধ্যে নিজের অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে বলে ধারণা করতে পারবে? কেবল একজনই আছেন—যিনি আমাদের ত্যাগ করেছেন বলে কল্পনা কবতে পারি না। সেই একজন—যাঁর ইচ্ছা আমাদের নিকট ধর্মের বিধান—অথচ কোনও দণ্ডনীয় অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হবার মুহূর্তে অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তাঁরই কাছে করুণার প্রার্থী হোয়ে সাহায্যের জন্য কাঁদব। এ বিষয়ে হিন্দুর চিন্তাধারায় ঈশ্বরের ভালবাসা

একমাত্র মাতার ভালবাসার সঙ্গে তুলনীয়। স্বামীর মধুর ব্যবহার অনুযায়ী পত্নীর প্রেমের তারতম্য ঘটে; মাতৃস্নেহ পত্নীর প্রেমকে স্বভাবতই অতিক্রম করে যায় এবং সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই স্নেহ গভীরতর হোয়ে অবশেষে প্রিয়জনকে নরকেও অনুসরণ করে। মাতৃস্নেহ বলতে বোঝায় সেই আকুল ভালবাসা যা কোনদিন আমাদের প্রত্যাখ্যান করে না—যা চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকে আশীর্বাদরূপে, যার সান্নিধ্য আমরা কদাচ অতিক্রম করতে পারি—যে প্রেমপূর্ণ হৃদয়-চন্দ্রাতপের মধ্যে আমরা চির নিরাপদ, সেই অতলস্পর্শী মাধুর্য পারাবার, অচ্ছেদ্য স্নেহ বন্ধন, নিষ্কলুষ পবিত্রতা—মাতৃত্ব বলতে এসবই, আরও কত কিছু বোঝায়! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, সুখ বা দুঃখ যাই আসুক শিশু যেমন মাতার বক্ষে পরম নির্ভরতায় অবস্থান করে, প্রত্যেক হিন্দুর অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা সেও বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। এ হোল সেই স্বপ্ন—যাকে বলা হয় নির্বাণ বা মুক্তি। যে সব বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের বদ্ধ করে রাখে তার থেকে মুক্তিলাভ করাকেই বলা হয় ত্যাগ।

'মা' শব্দটিই পবিত্র বলে মনে করা হয়, এবং পূতচরিত্রা স্ত্রীলোকগণের রক্ষার্থে ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাঁদের মা বলে সম্বোধন করে থাকেন। যতই অল্পবয়স্কা এবং সুন্দরী হোন্ কোন অপরিচিত পথিক যদি একজন স্ত্রীলোককে প্রথমেই মাতৃসম্বোধন করেন, তবে তার অপেক্ষা আর কোন সময়োচিত উপকারই তিনি করতে পারেন না। এমন কি, পিতাও তাঁর শিশুকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তারমধ্যে যে অনাগত রহস্যের সন্ধান পান, তা প্রকাশ করবার জন্যই যেন তাকে 'ছোট্ট-মা' বলে সম্বোধন করে থাকেন। আর হিন্দু জাতির জননী সেই উমা হৈমবতীকে, সর্বদা শিশুরূপে কল্পনা এবং গৃহের কন্যারূপেই চিন্তা করা হোয়ে থাকে। মাতৃত্বের

মাধ্যমেই কেবল বিবাহ বন্ধন পবিত্র হয়। ইহা ব্যতীত কেবল স্নেহের প্রশ্রয়ের মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। এই হোল সন্তান-লাভের জন্য আকুলতার সত্যকারের রহস্য। যখন স্বামী পত্নীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করেন, ঈশ্বব আরাধনার সেই উচ্চস্তরে উপনীত হওয়ার মধ্যেই চরম সার্থকতা—তখনই ঘটে স্থূল বন্ধনগুলির অবসান।

এমন বক্তি কে আছেন যিনি কোন রমণীকর্তৃক দেবশিশুর অর্চনা দেখে বিস্মৃত হোতে পারেন? একটি সামান্য খাটের উপর শয়ান অথবা ক্রীড়ারত অবস্থায় বালকৃষ্ণের ক্ষুদ্র একটি পিতলের মূর্তি এবং মূর্তির সামনে উপবিষ্টা এক রমণী তিনি জায়া অথবা জননী নাও হোতে পারেন। কিন্তু স্নানের পর আহারের পূর্ব পর্যন্ত সারা সকাল সেই মূর্তির সামনে বসে তাঁর উদ্দেশে পুষ্প, স্নানের জল, ফলমূল, মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি নিবেদন করে চলেন, মধ্যে মধ্যে নীরব প্রার্থনা ও ধ্যানে তিনি তন্ময় হোয়ে যান। তিনি চেষ্টা করছেন ঈশ্বরকে শিশু পরিত্রাতারূপে পূজা করতে, চেষ্টা করছেন নিজেকে ঈশ্বরের জননীরূপে চিন্তা করতে। আমরা কোন প্রশ্ন করলে তিনি যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে প্রস্তুত। তারপর প্রতি প্রশ্ন করে বলবেন, 'ছেলে-মেয়েরা আমাদের জন্য কী করবে বা না করবে, তার উপর আমাদের সন্তান স্নেহ নির্ভর করবে কী? সেই-ভাবেই ঈশ্বরকে ভালবাসা উচিত। যাদের যত প্রয়োজন মার ভালবাসা তাদের উপর তত অধিক। এইভাবেই ঈশ্বরকে ভালবাসা উচিত।' এই সরল উত্তরটি জগতের সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়। একথাও ভুলে যাওয়া হয় না যে, রক্তমাংসের শরীরধারী যেসব সন্তান মায়ের আহ্বানে সাড়া দেয় তারাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। প্রতি মুহূর্তে শিশুদের আহার করানো, শিক্ষা দেওয়া, খেলা করানো, সেবা বা তাদের নিয়ে আনন্দ করা প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাজ তিনি উপাসনার ভাব নিয়ে করতে পাবেন। পূজার্চনার মধ্য দিয়ে সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ ছিল তাঁর লক্ষ্য। নিজেকে যতক্ষণ

না তিনি আদর্শ জননীরূপে প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন ততক্ষণ তাঁর যথার্থ উপাসনা হয়েছে কী? অথবা সেই আদর্শ আবেগ তিনি অন্তরে পোষণ করতে পেরেছেন কী?

আবাব সন্তান কখন জননীর অভিপ্রায়কে ভুল বোঝে না। কখন তিনি সন্তানের দিকে ফিরে হাসেন, কখন বা বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকান, এই হয়তো প্রশংসা করলেন, আবার পর মুহূর্তে তীব্র ভং র্সনা—কিন্তু সকল অবস্থায় সমানভাবেই তিনি মা। তাঁর সকল কাজের পিছনে অন্তরের অন্তস্তলে থাকে অবিচলিত ভালবাসা। তিনিও ভাল কবে জানেন, তাঁব ছেলেরা যাই করুক তাদেরও মনের ভিতর আব কিছু নেই। সদানন্দ এবং খিটখিটে, বাধ্য, বিনীত এবং জেদী—ছেলে যেমনই হোক, সে আসলে নানাভাবে মাতার উপর তার একই নির্ভরতা প্রকাশ করছে। প্রত্যেক শিশুর স্বভাব অনুযায়ী মা তার সমাদর করেন। বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করার ভিতরেই প্রাচ্য ধর্মের নিজস্ব প্রবণতা ও প্রচেষ্টা নিহিত।

'মা' এই মহান্ শব্দের দ্বারা ভারতবর্ষে কোন্ চিন্তাটির এত উচ্চভাবের অভিব্যক্তি হয়? একি সেই ভালবাসারই কল্পনা নয় —যা কোনদিনও অধিকারেব দাবী রাখে না, যা কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত, যে ভালবাসা প্রতিদানের অপেক্ষা না করে কেবল দিয়ে যায়, যার জ্যোতি আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করতে অক্ষম—কিন্তু যার আলোকে আমরা অভিসিঞ্চিত হই এবং যা চিরদিনের সূর্যালোকের মতো আমাদের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে রাখে!

তথাপি মাতৃত্বের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ আর কোনও আদর্শ আছে কী যা কোন প্রকাব আত্মসংযমের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়নি? সন্তানের নিকট প্রাপ্ত এই দুর্লভ পূজার জন্য কোন্ মূল্য হিন্দু রমণীকে দিতে হয়? বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করার মধ্যেই তার মূল্য নিহিত। প্রকৃত পক্ষে মাতৃপূজার অর্থ পবিত্রতা ও

নিষ্ঠার পূজা। হিন্দু পুত্র যদি কখনও এ কথা ভাবতে পারত যে তার পিতার প্রতি তার মাতার আনুগত্য মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়েছে—যে প্ররোচনা, ঔদাসীন্য বা নিষ্ঠুর ব্যবহারই তাঁর প্রতি করা হোয়ে থাকুক না কেন—তা হোলে সেই মুহূর্তে জননীকে কেন্দ্র করে তার আদর্শবাদ এক তীব্র যন্ত্রণায় পরিণত হবে। হিন্দুর চোখে যে বিধবা পুনর্বার বিবাহ করেছে সে চরিত্রহীনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। বাগদত্তা নারীর ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। ভাবী স্বামীর মৃত্যুর পরে বাগদত্তা বালিকা পরিচিত হয় বালবিধবা রূপে।

বিবাহের এই অলঙ্ঘনীয় বন্ধনের সঙ্গে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা প্রেমেব বিশেষ সম্পর্ক নেই। একবার যিনি পরিণীতা পত্নী হয়েছেন তিনি চিরদিন পত্নীই থাকেন। যদিও ঐ বন্ধনের দ্বারা অপর সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটতে পারে অথবা হয়তো পত্নী সম্পর্কের অস্তিত্ব কেবল নামে মাত্র থাকে। তাঁর জীবনে অন্য পুরুষেব অস্তিত্ব ছায়ার মতো, স্বামীর সঙ্গিনীরূপে তাঁকে অনুসরণ করে যে কোন পথ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত পরিক্রম করতে তিনি সদা প্রস্তুত—এবং এই সব মনোভাবই ভাবতবর্ষে পত্নীর পবিত্রতার পরিচয়। রুদ্ধনিশ্বাসে কোন কোন পত্নীর কাহিনী বলা হয়, যাঁরা প্রিয়তম পতির মৃত্যু আসন্ন শুনে স্মিত হেসে নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হোয়ে বলেছিলেন, 'আমি তাঁর আগে যেতে চাই, পরে নয়,' এবং সে নিদ্রা চির নিদ্রায় পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে পবিত্রতার অর্থ শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়? কোথায় এবং কখন আমরা বলতে পারি যে পবিত্রতা বিদ্যমান অথবা কেমন করেই বা এই মুহূর্তে এখানে পবিত্রতার অস্তিত্ব নেই এ বিষয়ের মীমাংসা করব? চিরকালের জন্য এক-জনের অধিকারভুক্ত হোয়ে থাকার মধ্যে কোন্ ধরণের বিশুদ্ধতা বর্তমান? আর যদি বিশুদ্ধতা বলতে কেবল মনেরই ধর্ম বোঝায় তবে কোন দৈহিক পরীক্ষার দ্বারা তার যথার্থ বিচার হবে?

ভারতীয় জীবনচর্চায় পবিত্রতার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু হিন্দু ন্যায় শাস্ত্রের ক্ষমাহীন নগ্ন সত্যের সামনে পবিত্রতা অনুসন্ধানের এই আকাঙ্ক্ষাও গৌণ হোয়ে যায়। ভারতবর্ষ স্বীকার করে যে, শেষ পর্যন্ত কোন একটি মাত্র নির্দিষ্ট বস্তুকে পবিত্রতা বলে অভিহিত করা চলেনা। ব্যক্তি-জীবনকে অবলম্বন করে নৈর্ব্যক্তিক বিশাল জীবনের ধারা প্রবাহিত হোয়ে চলে এবং তখন সময় বিশেষে প্রত্যেকটি ধর্ম পবিত্রতারই নামান্তর হোয়ে ওঠে।

সুতরাং বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত মাতৃত্বের পবিত্রতার আদর্শ আরও মহত্তর আর এক আদর্শ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যরূপ পবিত্রতার মধ্যেই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত পরিণতিলাভ করে। খদ্যোতের সঙ্গে মেরুপর্বতের ন্যায়—গৃহীর সঙ্গে তুলনায় সমাজ-ত্যাগীর (সন্ন্যাসীর) উচ্চ আদর্শই সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনের অনুমোদন প্রদান করে। যে পরিমাণে মানুষ পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরিমাণে সে পূর্ণ মহত্ত্ব লাভ করে, জননীও আত্মোৎসর্গরূপ মধুর কারাগৃহে প্রবেশ করেন, যাতে তাঁর সন্তানের কাছে জীবনের সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করতে পারেন, যাতে তাঁর নিষ্কলুষ ভক্তিপূত জীবনের মধ্য দিয়ে সন্তানের দৃষ্টির সামনে জীবনকে পরিস্ফুট করতে পারেন—যা সুদূর নক্ষত্রালোক পর্যন্ত প্রসারিত।

জাতীয় জীবনে নারীর স্থান

ভারতীয় পল্লীর দীর্ঘ সর্পিল পথ যখন উষা সমাগমে আলোকিত হোয়ে ওঠে, ক্ষণিক পথচারী প্রত্যেকটি গৃহের প্রবেশপথে দ্বার পূজায় নিযুক্তা কোন না কোন রমণীকে দেখতে পাবেন। মাটির উপর চালের গুঁড়া ও মধ্যে মধ্যে পুষ্পদ্বারা সজ্জিত একটি নক্সা কয়েকঘণ্টার জন্য রক্ষিত হয়। বোঝা যায় যে, মার্জনা এবং অর্চনা সাঙ্গ হয়েছে। আল্পনার কারুশিল্পের সাবলীল বিকাশেব মধ্যে গৃহের আনন্দের নীরব প্রকাশ পবিস্ফুট। পুষ্পের সমারোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে গৃহের প্রাচুর্য অথবা দারিদ্র্য। কোথাও উজ্জ্বল পুষ্পসম্ভার, কোথাও বা দু'তিনটি শুভ্র ডেজির গুচ্ছ, অথবা আর কোন সাধারণ উপকবণ।

কিন্তু সর্বত্রই আমরা চিন্তার একটা অভ্যাস দেখতে পাই, যাব কাছে সকল বস্তুই প্রতীকধর্মী। দ্বারদেশের বায়ু সারাদিনের আসা যাওয়ার অস্পষ্ট সঙ্কেত বহন করে। প্রত্যূষে দ্বার খুলে উন্মুক্ত করে রাখার কাজটি নিরাপদ বলে গণ্য করা হয় না, যদি না ঐ কাজটি এমন একজন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, যিনি ঐ সময় ঈশ্বরের নিকট প্রিয়জনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তা করেন।

এই জাতীয় চিন্তা অতি প্রাচীন যুগেব রীতি ছিল—যে যুগে উৎপত্তি হয়েছিল পৌরাণিক কাহিনীব, যার থেকে আবির্ভাব ধর্মের এবং যেখান থেকে 'অদৃষ্ট' সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট এবং রহস্যময় ধারণার জন্ম। রীতিনীতির স্বরূপ থেকে তাদের বয়স নির্ধারণ করা যায়। সহস্র বৎসর ধরে নিশ্চয়ই ভারতীয় নারীগণ নিদ্রাভঙ্গের পর প্রদীপ হস্তে প্রবেশ পথটিকে প্রণাম জানিয়ে আসছেন। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কৃষককুল ও তৃণদলের সহিষ্ণুতার মতো শত শত বৎসরের সরলতা ও সহিষ্ণুতা প্রকাশিত হয়। নারীর এই সহনশীলতাই সৃষ্টি করে সভ্যতার। ভারতীয় নারীর এই

সহনশীলতা এবং অপার কল্পনাশক্তির সংমিশ্রনেই অতীতে এবং বর্তমানে ভারতের জাতীয়তার উদ্ভব।

আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারত-ভূমিব কাব্যস্বরূপ। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ যে সংহতি ও সামাজিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে প্রাচ্যে তা আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রয়েছে। কেবল বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের দিক দিয়ে নয়, পরন্তু স্থানের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্ক হেতু বৃহৎ ব্যাপারেও প্রাচ্য জীবন এক সামগ্রিক জীবন। এমন কি, শহরের মধ্যেও কোন হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রা পূর্বপুরুষের গ্রাম্য জীবনধারার অখণ্ড স্মৃতি বহন করে; গোঁড়া জীবন বলতে মূলতঃ গ্রাম্যজীবনই বোঝায়, যা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অবিকৃত থেকে যায়।

সম্ভবতঃ পারিবারিক জীবনে গাভী যে স্থান অধিকার করে আছে তার মধ্যেই এই বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত। পল্লীগ্রামের মধ্যে ভ্রমণকালে বিভিন্ন অঞ্চলের সমৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য গোচারণ-ভূমিগুলির প্রতি লক্ষ্য করতে আমরা অভ্যস্ত হই। যে সব পরিবেশে অতিকষ্টে অশ্বগণ সাহায্য করতে পারে, তেমন স্থানে সহিষ্ণু বলদ হোল কৃষিকার্যের উপকারী বন্ধু এবং তার সাহায্য ব্যতীত ভূমি কর্ষণ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এইভাবে আর্যজাতি এবং গাভীসমূহের পরস্পরের সহযোগে গড়ে উঠেছে আজকের ভারত এবং এই বিষয়টি কৃষককুল কখনও বিস্মৃত হয় না। অপরপক্ষে বলা যেতে পারে, পাঁচ হাজার বছর ধরে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এই চতুষ্পদ প্রাণীটি প্রায় মানবীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে; এবং প্রাচ্য দেশে এই নিরীহ শান্ত পশুটি তার কোমল দৃষ্টিতে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নির্ভরতার বিশ্বাস নিয়ে যে ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তা পাশ্চাত্য পশুদের মধ্যে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। এই গাভীগুলি বহুবার

প্রসব করে ; এদের আকৃতিও অসংখ্য রকমের। কাশী ও উত্তর-প্রদেশের শহরগুলির সমৃদ্ধ বাজার-অঞ্চলে উন্নত ও বলিষ্ঠ ধরনের ষাঁড় প্রতিপালিত হয়। এদের বলা হয় শিবের ষাঁড়। এরা পথে পথে অবাধে বিচরণ করে, যদৃচ্ছা ছোট বড় দোকানের সামনে যেসব খাদ্যদ্রব্য থাকে তা ভক্ষণ করে এবং সেজন্য কেহই তাদের বিন্দুমাত্র তাড়না করে না। আবার দক্ষিণ দেশে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কুকুর অপেক্ষা কিছু বড় আর এক ধরনের বলদ দেখা যায়, যদিও দুজন মানুষ সমেত একটি শকট টেনে নিয়ে যাবার মত যথেষ্ট বলশালী। সম্ভবতঃ জগতের ভারবাহী পশুদের মধ্যে মহীশূরের বলদের মতো সুন্দর পশু আর দেখা যায় না। কিন্তু প্রায় সমস্ত ভারতীয় বলদ তাদের পাশ্চাত্য সমগোত্রীয়দের অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র এবং প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য হোল একটি করে স্পষ্ট দৃশ্যমান ককুদ—যার সামনে লাঙ্গলের জোয়াল ন্যস্ত করা হয়।

জাতীয় জীবনের সেই কল্যাণকর পরিকল্পনায়—যাকে আমরা হিন্দুত্ব বলে অভিহিত করি,—গাভীর জীবন যে এতখানি স্থান অধিকার করে আছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে যুগ সম্পর্কে কে যথার্থ ধারণা করতে পেরেছে যে যুগে প্রয়োজনীয় সংখ্যানুযায়ী দেশের হিসাব নিকাশ করা হয়েছিল—যে যুগে ক্ষুধার তাড়নায় এমন একটি মূল্যবান জীবনের বিনাশ সমাজের বিরুদ্ধে প্রায়শ্চিত্ত-হীন পাপ বলে পরিগণিত হোত? স্বাভাবিক যে এই পশুগণের মধ্যে জনগণ তাদের কাব্যানুভূতির অন্যতম উৎস খুঁজে পাবে। যে সব পারিবারিক স্নেহ আমরা কুকুর ও বিড়ালের উপর বিতরণ করে ঐ মূক জীবদের প্রকৃত সঙ্গী ও গৃহবন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত করি সেই সব প্রীতি এখানে গাভীদের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হোয়ে থাকে। এমন কি, শহরাঞ্চলে যেখানে প্রস্তরময় প্রাঙ্গনই হোল একমাত্র গোচারণের ভূমি, সেখানেও তাদের প্রতিপালন করা হয়,

এবং দরিদ্রের কুটীরে যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করে সেই গোয়ালার ঘরটি পরিবারের যে কোন ব্যক্তির ঘরের মতোই সুবিন্যস্ত ও পরিপূর্ণ।

উত্তরাঞ্চলে ফল সংগ্রহ ও শস্য আহরণ উৎসবকে যথার্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে পৃথক করা কঠিন। উভয় ক্ষেত্রেই ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্য এবং প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে একাত্মতা তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। হিন্দু পরিবারে নূতন একটি গাভীর আগমন ঘটনাও অনুরূপ আবেগে মণ্ডিত। সমগ্র পরিবার নবাগতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, এবং দ্বারদেশে প্রবেশ করামাত্র তাকে পুষ্পদ্বারা সজ্জিত ও প্রাচুর্যের সঙ্গে আহার করানো হয়। অপরিচিত আবাসকে যাতে সে গৃহরূপে গ্রহণ করতে পারে, তাবজন্য নানাভাবে আদর বর্ষণ করা হয়। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ-কেন্দ্রিক নয়, বিড়ালের প্রতি আমাদের যত্নের পশ্চাতে যেমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমাদের গৃহ থেকে দূরে গিয়ে সে যেন সুখী বোধ না করে। ভারতবর্ষে এই ব্যাপারে একটা অভ্যাসগত প্রায় স্বাভাবিক স্বীকৃতি আছে যে, আসলে মনই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং সোজাসুজি মনের কাছে আবেদন জানানোই তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর পশুদের আমরা যে সংজ্ঞাই দিই না কেন, কোন হিন্দুকে যুক্তিদ্বারা বোঝাবার প্রয়োজন হয় না যে, পরিবেশ মনের মতো হোলে গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তার কাজকর্ম যথোচিত সম্পাদন করে। এই বিষয়টি তার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। অভ্যর্থনা উৎসবেও পরিবাববর্গের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজক চিন্তা বা ভাবাবেগ সযত্নে প্রশমিত এবং মানসিক আব-হাওয়াকে সংযত ও শান্ত রাখবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়।

বালিকাগণের শিক্ষায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কারণ নারীর সমগ্র জীবনে গাভী তার নিত্য সঙ্গী। সুতরাং গাভীর প্রতি ব্যবহার এবং তার তত্ত্বাবধান বিষয়ে সম্যক

জ্ঞান থাকা নারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য প্রবচন আছে যে, অতি অল্প সংখ্যক পরিবারই সন্তান, অর্থ এবং দুগ্ধ এই তিনটি বিষয়ে ভাগ্যবান। গৃহ হয়তো শিশুদের কলহাস্যে মুখরিত এবং তাদের লালন পালনের জন্য যথেষ্ট অর্থও আছে, কিন্তু তবুও দুগ্ধ কি নষ্ট হোয়ে যেতে পাবে না, অথবা গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করতে পারে না? সুতরাং পুত্রদের জন্য বধূ নির্বাচন কালে এ বিষয় লক্ষ্য করা অতীব প্রয়োজন যে, সে গাভীর পরিচর্যায় সিদ্ধহস্ত কিনা; এবং এই 'হাত যশ' অর্জন করার জন্য বালিকাদের সকাল পাঁচটায় গাত্রোত্থানপূর্বক গাভীর সম্মুখে ঘণ্টাধিক কাল উপবেশন কবে তার কণ্ঠে মাল্যদান, পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সুখাদ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাসূচক মন্ত্রাদি আবৃত্তি করতে হয়।

বস্তুতঃ পারিবারিক ঋণের শেষ নেই। জনৈক হিন্দু বলেছিলেন, 'দুগ্ধই একমাত্র আহার যা ভালবাসা থেকে সঞ্জাত।' সম্ভবতঃ সেই কারণেই যে দেশে মানসিক প্রভাবেব উপর আহার সম্বন্ধে এতখানি চিন্তা করা হয়, সেখানে দুধের সঙ্গে ফল এবং মধু সাধুগণের উপযোগী পুষ্টিকর প্রিয় খাদ্য বলে পরিগণিত হয়। গাভীমাতা জ্বালানি এবং ঔষধও সবরাহ করে থাকে। গোময় বীজাণু নাশক এবং এর ভিতরে শুদ্ধিকর গুণাবলী বর্তমান। দরিদ্র কিন্তু সদ্‌বংশজাত কোন কন্যা অথবা দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত কোন রাজকন্যার পক্ষেও মাটির মেঝে যাতে স্যাঁতসেঁতে না হয় সেজন্য স্বহস্তে গোময় লেপন কোনক্রমেই অবমাননাকর নয়। কৃষকের নিকট গোবরের গন্ধ সর্বদা সুরভিত বলেই বোধ হয়।

পাঞ্জাব থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সন্ধ্যাকাল জাপানের 'কে সে' নামে পরম মুহূর্ত এবং চীনের হরিদ্রাভ ধূলির সময়, সবই গোধূলি লগ্ন বলে খ্যাত। এই একটি শব্দে পল্লীগ্রামের ছবি এবং

রাত্রির জন্য দলবদ্ধ পশুগুলিকে গৃহে নিয়ে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এশিয়া মহাদেশীয় দেশগুলির অন্যতম বিশেষ গৌরবের বিষয় হোল, পাণ্ডিত্যের আধ্যাত্মিক মূল্যের সর্বজনীন স্বীকৃতির সঙ্গে কৃত্রিম এবং বিলাসময় অভিজাত জীবন প্রণালীর পরিবর্তে সমগ্র জনগণের সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সর্বদাই সামাজিক আদর্শ হিসাবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে শ্রম ক্রমে শাসনের স্তরে উন্নীত হোয়ে প্রার্থনা এবং মাতৃত্বের সঙ্গে অবস্থান করে—যা হোল নারীর বিশেষ অধিকার এবং এইটিই জাতীয় ধর্মে তার অখণ্ড অবদান। পশুচারণের পারিবারিক আবশ্যকীয় কর্মের ভার কৃষক সম্প্রদায়ের রমণীগণ অপেক্ষা তার (অভিজাত শ্রেণীর রমণীর) উপর কম ন্যস্ত। সেই হেতু সে সূচীশিল্পের জন্য অবসর লাভ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় আরবেও আদর্শকে রূপায়িত করতে হয়েছে। 'Our Lady of the Moslems'[১] কে সকলে ভালবাসতেন, কারণ যদিও তিনি ছিলেন পয়গম্বরের (ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ) কন্যা, তথাপি তিনি তাঁর সুকোমল হস্তদ্বয়দ্বারা যাঁতা ঘোরাতেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল পরিজনদের জন্য মিতব্যয়িতার সঙ্গে গৃহস্থালী কার্যে পরিশ্রম করতেন। এই সকল কার্যের মধ্যে মধ্যে অনুরূপ মাধুর্যের সঙ্গে তিনি বলতেন যে, চরম বিচারের দিনে (Day of Judgement) ঈশ্বরের নিকট যৌতুকস্বরূপ তিনি সকল মুসলমানের মুক্তি প্রার্থনা করবেন।

ভারতবর্ষে গোশালা, রন্ধনশালা, গব্যশালা (dairy), শস্য-ভাণ্ডার, উপাসনালয়, অন্যান্য অসংখ্য কর্মের সঙ্গে পরিবারের মহিলাদের সারাদিনব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে।

১ ফতেমা—পয়গম্বর মহম্মদ ও খাদিজার কন্যা। পয়গম্বর তাঁকে অন্য কোন সৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন।

প্রাচীন ধনীর গৃহে বৃহৎ রন্ধনশালা এবং পাচক পাচিকাদের জন্য একটি অলিন্দ (Verandah) থাকে ; উপরন্তু মাতা, কন্যা এবং পুত্রবধূদের জন্য সারি সারি রন্ধন প্রকোষ্ঠও থাকে। অন্তঃপুরের মধ্য দিয়েই শাকসব্জী ও ফলের বাগানের একমাত্র প্রবেশ পথ। এই সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হোল, কিরূপ কুশলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে দৈনন্দিন কাজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদিত করা হয়। খাদ্য প্রস্তুত ব্যাপারে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বিশেষ কাজে ভারতীয়েরা বাল্যকাল থেকে প্রেম ও আতিথেয়তার ঘনীভূত মাধুর্য প্রয়োগ করতে শিক্ষা পায়। তাঁর নিজের অর্থে বহুজনের ক্ষুধা নিবৃত্ত হচ্ছে দেখে গৃহকর্তা এবং সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করে আহার করানোর মধ্যে গৃহকর্ত্রী যে আনন্দলাভ করে থাকেন, সম্ভবতঃ আমাদের (পাশ্চাত্যের) মধ্যে এমন একটিও প্রতিষ্ঠান নেই যার ভিতর দিয়ে আমরা ঐ আনন্দের ধারণা করতে পারি।

প্রত্যেক নারীই পাচিকা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রন্ধনকার্যে সুনিপুণা। অতীতে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবেশী পরিবারের নিকট থেকে রন্ধনকার্যে সহায়তা করার জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়াটা সর্বোচ্চ প্রশংসার বিষয় ছিল। এমন কি, হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য সংগঠন ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হোলেও এবং বর্তমানে জরুরী প্রয়োজনে রন্ধন কাজটির ভার ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত করা হোলেও, তাদের কিন্তু ঠিক সামাজিকভাবে ভৃত্য বলে মনে করা হয়না, যদিও তারা দৈনিক ঐ কাজের জন্য মজুরী গ্রহণ করে থাকে।

এইভাবে একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ভারতীয় নারীর জীবনকে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিশাল সহযোগিতারূপে বিবেচনা করা যায়, সেই সঙ্গে সকল প্রকার সূক্ষ্মতা, কোমলতা এবং আত্মমর্যাদা দ্বারা শ্রমকেও মহীয়ান্ করে তোলা হয়। এবং

এই দাবীও করা যেতে পারে যে, জগতে একমাত্র রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারই উচ্চস্তরের সভ্যতার সঙ্গে সর্বপ্রকার পারিবারিক দাসত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। অবশ্য য়ুরোপ এবং আমেরিকা ক্রীতদাস প্রথা যে অবস্থায় উপনীত করেছে, এশিয়াতে বিশিষ্ট ধর্মীয় পদ্ধতির অনুশাসনে কখনই সেই অর্থে ঐ প্রথা ব্যবহৃত হয়নি। এখনও এমন ব্যক্তিগণ জীবিত আছে যাদের বাল্যকালে রাজপুত বা বাঙ্গালী পরিবার ক্রীতদাস (গোলাম) রূপে ক্রয় করেছিল। পিতৃমাতৃহীন এই বালকগণ পবিবারের অন্যান্য বালকবালিকার সঙ্গে একত্র লালিত পালিত হোত এবং শিক্ষালাভ কবত, যদিও তাদের নিয়োগ করা হোত নিম্নতর কার্যে। অর্থ উপার্জনের সময় এলে পূর্বতন কর্তা বা কর্ত্রীর কখনও মনে একথা উদয় হয়নি যে, তাঁদের পোষ্যদের বেতনের উপর কোনরূপ দাবীদাওয়া আছে। যদিও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেব বিবাহ দিয়ে যথাযথরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে না পেরেছেন ততক্ষণ তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করা হোত না। এই মনুষ্যত্ববোধের একটি অদ্ভুত ফল এই যে, 'ক্রীতদাস' শব্দটি য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় এশিয়াবাসীর মনে ততখানি অপমানের জ্বালা সৃষ্টি করে না।

দুর্ভিক্ষের কবলে বিপর্যস্ত হয়নি, এমন সব স্থানে ভ্রমণের সময় ভাবতীয় কৃষক সমাজের সুখের নিদর্শনগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। সারি সারি নারকেল, বেণু ও কলাগাছের মধ্যে প্রায় আবৃত উচ্চভূমির উপর সুদৃশ্য খড়ের চাল অথবা টালি দেওয়া দাওয়া সমেত মাটির বাসগৃহগুলি, চারণরত গাভীসহ শ্যামল শষ্পাবৃত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ধানের ক্ষেত, আম্রকুঞ্জ, নবীন বেণুকুঞ্জ দ্বারা আবৃত কোন পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য কুটীর বা খামাব এবং দিগন্তে প্রসারিত সুনীল গম্বুজের মতো কম্পমান পর্ণরাজির সারি—এই হোল ভারতীয় চিত্তেব প্রিয় দৃশ্য। সুদূর নগরাঞ্চলেও প্রত্যেকটি উংসব এর স্মৃতি বহন করে আনে। নারকেল বসানো জলের কলস, থামের উপর

দাঁড় করানো কলাগাছের চারা, দ্বারের উপর আম্র পল্লবের মালা— এ সবই শুভ লক্ষণযুক্ত এবং সেজন্যই সর্বজনীন সজ্জা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তরুবীথি, স্রোতস্বিনী, এবং তৃণভূমির এই স্বাভাবিক পরিবেশের আকাঙ্ক্ষাই গৃহের কঠিন স্থাপত্য শিল্প সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রীকে পরিতৃপ্ত রাখে। কোন অনাবশ্যক সজ্জা উপকরণের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকে না। যে ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ গভীর এবং সচেতন নয়, সে ঠিক ভারতীয় জীবনযাত্রা অনুসরণ করে না। রাজপুতানা এবং উত্তরাঞ্চলের মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদশ্রেণীর সুন্দর সৌধগুলিতে সুদৃশ্য দ্রব্যসমূহের পবিবর্তে এই আদর্শের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশের কৃষকের কুটীর ও খামারগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখা যায়।

বস্তুতঃ যদি আমাদের যথার্থভাবে একজন ভারতীয় নারীর জীবন বর্ণনা করতে হয়, তবে অবশ্যই তা কৃষকের জীবনচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। প্রত্যেক ঋতুর প্রত্যেকটি লতা, প্রত্যেকটি পুষ্প, এবং ফল কোন না কোন ঐতিহাসিক বা কাব্যিক যোগাযোগের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। যে কদম্ববৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি আমাদের দেশের কঠিন বলের মতো দেখায়, তারই নীচে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতেন কৃষ্ণ। যে অশত্থবৃক্ষের পত্রগুলি এত কোমলভাবে বিন্যস্ত যে, নিস্তব্ধতম দ্বিপ্রহরেও আমাদের পপ্‌লার (aspen) বৃক্ষের ন্যায় কম্পমান থাকে, সেই বৃক্ষের বিশাল সুশীতল ছায়াতলে গভীর নিশীথে নির্বাণ লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব। যে সুকোমল শিরীষ পুষ্প 'ভ্রমরের চরণ আঘাত সহ্য করতে পারে, কিন্তু কদাচ পক্ষীর ভার বহন করতে পারেন না' (পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥—কুমারসম্ভব) তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় নারীর ওষ্ঠাধর, শিশুর হৃদয়, এই জাতীয় কোমল ও সুন্দর জিনিসের কথা। আমলকী ফল যে কেবল গৃহস্থালীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং

উপাদেয় তা নয়,—এই ফল সংরক্ষিত করে রাখাও একটি গুণের পরিচয়, পরন্তু আমলকী নামটিই বৌদ্ধ প্রভাবিত এশিয়ায় সব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান্ যুগের কথা —যখন স্থাপত্য বিষয়ক অলঙ্কারব্রূপে তার ব্যবহার ছিল। আম্র-মুকুলেব সৌরভ হোল কামদেবের (cupid) পঞ্চশরের অন্যতম। আতাফল ছিল সীতার বিশেষ প্রিয়।

যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনজীবনে গভীরভাবে পরস্পর সংবদ্ধ যে ভাবসমূহ পুঞ্জীভূত হয়েছে—এগুলি তাদেরই কয়েকটিমাত্র। কল্পনার এই ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়নি এমন কোন নিরাবরণ গৃহ নেই, কারণ বহুপূর্বেই তা ভাষার বিন্যাসের সঙ্গে ওতঃপ্রতোভাবে মিশে গেছে। যত উচ্চ বা নিম্ন বর্ণ ই হোক কেহই এব প্রভাবের বাইরে নয়।" এ এক অপরিমেয় জাতীয় সম্পত্তি, যা জাগ্রত করে পারস্পরিক অনুভূতি এবং সাধারণ স্মৃতিবোধ, সেই সঙ্গে দান করে ব্যক্তিগত রুচি এবং কল্পনার বিকাশের জন্য প্রচুর উপাদান। সর্বোপরি ভারতীয় চিত্তকে তার স্বদেশের মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখতে ও বিদেশীকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিষয়ে নীরব কঠোরতার সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এ যেন এক আঙ্গিক অচ্ছেদ্য বন্ধনের মতো কার্য করে।

জনগণ অবশ্য শৈশবে তাদের এই উত্তরাধিকারের অংশ গ্রহণে দীক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে বিদ্যাভ্যাসের পর প্রত্যাবর্তন করে তারা অধিকতর সম্পূর্ণতার সঙ্গে দেশীয় লোকাচারবিদ্যা নূতন উদ্যমের সঙ্গে অর্জন করে। কিন্তু নারীগণ সর্বদাই সেই আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে। এই বাস্তবতার পটভূমিতে তাদের সরল ধর্মনিষ্ঠ জীবন বিন্যস্ত হয়। নারীগণের মধ্য দিয়েই এই ভাবসমূহের বিশালতা ও অবিচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হয়।

এইরূপে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় জীবন ও সমাজ সংগঠন সুসঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। এর রীতিনীতি এবং আদর্শ

স্বদেশের মাটি থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে বলে স্থায়ী হয়, যে হেতু পরিবেশের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যাঁরা সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান জাতির সুবিধাভোগী সদস্য বলে আত্মতুষ্টি উপভোগ করেন তাঁদের কাছে বিষয়টি ধারণার অতীত।

জৈব দেহের ন্যায় সামাজিক অখণ্ডতা এক প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীব মধ্য দিয়ে অদ্ভুত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু থেকে, জনগণ তাঁব উরু থেকে এবং শ্রমিকগণ তাঁর পাদদেশ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এই প্রণালীতে যে ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার উপর আরোপিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষকগণ যাঁবা নিজের দেশের বাইরে কিছু দেখেননি, তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি।

যা হোক আধুনিক শিক্ষার্থী বিস্তৃত ভৌগলিক জ্ঞান লাভ করে শিক্ষিত হয় বলে ভাবতীয় সমন্বয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য— আঞ্চলিক অর্থে এর সম্পূর্ণ অখণ্ডরূপ লক্ষ্য কবে বিস্মিত না হোয়ে পাবে না। বিশাল সীমানার অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রদেশ জাতীয়তা-বোধ পরিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। কোনও প্রদেশ অপর প্রদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করে না। জেলাগুলির সম্পর্কে যা সত্য, তা সমগ্র জনসাধারণ, বিশেষ করে নারী জাতির ক্ষেত্রে সমভাবেই সত্য। জাতীয় চরিত্রের মধ্যে আমরা সর্বদা জাতীয় ইতিহাসের সারাংশ দেখতে পাই। এই বিষয়টি ভারত অপেক্ষা আর কোনও দেশের পক্ষে অধিকতর সত্য নয়।

সাধকোচিত একাগ্রতা নিয়ে বাঙ্গালী স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ভক্তি করেন, সন্তানগণ ও পরিবারবর্গের সেবা করেন। মহারাষ্ট্র রমণীগণ পাশ্চাত্যের যে কোন রমণীর ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্মতৎপর। রাজপুত-রাজ্ঞী স্বজাতির অপ্রতিহত সাহসের জন্য গর্বিতা। যার জন্য

তিনি চিতাগ্নি পর্যন্ত স্বামীকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু কদাপি সম্রাটকে অনুমতি দেবেন না, তাঁর স্ত্রীকে অধীনস্থ প্রজা হিসাবে উল্লেখ করতে। মাদ্রাজের নারী আধ্যাত্মিক জীবনের ধ্রুবতারা লাভের জন্য কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করেন। বর্তমানকালের অপ্রতিরোধ্য তরঙ্গ তার সামাজিক প্রথাব যে অংশগুলি ধ্বংস করতে উন্মুখ, তিনি বার বার সাবধানে তা আবার গড়ে তুলতে সচেষ্ট। অন্যান্য দেশের বণিক সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণের মতোই গুজরাটের কন্যাগণ কোমল, রেশমতুল্য, কুসুমের মতো এবং সুন্দর—তারা যেন স্বপ্নের মতো জড়িয়ে থাকে।

অথবা, মুসলমানদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো সেই একই স্বাভাবিক লালিত্যে পূর্ণ ভারতীয় রূপ। কখনও শাড়ী, কখনও বা খাটো তুর্কী জামা পরিহিতা, কিন্তু সর্বদাই সেই কোমল ও সুন্দর পত্নীত্ব এবং মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। স্বদেশবাসী যে কোন হিন্দু নারীব মতোই তাঁরা সকল কাজে প্রচলিত রীতি (fashion) অপেক্ষা ধর্মীয় অনুশাসনের মানদণ্ডে নিজের বিচার করে থাকেন।

এই বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত মহৎ কীর্তিরও ন্যূনতা নেই। রাজপুত উপাখ্যান যে সহস্র সহস্র বীরাঙ্গনার কাহিনী বর্ণনা করে, ব্রীনহিল্ড (Brynhild) স্বয়ং তাদের অপেক্ষা অধিক বীরাঙ্গনা ছিলেন না, অধিকন্তু সিগার্ডের (Sigurd) মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নি-প্রজ্বলিত সিংহাসনে তাঁর অলৌকিক মৃত্যু বরণ—জীবনের এই চরমতম ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু নম্র সাধারণ বাঙ্গালী নারী তাঁর সমকক্ষ। চাঁদবিবি, অথবা সেই অপূর্ব ঝান্সীর রাণী—যিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা জোয়ান অব আর্ক অধিক দেশপ্রেমিক ছিলেন না। রাণীর পিতা ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে সন্ধি করেন যে, তিনি তাদের হাতে দুর্গের চাবি অর্পণ করবেন।

ঐ অপরাধে রাণীর আদেশে শহরের উচ্চ প্রাচীরের উপর ফাঁসী-কাঠে প্রাণদণ্ডের পর তাঁব মৃতদেহটি সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যে সব ব্যক্তি ঐ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা অদ্যাপি ঐ বিষয়ে গল্প করে থাকেন। সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে অবস্থিত সেই রাণী কেমন করে শত্রুসৈন্য বিদ্ধ করবার জন্য উদ্যত বর্শা হস্তে তন্দ্রালু মধ্যাহ্নে ইংরেজ শিবিরের সম্মুখ দিয়ে ক্ষিপ্রবেগে ধাবিত হয়েছিলেন, কেমন কবে লক্ষ্মী নামে তাঁর পিঙ্গলবর্ণা ঘোটকী সমস্ত মাংসপেশী প্রসারিত করে ছুটেছিল—এ সব কাহিনীও তাঁরা বর্ণনা করে থাকেন। আক্রমণের তীব্রতা এত অপ্রত্যাশিত ছিল যে ইতস্ততঃ দু-একজন বিহ্বল শ্বেতাঙ্গ সৈনিক কেবল অতিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর প্রতি গুলি ছুঁড়বাব মতো উপস্থিত বুদ্ধি সংগ্রহ করতে পেরেছিল। বৃদ্ধেরা এখনও সজল নয়নে রুদ্ধস্বরে তাঁব কীর্তি গান কবেন।

কিন্তু ঝান্সীর রাণী সম্রাজ্ঞী হলেও পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়, স্বদেশেব প্রতি তীব্র অনুবাগসম্পন্ন এবং বালিকা বয়স থেকে শিকাবে অভ্যস্ত। বিবাহের পর তিনিই রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হোয়ে দাঁড়ালেন, কারণ তাঁর সুদর্শন স্বামী ছিলেন নামেমাত্র রাজা, রাজ্য বা স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ অর্পণ না করে অসার কবিতা লিখে সময় কাটাতেন। বস্তুতঃ রাণীর জীবন ছিল মধ্যযুগেব সন্ন্যাসীব মতো নিঃসঙ্গ। তাঁর যুদ্ধ করবার লোক দেখানো কারণ ছিল রাজ্যের উত্তরাধিকাররূপে দত্তক-পুত্র গ্রহণের অধিকার লাভ। প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রের রমণীগণের মধ্যে সর্বদাই রাজনীতিক কর্ম-কুশলতাব বিশেষ বিকাশ ঘটেছে—যা বর্তমান যুগেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ঝান্সীর রাণীর সময়ের বহুপূর্বে শিবাজী তাঁর পিতা অপেক্ষা মাতার নিকটেই অনুপ্রেরণা লাভ করেন, যার ফলে জাতীয় নবজাগরণের উদ্ভব।

যদি প্রেমের জগতে নারীর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই, তাহলে যে সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তাজমহল, তাঁর কথা উল্লেখ করাই কি যথেষ্ট নয়? মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুব নিকটেও মৃতের এই প্রাসাদ পবিত্র, কারণ উভয়ের নিকটেই ঐ প্রাসাদ নীরব বাগ্মিতার সঙ্গে আদর্শ পত্নীর কাহিনী প্রচার করে। এই প্রসঙ্গে 'প্রাসাদের মুকুট' (Crown of the palace) নামে খ্যাত রাণী আর্জমান্দ বানু (Arjmand Banu) সম্পর্কে অসঙ্গত হোলেও আমরা যত খুসী কল্পনা করতে পারি, যদিও দুটি জিনিস আমরা বিস্মৃত হোতে পারি না। একটি হোল, এক নারীর কোমল ভাবরাশি—যে.নাবী (রাণী আর্জমান্দ বানু) স্বামীর প্রেমের যোগ্য নিজের জন্য একটি সমাধি মন্দিরের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন এবং ঐ বিষয় স্বামীকে জানাবার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাও উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অপরটি হোল, সাজাহানেব মৃত্যুর চিত্র—নদীর বাঁকে অবস্থিত তুষার-শুভ্র উচ্চ সৌধের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি এবং প্রেমের পাত্রীর জন্য বিশ বৎসর ধরে নির্মিত .সৌধটি অবশেষে তাঁর (প্রিয়তমা) দ্বারা গৃহীত হয়েছে এই চিন্তায় পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অস্তরবিরাগে আলোকিত অলিন্দে সাজাহানের মৃত্যুর চিত্র! 'এমন কি আমিও, আমিও বিয়াত্রিচ'—বিয়াত্রিচের এই শেষকথাগুলি অপেক্ষা মোগল সম্রাটের মৃত্যুর দৃশ্যটি প্রেমের উজ্জ্বলতর ছবি।

তথাপি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সাধারণতঃ এশিয়ার রমণীর নিকট সমাজ তার নিজস্ব পরিবেশে সৌন্দর্য ও রমণীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে না। মুশার ধাত্রী-জননী, যীশুমাতা, পয়গম্বরের পত্নী খাদিজা ও তাঁর কন্যা ফতিমা মুসলমান রমণীগণের আদর্শ দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে ক্ষমতা এবং প্রেম অপেক্ষা জ্ঞান, সেবা ও ত্যাগই হিন্দুনারীর যথার্থ কীর্তি। প্রেম সম্বন্ধীয় হিন্দুর গীতি-কাব্যগুলি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গোপিকা শ্রীরাধা কর্তৃক

গীত। কিরূপে প্রত্যেক প্রেমিকের প্রেরণা অন্যের ভাবের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় এবং এই নীতির কোনরূপ বিচ্যুতি মুহূর্তমধ্যে ভারতীয় রুচির নিকট কিরূপ বিরক্তিকর বলে বোধ হয় তা লক্ষ্য করবার বিষয়। এমন কি, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পারস্য দেশীয় কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিগণ বলেন, ঐ কাব্য কেমন অপূর্বভাবে 'সে' শব্দটির পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ (he and she) উভয় রূপই বর্জন করেছে। 'আমি তার, তুমি সুর! তুমি দেহ, আমি প্রাণ! আমাদের সম্পর্কে কেউ যেন না বলে আমি একজন, তুমি আর একজন'—এ কি দুই প্রেমিকের অথবা এক আত্মার পরিপূর্ণ বাণী ?

এই ধারণার মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু সত্য আছে যে, কোন সামরিক (Military) রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথার একটা ঝোঁক সমাজে দেখা যায়। অভিজাত সমাজের অবরোধ প্রথার কঠোরতায় মুসলমান রমণীর স্থান প্রথম, রাজপুত রমণীর দ্বিতীয় এবং বাঙ্গালী নারীর স্থান তৃতীয়—এর দ্বারাই ঐ সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঝান্সীর রাণীর উদাহরণই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ঐ প্রথা কোনক্রমেই সর্বজনীন বলা চলে না—যা সাধারণতঃ প্রচলিত। গৃহকর্ম ও জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে সকল দেশেই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে; মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণের মধ্যে অনেক সহজেই পর্দার বিলোপ ঘটে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে অসংখ্য কারণ বিদ্যমান থাকায় পর্দাপ্রথার তীব্রতা কখন হ্রাস পায়নি, পক্ষান্তরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে মুসলমান শাসন স্বল্পকালস্থায়ী এবং মুস্লিম আদবকায়দার প্রভাব উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে পর্দাপ্রথার অস্তিত্বই নেই।

অবশ্য এর দ্বারা বোঝায় না যে, হিন্দুনারী তাঁর পাশ্চাত্য ভগিনীদের ন্যায় অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ও অবাধে মেলামেশা করে থাকেন। রামায়ণের অতি প্রাচীন সংস্করণে

দেখা যায়, দেবর (লক্ষ্মণ) সেই নায়িকার (সীতা) চরণযুগলের ঊর্ধ্বে কোনদিন দৃষ্টিপাত করেননি এবং পত্নী স্বামীর নাম উল্লেখের পরিবর্তে লজ্জায় আরক্তিম হতেন। সকল সমাজেই যে কোন ব্যক্তির আপাত অবাধ সামাজিক মেলামেশার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার ক্ষমতা সকল সম্প্রদায়েই থাকা প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্য সমাজে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। কেবল আত্মসংযমী ব্যক্তিই স্বাধীনতা লাভের অধিকারী। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যেও কোন বিশ্বস্ত পত্নীর পক্ষে স্বামীকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হবার অল্পই অবকাশ থাকে, কারণ উভয় সমাজেই অহেতুক সন্দেহ এক ধরনের দুর্বলতা ও অপমান বলে বিবেচিত হয়।

সব ত্রুটি সত্ত্বেও বোম্বাই এবং মাদ্রাজের নারীগণের স্বাধীনতা বাস্তব সত্য। প্রকৃতপক্ষে মালাবার প্রদেশের কয়েকটি অংশে স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বই সমধিক। যখন ভারতবর্ষে যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ্য ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীর উদ্ভব হবে, তখন যে দেশে নারীগণ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং নৃপতিগণ তাঁদের ভগ্নীদের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন—সেই অদ্ভুত দেশের বহু তথ্য বিশ্বের দরবারে উদ্ঘাটিত হবে। সাধারণভাবে বলা হয় এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হোল বহুভর্তৃকত্ব (একই নারী কর্তৃক এককালে একাধিক পতি গ্রহণ)। কিন্তু যে অর্থে তিব্বত এবং হিমালয়ের কতকগুলি পার্বত্যজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত সে অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয় কারণ কোন নারীই এক সময়ে নিজেকে দুজন পুরুষের পত্নী বলে মনে করে না। বরং মাতৃশাসিত শব্দটি সমধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ স্বামী স্ত্রীর নিজ গৃহে গমন করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মাতার সম্পর্কসূত্রে উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট হয়। অতএব ভারত দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র সমপদ্ধতিতে সমভাবে নারীনিগ্রহের দেশ হওয়া দূরে থাকুক বরং নারীজাগরণের সকল

ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাস্তবপক্ষে নারীব অধিকার ও সামাজিক স্থান সম্বন্ধে এমন কোন মতবাদ নেই যার দৃষ্টান্ত ভারতেব সীমানার মধ্যে কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে।

শাসক শ্রেণীর নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এই প্রথাব উৎপত্তি—হিন্দুনারীব অববোধ সম্বন্ধে এই বিবৃতিটি অবিবেচনা প্রসূত এবং অসত্য। এই প্রথার বর্তমান তীব্রতা নিঃসন্দেহে মুসলমান শাসনের সময় থেকে চলে আসছে। যে সব স্থানে মুসলমান শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেই সব স্থানে অববোধ প্রথা হিন্দু সংস্কারেব গভীবে প্রবেশ কবে; আবার বিপরীত পরিবেশযুক্ত বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে এই প্রথা প্রায় উপেক্ষিত। কালিদাসেব নাটকে এবং সাধাবণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভূবি ভূরি প্রমাণ আছে যে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগে এই প্রথা বর্তমান আকারে অনুসৃত হয়নি।

যদিও গজনী বা ঘোবের (মোহাম্মদ ঘোরী) কাল থেকে এই প্রথার উৎপত্তি তথাপি রাজকীয় মর্যাদা ও আদবকায়দার প্রভাব ব্যতীত অন্য কোন কাবণে নারীগণেব অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করেছিল এরূপ কোন নিদর্শন নেই; অবশ্য যেখানে রাজপুত জাতি স্বয়ং পর্দাপ্রথার প্রবতন করেন সেগুলি ব্যতিক্রম। বস্তুতঃ পূর্বেই হোক বা পবেই হোক আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হবে; মুসলমানগণ কর্তৃক তাঁদের নারীজাতিকে অবরুদ্ধ করার কারণ কী? ইসলাম ধর্ম তার সামাজিক বিধিগুলির ধর্মীয় অনুমোদন গ্রহণ কবেছে আরব দেশ থেকে। শোনা যায়, আরব রমণীগণ যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা উপভোগ করতেন। অতএব সময় সময় দাবী করা হোয়ে থাকে যে, মুসলমান সম্প্রদায় স্বয়ং এই প্রথা পারস্য, চীন অথবা গ্রীস থেকে গ্রহণ করেছে। এই জাতীয় ব্যাখ্যা পাল্টা অভিযোগ ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রাচ্যের কোন কোন অংশে যে সব প্রথা

সহজাত" বলে প্রতীয়মান হয় তাদের মূল উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কি অনুমান করতে পারি? জলবায়ু ও পরিচ্ছদের স্বল্পতা একমাত্র কারণ হোতে পারে না, কারণ তাহলে বাংলা দেশ অপেক্ষা মাদ্রাজে এই প্রথা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হোত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বিপরীতই দেখা যায়।

আমরা কি প্রশ্নটি ঘুরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে পারি না? প্রথমেই যে চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় তা হোল য়ুরোপে নিজের দেশেই ঐ মতবাদের অত্যন্ত অসম বণ্টন। টিউটনিক (Teutonic) দেশগুলির মতো ল্যাটিন (Latin) দেশগুলিতে এই মতবাদ তত শক্তিশালী নয়, এবং নরওয়েবাসীব কাহিনীর মধ্যে যত স্পষ্টভাবে রূপায়িত, জার্মানদের মধ্যে তত নয়। এই ঘটনা নারীপুরুষের সমানাধিকারের উৎস হোল ধীবর-জীবন—আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ সমর্থন করে। কারণ জীবিকার প্রয়োজনে সমুদ্র অভিযানে যাত্রাকালে পুরুষদের ক্ষেতখামারের যাবতীয় কর্তৃত্ব পত্নীদের উপরেই অর্পণ করতে হোত। অনেকে মনে করেন, বাহিরে সর্ব বিষয়ে স্বামীর কর্তৃত্বের ন্যায় গৃহের ভিতরে পত্নীকে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ কবা থেকেই বিবাহকালে পত্নীকে স্বামীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদানরূপ প্রথাব উৎপত্তি। অবশ্য এ কথা স্পষ্ট যে জল এবং স্থলই একমাত্র সম্ভাব্য পরস্পর বিরোধী ঘটনা নয়—যেখানে কোন জাতিকে নিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে কষ্টকব সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, সেখানেই স্ত্রীপুরুষ উভয়েব মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা, আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য এবং সমানাধিকারের প্রবণতা দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ে সমভাবাপন্ন হোলে—জীবনযাত্রা যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, উদ্বেগ অনেকাংশে তিরোহিত, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেব বিপরীত মুখী কর্মধারার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যায়; ঐ সঙ্গে আসে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ শক্তির নিকট নারীর

পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নারী তখন নীতি ও আবেগের ক্ষেত্রেই তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশের চেষ্টা করে।

বিভিন্ন কর্মের প্রতি ঝোঁক এশিয়াতে জলবায়ুর প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হয়েছে যার ফলে নিস্তব্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তা শ্রেষ্ঠ বিলাস হোয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থা আবাব সামরিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে অববোধ প্রথাকে বিশেষ করে রাজ পরিবারের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে ; এবং একবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পব প্রথাটি দ্রুত অন্যান্য স্থানেও বিস্তার লাভ করে। এইরূপে ঐ প্রথা বিজেতা জাতির বৈশিষ্ট্য হোয়ে দাঁড়ায় এবং হিন্দু জাতির মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উদ্যমের সঙ্গে উহা অনুকরণ করে এসেছে—যে বাংলাদেশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল যে সর্বাপেক্ষা আদর্শবাদী তা নয়, জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্বের জন্য রাজপুতানার পরেই স্থায়ীভাবে সামন্ততান্ত্রিক।

এই মতবাদ যদি যথার্থ হয়, তবে প্রথম আর্যযুগে ভারতীয় নারীর স্বাধীনতা ভূমি এবং অরণ্যেব সঙ্গে সংগ্রামের পরিণাম বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। হিমালয় অতিক্রম কবে মধ্য এশিয়া থেকে প্রথম যুগে যে সব কৃষিপ্রধান জাতি ভারতে আগমন করে, তাদের প্রকৃতিব সঙ্গে তীব্র সংগ্রামের সম্মুখীন হোতে হয়েছিল। এই সংগ্রামে পত্নীই ছিল স্বামীর সাহায্যকারিণী। পুরুষ যদি বাসস্থানের জন্য জঙ্গল পরিষ্কাব এবং জীবিকার জন্য পশু শিকার কবে থাকে, নারীকে সাহায্য করতে হয়েছে ক্ষেত এবং বাগানে। আর্যগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং বহু সময় নারীকেই পুরুষের স্থান গ্রহণ করতে হয়েছে। বহুবিধ বিপর্যয় ঘটেছে। মুহূর্তমধ্যে নারীকে যে কোন সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হোতে হয়েছে--সাহস, আনন্দ ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে। এরূপ জীবনযাত্রায় নারীর পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করা অবশ্যম্ভাবী।

দেশ পরিষ্কৃত ও আর্যজাতির মান অনুযায়ী কৃষিকার্য সুপ্রতিষ্ঠিত হোলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল, এবং মানসিক ও আত্মিক কৃষ্টির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উচ্চতর সমস্যায় জাতির উদ্যম একাগ্র হোল। পরিণামে নারীগণের অবরোধ ব্যতীত ভারতীয় দর্শন এত সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। জুডাদের সমাজের মতো যেখানে প্রেম ও সৌন্দর্য জীবনের সার্থকতায় ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ, সেখানে 'জগৎ স্বপ্নবৎ ঃ ঈশ্বরই একমাত্র সত্য'—এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কদাচিৎ সম্ভব। ভাবত যে প্রেম, সৌন্দর্য প্রভৃতি সুখের উপকরণগুলিকে নিন্দা করেছে তা নয় ; কিন্তু তার দৃষ্টিতে ঐগুলি ঐহিক সুখমাত্র, আধ্যাত্মিক নয়। ভারতের নারীর কাছে 'পত্নীর ধর্ম স্বামীসেবা এবং বিধবার ধর্ম ঈশ্বব উপাসনা' ; এবং তাদেব মনে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয়ের মধ্যে বিধবার আদর্শই উচ্চতর।

স্ত্রীলোকগণের অববোধ প্রথাটি যেন একটি অবধারিত সত্য এইভাবে যখন আমরা আলোচনা কবি, তখন যাতে আমরা কোন ভুল ধারণার বশবর্তী না হই সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। ভারতীয় সমাজে ও পথেঘাটে আমরা কেবল পুরুষদের দেখতে পাই—এ কথা বাস্তব সত্য। তার ফলে যে কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে 'মা' বলে সম্বোধন করতে পারেন এরূপ নারী ব্যতীত অন্য কোন নারীর মুখ অবলোকন না করে জীবন যাপন সম্ভব। গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে একমাত্র স্ত্রীলোকগণকেই দেখতে পাওয়া যায়। যদি আমরা দিনের পর দিন অন্তঃপুরে অতিবাহিত করি, তা হোলে দেখতে পাব, প্রত্যেক নারীরই পরিবারস্থ এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা আছে। দেবর ও ভ্রাতৃবধূগণের সম্পর্ক আনন্দপূর্ণ ও মধুর। ননদের পুত্রগণ অপেক্ষা আর কোন বালকবালিকা কদাচিৎ নারীর অধিক ঘনিষ্ঠ হয়। তাদের বয়স যাই হোক ঐ নারীকে তাদের চিরকালের কেনাদাসী মনে

করা এক গৌরবজনক অধিকার। শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার একটি সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান। জ্ঞাতি ভ্রাতাভগ্নীদের আপন ভ্রাতাভগ্নীর মতোই মনে করা হয়। প্রত্যেক নারীর কোন না কোন পরিবারে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, লণ্ডনের শহরতলী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শহরে যে সকল নারী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন অথবা কোন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন ঐ ধরনের সহস্র নারী অপেক্ষা প্রায় প্রত্যেক হিন্দুনারীর জীবনে পুরুষের সঙ্গে অনেক বেশী সুস্থ ও মানবিক মেলামেশা আছে।

এই মেলামেশা সুরুচি ও সূক্ষ্ম কৌতুকবোধে পরিপূর্ণ। য়ুরোপ প্রত্যাগত ভারতীয় পুরুষগণ সর্বদাই বলে থাকেন যে, অন্তঃপুর-চারিণী রমণীগণ সঙ্গে সঙ্গে মুখের মতো সরস উত্তর দেবার ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচ্যবাসীর কাণে ইংরেজি রসিকতা একটু বেশী শব্দপূর্ণ বলে মনে হয়। 'অচল পেনি সব সময় ফিরে আসে (the bad penny that always turns up)' এই ইংরেজি প্রবাদবাক্যের বাংলা ভাষান্তর 'আমিই সেই ভাঙ্গা কড়ি যে সাত বাজার ঘুরেছে (I am the broken cowrie that has been to seven markets)'—কী চমৎকার ! এর অর্থ 'আমি অপদার্থ হোতে পারি কিন্তু তা আমার জানা আছে।'

যে আদর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি তার সত্তা নিরূপণ করতে আমরা ব্যগ্র হই, কিন্তু যে সব আদর্শ জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিলেমিশে এক হোয়ে অবশেষে প্রথারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের কথা কদাচিৎ চিন্তা করি। যে সব প্রচলিত প্রথা হিন্দুনারীর জীবনে প্রাধান্য লাভ করেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আত্মনিয়ন্ত্রণের এক অতীব কঠিন অনুশাসনের সম্মুখীন হোতে হবে। পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্টতা ও আন্তরিকতা এবং অন্যান্য বহুবিধ স্বার্থ বিবেচনা করে এবং গৃহের শান্তি অক্ষুণ্ণ

রাখবার জন্য নিঃসন্দেহে কঠোর শৃঙ্খলা অপরিহার্য। সেজন্যই স্বামী স্ত্রী অপরের উপস্থিতিতে পরস্পরকে সম্ভাষণ করে না। স্ত্রী স্বামীর নাম উল্লেখ করে না, প্রশংসা তো করবেই না ইত্যাদি নানা নিয়ম আছে। কেবল ছোট শিশুগণ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। যখন যেখানে খুশী তাদের ভালবাসা অর্পণ করতে পারে। এ সব ব্যবস্থাই সমাজকে রক্ষার জন্য, নতুবা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাহির করার ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা ঐ সম্পর্কের অপ্রত্যাশিত বা অভাবিত ব্যগ্রতা সমাজকে উৎপীড়িত করে।

এই যে সর্বদা আনন্দের সঙ্গে অপরের অধীনতা স্বীকার, তা এমন সম্পূর্ণভাবে ঘটে যে বাহিরের কোন পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ে না। এমন নয় যে, বিশেষভাবে উন্নত কোন ব্যক্তির এটি বৈশিষ্ট্য কেন না সমগ্র সমাজ কর্তৃক জীবনের সর্বস্তরে এই প্রথা স্বীকৃত ও দাবী করা হোয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিব নিকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রীতিনীতির পটভূমিকায় নিঃস্বার্থপরতা ও সেবার আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষরূপ নেয় এবং পরদুঃখকাতরতার আগ্রহ ও উদ্যম প্রকাশ কবে যার অভাবে জগৎ নিশ্চিতই দীনতর হোত। কিন্তু প্রাচ্যনারীর নিকট প্রচলিত রীতিনীতির লঙ্ঘন অজ্ঞাত। প্রাচ্য নারী নৈতিক (ethical) সভ্যতার অনিবার্য পরিণাম। বদান্যতা তাঁব কাছে দাবী কবা হয়। তাঁর ব্রত এবং কৃচ্ছ্রসাধন স্বামীব নিকটও অজানা থাকে এবং জানলেও যে সমাজে সকলেই অনুরূপভাবে ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন, ঐ সম্বন্ধে কদাচিৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আমরা কেবল বলতে চাই, যে কোন পাশ্চাত্যবাসী অপেক্ষা ভারতীয় নারীর আত্মবিলোপ গভীরতর এবং পরার্থপরতা তীব্রতর। পীড়িতকে শুশ্রূষা করা তাঁর নিকট এতই স্বাভাবিক যে, এটা কোন বিশেষ কাজ বলে তিনি কদাপি চিন্তা করেন না—যার জন্য অন্যত্র হাসপাতাল গড়ে তোলা অথবা সেবা বিষয়ে (নার্সিং) শিক্ষালাভ

আবশ্যক বলে বোধ হয়। সন্দেহ নেই, শুশ্রূষা সম্পর্কীয় অনেক কিছু তিনি করতে পারেন না কারণ আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার সঙ্গে এমন সব পদ্ধতি বা প্রণালীর উপর মনঃসংযোগ করা হয় যার দ্বারা বহু যন্ত্রণার লাঘব হয়। তথাপি আমরা যেন সহজেই ধরে না নিই যে, ক্ষুধার্ত, পীড়িত এবং বিকৃত মস্তিষ্কদের দলগতভাবে এক ভিন্ন জগতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা—যে জগতে কেবল অনুরূপ ব্যক্তিদেরই প্রবেশাধিকাব থাকে—আমাদের এই যে অভ্যাস তার মধ্যে কোন উচ্চতর পবার্থপরতা নিহিত আছে।

জগতের সর্বত্র নারীই মানবজাতির নৈতিক আদর্শের রক্ষয়িত্রী। শ্মশানে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে কোন বালকেরই আগ্রহ হোত না যদি না তার মাতা ঐ কাজটি যে প্রশংসাজনক এই ভাবটি তার মধ্যে শৈশবেই সঞ্চার করে দিত। স্ত্রী যদি স্বামীর সর্বপ্রকার সদ্‌গুণাবলীব উপলব্ধি ও মহত্ত্ব অনুধাবন না করতেন তবে স্বামী যথাসময়ে আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ হতেন না। কিন্তু এ ছাড়াও নারীজাতি আদর্শের চিরন্তন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'যিনি তোমাদের মধ্যে প্রধান হবেন তিনি আগে তোমাদের সেবক হোন' —এই প্রচলিত উক্তি পাশ্চাত্য কর্ণে আপাতবিচারে স্ববিরোধী অথচ কতকাংশে সত্য বলে ধ্বনিত এবং কতকটা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু সেই মহান্ প্রবক্তা যে অনাড়ম্বর প্রাচ্য জগতে তিনি বিচরণ করেছিলেন সেই জগতেরই স্বতঃসিদ্ধ সত্য কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর শ্রোতৃবর্গের মনে তিনি কোন বিস্ময় উৎপাদন করেননি, কারণ তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই তাঁব জননী পরিবারের মধ্যে প্রধান অথচ সকলের পরিচর্যায় নিরত।

প্রাচ্য দেশকে যাঁরা জেনেছেন ও তার সাতপ্রকার শাবীরিক পরিচর্যার তালিকা পাঠ করেন তাঁরা ইতিমধ্যে নিজেকে হিন্দুগৃহের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে কল্পনা করেন এবং দেখতে পান, কেমন করে কঠোর পরিশ্রমী ও ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোকগণ

ক্ষুধার্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান প্রভৃতি কর্তব্যের সর্ব-প্রথম আবেদন উপেক্ষা না করে দৈনন্দিন গৃহকাজগুলি করে চলেছেন। সত্য সত্যই প্রাচ্যদেশ সকল ধর্মের চিরন্তন জননী, কারণ যে সকল কর্তব্য পাশ্চাত্য সরকারী বলে মনে করে অথবা গীর্জার অনুশাসন বলে গ্রহণ করে, প্রা:চ্য রমণী সেগুলি সাধারণ সামাজিক কর্তব্য বলে নিজস্ব করেছেন। এই ভাবটি যাঁরা গভীর-ভাবে অনুধাবন কবেছেন তাঁদের নিকট য়ূরোপের খৃষ্ট ধর্ম এশিয়া মহাদেশীয় জীবনোদ্দেশ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র মহত্তর অথবা হীনতর প্রতীয়মান হবে না।

প্রাচ্য নারীর বর্তমান সমস্যা

গ্রীসদেশীয় জলপাত্রের উপর অঙ্কিত চিত্রগুলি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা ঐ চিত্রগুলির মধ্যে একটি দৃশ্যের বহুল পুনরুক্তিতে আশ্চর্য না হোয়ে পারেন না—সেটি হোল ইঁদারা থেকে জল আনার জন্য সার বেঁধে স্ত্রীলোকদের যাতায়াত। প্রাচীন গ্রীস, প্যালেস্টাইন এবং ভারতের গৃহে ও রাজপথে জলের কল প্রচলিত হওয়ার পূর্ব যুগে অর্থাৎ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে কুয়াতলা থেকে জনগণের পানীয় জল সরবরাহ হোত তা ছিল নারীদের সামাজিক মেলা-মেশার একটি প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রস্বরূপ। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবারের কুমারী ও বধূগণ হয়তো কোনও বয়স্কা মাসি, পিসি বা শ্বশ্রূমাতার তত্ত্বাবধানে অথবা পরস্পরের সহচরীরূপে জল আনবার জন্য ঝকঝকে ধাতব পাত্র নিয়ে কুয়াতলায় আগমন করত। তারপর পরস্পরের কথাবার্তা এবং কাজ সমাধা করে তরুণীগণ মাথার উপর দু-তিনটি জলপাত্র পর পর রেখে গর্বের সঙ্গে আন্দোলিত পদক্ষেপে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। কখন কখন নৈপুণ্য দেখাবার জন্য পথ দিয়ে যাবার সময় তারা দৌড়াত, লাফাত, এমনকি নৃত্যও করত এবং একবিন্দু জলও পাত্র থেকে উপছে পড়ত না। সময়টিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হোত। পুরুষরা ঐ পথ এড়িয়ে চলতেন এবং তার দ্বারা প্রমাণিত হোত যে, মেয়েদের সাজসজ্জা পুরুষের চোখ ঝলসাবার উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য। রূপার জমকাল নূপুর, মস্তকে জলপাত্র রাখার জন্য মুক্তাখচিত বিড়া—গ্রীসদেশীয় পাথরের মূর্তিতে যেমন দেখা যায় ঢিলেঢালা শাড়ী—এসব সৌন্দর্যই ভগিনীর ন্যায় অন্যান্য কুমারীগণের সহানুভূতি অথবা ঈর্ষার উদ্রেকের জন্য। তারা এমন লোকের আনন্দের জন্য সাজত না যারা নিজের স্ত্রী এবং ভগিনীকে সুন্দর দেখত কিন্তু তারা কী অলঙ্কার বা পরিচ্ছদ পরিধান করে তা খেয়াল করার মতো গুরুত্ব দিত না।

প্যারিসে মহিলারা যে অসার দম্ভের সঙ্গে গাউন পছন্দ কবেন তার চেয়ে কম গর্ব নিয়ে এই মহিলারা গৌরবর্ণের উপর গাঢ় নীল শাড়ী পরিধান করেন না যাতে ঐরূপ বসন পরিহিতাকে মধ্যরাত্রের পূর্ণচন্দ্রের মতো দেখায়। অথবা নাকে একটি হীরা বা অপেল, বাদামী গাত্রবর্ণ অনুযায়ী সাদা অথবা সবুজ কাঁচের চুড়ি পছন্দ কবেন না। আত্মশ্লাঘা কম না হোলেও এ সবের মধ্যে যে উচ্চস্তরের নৈপুণ্য থাকে সব সময়ে তা চারুকলায় তীক্ষ্ণ সমালোচক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নারীগণের জল আনার অনুরূপ আর একটি দৃশ্য আছে। স্থানীয় অশথবৃক্ষের নীচে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এমন কোনও পর্যটক সন্ন্যাসী গ্রামের সীমান্তে তাঁর ধুনি জ্বেলেছেন এবং তাঁব নিকট ধূমপান বা গল্প করবার জন্য সন্ধ্যাকালে সমাগত হয়েছেন পুরুষের দল। কিন্তু এই দৃশ্যটি আরও ব্যাপক ও বিশ্বজনীন সম্পর্কের সূচনা করে। পুরুষগণ সাধারণতঃ নিজেদের দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল অথচ অধুনা লুপ্ত অদ্ভুত প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলি কতকটা সাধারণ, অবাস্তব এবং নৈর্ব্যক্তিক। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রামের গেরুয়া পরিহিত অতিথিটি প্রাচীন যুগের পর্যটকের মতো। তিনি বেলগাড়িতে ভ্রমণ করেননি, হোটেলেও বাস করেননি। পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে যেখানে থেমেছেন, সেখানকার জীবন-নাটকে অংশ গ্রহণ কবেছেন। প্রতি-দিন দ্বারে দ্বারে আহার্য ভিক্ষা চেয়েছেন এবং এক একটি বিশেষ অঞ্চলের নিজস্ব রীতিতে প্রস্তুত ও পরিবেশিত স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করেছেন। সমসাময়িক যে সব ব্যক্তি কেবল মানচিত্রের উপর নির্ভরশীল এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী ও অপরের ভ্রমণ কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ করেন তাঁদের অপেক্ষা এই প্রাচীন যুগের পর্যটকের ভৌগলিক চেতনা অনেক বেশী উন্নত।

যে গ্রামে তিনি কয়েকদিনের জন্য আহার গ্রহণ কবেন এবং নিদ্রা যান· সেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে তিনি এই ভৌগলিক জ্ঞান আদান প্রদান করেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজিতে দেখা যায়, নৃপতিগণ অতিথিদের অভ্যর্থনার পর এই প্রশ্ন করতেন, 'আপনি অন্যত্র কী কী দেখেছেন,' এবং তাঁরা প্রস্থান করবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করতেন, 'এখানে আপনি কী কী লক্ষ্য করেছেন ?'

কূপের চারিধারে যে সব নারী সমবেত হতেন তাঁদের মধ্য দিয়ে গ্রাম বা ক্ষুদ্র নগরগুলির পৌরজীবন আত্মপ্রকাশ করত। এখানে তাঁরা স্থানীয় ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সুদৃঢ় স্ত্রীসুলভ মতামত গড়ে তুলতে এবং পরস্পবের মধ্যে প্রাত্যহিক খবরাখবর বিনিময় করতে পারতেন। বর্তমানে জনজীবনের সুবিধার জন্য উন্নততর সংগঠন প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই ধরনের কষ্টসাধ্য সাক্ষাৎকাবেব প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। কিন্তু প্রাচীন এই সকল রীতি ও অনুষ্ঠানের বিলুপ্তিব সঙ্গে সঙ্গে সমবেত হবার নূতন উপলক্ষ্য এবং আলোচনার নূতন বিষয়বস্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ভারতে ভাবপ্রবণতা গৃহের অভ্যন্তরেই অধিক প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত জীবনে নারী সর্বদাই কর্তৃত্বপরায়ণ এবং বাইরের সংগঠনগুলি থেকে বঞ্চিত হোলেও পুরুষদের কার্যক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নারী তাঁব ভালবাসার ভিতর দিয়েই সহযোগিতা করে থাকেন। সুতরাং ধনী ব্যক্তি যদি পৌরুষহীন এবং দবিদ্র যদি অপদার্থ হোয়ে ওঠেন তাহলেও য়ুরোপেব অবজ্ঞা পোষণ করার কোনও অধিকার নেই। ভারত এখনও পাশ্চাত্যের আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে (Ethos) গ্রহণ করতে পারেনি, তাব নৃপতিবৃন্দ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের জন্য কোনও অভিযান প্রেরণ করেননি, তার যুবকবৃন্দ পর্বত এবং নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বন্ধে জ্বলন্ত কৌতূহল নিয়ে বর্ধিত হয়নি ইত্যাদি কারণে য়ুরোপের ভারতকে বিদ্রূপ করারও কোন অধিকার নেই। যে সব বিষয়ের

দ্বারা লোকে (ভারতীয়) নিজেকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, য়ুরোপীয় সংগঠন ব্যবস্থা তার সবগুলিকেই ব্যর্থ করে দেয় ; অথচ যে দায়িত্বে তাদের মন ও চরিত্র নূতনভাবে যথেষ্ট কর্মক্ষেত্র ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে তেমন কোনও নূতন দায়িত্বে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃতকার্য হয়না।

এ কথা সুস্পষ্ট যদি সামাজিক ভারকেন্দ্রের কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যদি ভারতের বৌদ্ধিক পরিবেশকে নূতন আদর্শে সম্পৃক্ত হোতে হয় তবে তার নারী সমাজকে কেবল যে অভীপ্সিত বৈপ্লবিক ফলাফলের অংশ গ্রহণ করতে হবে তা নয়, বিপ্লব সংঘটনে তার প্রচুর অবদান থাকা চাই। কারণ কারখানা নয়, গৃহই জীবনকে অনুপ্রেবণায় পূর্ণ করে। বৃটিশ শাসিত ভারতের বিদ্যালয়গুলি কারখানা অথবা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নয় যেখানে বালকগণ ভবিষ্যৎ কেরানীগিরির উপযোগী লেখাপড়া আয়ত্ত করে, যেমন তারা অন্য যে কোনও শিল্প প্রণালী শিখতে পারত। আদমসুমারি গ্রহণ এবং তালিকা প্রস্তুতের যুগে মনে করা হয় আক্ষরিক জ্ঞান ব্যতীত কোনও শিক্ষা হয় না। যেন স্ট্র্যাণ্ড পত্রিকা (Strand Magazine) পাঠ কবা শেক্সপীয়ারের জননী হওয়া অপেক্ষা মহত্তর। এরূপ যুগে হিন্দু রমণীর বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কবা কঠিন। তথাপি যদি শিক্ষা বলতে অত্যন্ত জটিল কোনও জাতীয় জীবনধারায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা বোঝায় তাহলে তার কিছু শিক্ষা আছে ; কারণ একজন সাধারণ পত্নী একাধারে পাচিকা অথবা গোশালার কর্তৃত্ব থেকে শুরু কবে খাদ্য-বিভাগের প্রধানা এবং শতাধিক ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়িকা বা প্রশাসনিক নেত্রীরূপে কাজ কবতে পারেন। যদি শিক্ষা বলতে ভাষা, কাব্য এবং লোকসাহিত্যের জ্ঞান, তার সঙ্গে যুক্তি ও কল্পনাশক্তিব প্রকাশ বোঝায় তাহলে এই শিক্ষা তাঁর আছে—এমনকি সেই শিক্ষার সাহায্যে তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থ আবৃত্তি করতে ও বুঝতে পারেন।

অধিকন্তু, যে সকল স্ত্রীলোক লিখতে বা পড়তে অক্ষম তাঁরাও প্রাচীন সংস্কৃতির মর্ম গভীরভাবে এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। মায়াবাদের দর্শন অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের (Savant) নিকট বিভ্রান্তিকর হোলেও তাঁদের নিকট বিষয়টি কঠিন নয়। নির্বাণ শব্দটির সূক্ষ্মতম অর্থ তাঁরা বুঝতে পারেন। তাঁদের কাছে গুরুত্ব থাকলেও নিজেকে অস্বীকাবপূর্বক ক্রুশ হস্তে অনুসবণ করাই একমাত্র ধর্ম নয়, ব্যক্তিগত মুক্তিলাভে ত্যাগের মহান্ আদর্শের উপলব্ধি একটি বিশেষ সাধনা। এর সঙ্গে সামাজিক জীবনেব জন্মগত অভ্যাস যুক্ত করলে প্রতীয়মান হয় যে, পুবাতন প্রথার মধ্যে নারীগণ কেবল শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ নয়, জীবনের উদ্দেশ্যও খুঁজে পেয়েছেন।

একথা সত্য, যে মাটিতে জন্ম এই শিক্ষা তাবই উপযোগী এক প্রকার প্রস্তুতি এবং সুযোগ। এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি সমস্ত ভারতীয় সভ্যতাকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। সম্ভবতঃ জগতের অন্যান্য দেশের রুচিবোধ অপেক্ষা ভারতীয় মন গৃহের স্থাপত্য সংক্রান্ত ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অধিক পরিতৃপ্ত এবং বাহ্যিক খুঁটিনাটি সাজসজ্জার আকাঙ্ক্ষা থেকে অধিকতর মুক্ত ও এই ভাবে প্রাত্যহিক কর্তব্যের একটা খসড়া উদ্ভাবন কবেছে যেটি কেবল ঐ স্থানেরই বৈশিষ্ট্য। একজন সুযোগ্যা শ্বশ্রূমাতা ইংবেজ সামন্ত-তান্ত্রিক যুগেব খাস জমিদারীর কর্ত্রীর আসন অধিকার করে থাকেন। যদি খাস জমিদারীর গৃহস্থালী প্রায় অক্ষুণ্ণ অবস্থায় অন্য কোনও যুগে বা দেশে স্থানান্তরিত করা যেত তবে জাপান, তুর্কি, স্কাণ্ডেনেভিয়া এবং স্পেন তাব প্রকৃষ্ট উদাহরণ—কিন্তু ভাবতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এখানে স্বামীব সামন্ত-প্রজার পরিবর্তে তাঁর পুত্রবধূগণ কর্ত্রীর (শ্বশ্রূমাতার) চতুর্দিকে সমবেত হোত। এবং নিপুণ সুতোকাটা, সূক্ষ্ম সূচীশিল্প অপেক্ষা, তাঁর তত্ত্বাবধানে শিশুদের যত্ন, পশুদের পরিচর্যা, সকল প্রকার রন্ধন এবং গৃহস্থালীর

কার্যে তারা ব্যস্ত থাকত। জাতিভেদ প্রথা রাজা ও ভিক্ষুককে সমান মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং কি ধরনের কাজ অনুসৃত হবে তা আর্থনীতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত।

ভারতের পারিবাবিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সমর্থিত এবং সমর্থনযোগ্য মনে হোলেও, সেই সঙ্গে আমরা স্বীকার না করে পারি না যে এই মুহূর্তে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বড় রকম পরিবর্তন প্রয়োজন। বহুদিনেব অভ্যাসেব ফলে আমরা অরণ্যকে উপেক্ষা কবে বৃক্ষগুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকি, কিন্তু বৃক্ষের সংখ্যা যখন নিতান্ত নগণ্য হয় তখন অবশ্যই সমগ্রভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ কবে। বর্তমানে প্রত্যেকটি ভারতীয় নারী রন্ধনকার্যে সুদক্ষা। কিন্তু তিনি সূচীকর্ম জানেন না এবং মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার পর গল্প ও প্রার্থনায় অবসর কাল যাপন করেন। বর্তমান বংশধরদের প্রপিতামহীগণ আমাদের (পাশ্চাত্যের) পূর্বপুরুষের সমসাময়িক রমণীগণের ন্যায় সুতো কাটায় ব্যাপৃত থাকতেন। কিছু পরিমাণ শস্যের সঙ্গে কাটাসুতো তন্তুবায়েব নিকট নিয়ে যাওয়া একটা বিশেষ পারিবারিক আনন্দের বিষয় ছিল: সেই সুতো ও শস্যের বিনিময়ে তন্তুবায় কাপড় বুনে দিত। হায়! সূক্ষ্ম কর্মের দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করা আজ তাঁতির কাছে কঠিন। পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হোলেও বাজারে এখনও কিছু চাহিদা আছে। স্ত্রীলোকের নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ শাড়ী বহুদূরে অবস্থিত ম্যাঞ্চেস্টার অথবা গ্লাসগোতে যন্ত্রের সাহায্যে বয়ন করা হয়। সুতরাং এখানেও বর্তমান বিপ্লব তার ভাগ্যকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। সর্বত্রই ঐ জাতীয় ধ্বংসের আভাস অনুভূত। আরামের উচ্চতর মান ক্রমবর্ধমান। যে দিন গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেরা বালির উপর লিখতে শিখত সেদিন বহুকাল গত। এমনকি তালপাতার হাতে লেখা পুঁথি স্মৃতিতে পর্যবসিত। খাগের কলমের পরিবর্তে স্টীলের কলম, সস্তা কাগজ এবং লেখার তরল

কালি সর্বত্র প্রচলিত। সাবান[১] একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হোয়ে উঠছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন, এমনকি আহারের জন্যও য়ুরোপীয় বাসনপত্র প্রচলিত হচ্ছে। এক ধরনের আসবাবপত্র ক্রমেই পরিচিত হোয়ে উঠছে। কেরোসিন টিন এবং আধুনিক কাচ প্রত্যেকটি গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতবাসী নিজেরাই এইসব জিনিস সংগ্রহ করতে শিখছে বা এগুলির ব্যবহারে তাদের দক্ষতা লাভ হয়েছে; অথবা পাশ্চাত্য ধরনকে ভারতীয় রুচি এবং বুদ্ধি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে প্রাচীন জাতিগত শিল্পের সাহায্যে ঐ গুলি উৎপন্ন করছে। এর অর্থ এই যে ইতিমধ্যেই তারা য়ুরোপীয় ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল পরগাছায় পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ এবং মারাত্মকভাবে পেটেন্ট ও কপিরাইট আইনের অনুগত জনসাধারণ সুবিধাজনক যে কোন দ্রব্যকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে; গ্রাম্য কারিগরদের দ্বার থেকে ফিরিয়ে দেয়। প্রাচীন ধরনের বাসনপত্র যে রকমই হোক, আর ব্যবহার করে না এবং নূতন সংগৃহীত জিনিস যা স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত নূতনত্বহীন ও কুশ্রী, লোকের রুচি এবং জীবনের মানদণ্ডকে বিকৃত করলেও আপত্তি করে না। পিতলের দ্রব্য প্রস্তুতকারীরা নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে যে য়ুরোপ থেকে আনীত পিতলের চাদর সব থেকে সস্তা এবং গৃহবধূগণ বৃথাই দুঃখ করেন যে তাঁদের রন্ধনের সুন্দর পিতলের বাসনপত্র আর পুরুষানুক্রমে অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য হবার যোগ্য নয়, যেমনটি তাঁদের পিতামহীদের আমলে ছিল।

---

১ যদি মনে করা হয় ভারতবর্ষ কোন দিন অপরিচ্ছন্ন দেশ ছিল, সেজন্য আমাকে বলতে হচ্ছে যে স্নানের জন্য এক ধরনের মাটি এবং তেলের ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। সম্ভবতঃ জগতে অন্য কোন জাতি গাত্রচর্মের পরিচ্ছন্নতার প্রতি এত মনোযোগ দেয়নি বা এ বিষয়ে এত সাফল্য লাভও করেনি। কিন্তু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত সাবান যা চর্মের উপর রাসায়নিক পরিবর্তন আনে নীতির দিক থেকে তা অনুমোদিত হয়নি।

এই সব ব্যাপারে য়ুরোপীয় দেশগুলি অপেক্ষা ভারত যে বেশী অসাবধান অথবা সহজে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তা নয়, ভারতবর্ষের ক্ষতিই সমধিক এবং সে প্রতিরোধে অক্ষম এইমাত্র। এই সকল সমস্যাগুলি জাতীয় ভিত্তিতে চিন্তা করতে এখনও সে শেখেনি।

গোঁড়ামির ফলে এই অবক্ষয়ের ধারা কতকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও বিত্তবান ব্যক্তির পক্ষে বন্ধুকে পরিধেয় হিসাবে বিলাতি সুতাব কোনও বস্ত্র প্রদান করা অমার্জিত ব্যবহার বলে পরিগণিত হোয়ে থাকে। ধর্মভাবসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সাবান, কেবোসিনতেল এবং মাদুরের পবিবর্তে চেয়ারের ব্যবহাব বক্রদৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এই প্রকারের বিরোধিতায় অতিমাত্রায় কুসংস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর দ্বাবা অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু রোধ কবা যায় না। এই প্রসঙ্গে তেমন শক্তিশালী গোঁড়ামির প্রয়োজন যা জোবেব সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারবে যে, ভাবতবাসী যা প্রস্তুত কবতে সক্ষম কেবল তাই তার ব্যবহার করা উচিত। বলা বাহুল্য মেয়েদের মধ্যেই এই অনুশাসন সমর্থন ও শক্তিলাভ করে, কারণ তাঁবাই বিধিবদ্ধ সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঐ সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করে ব্যবহার করেন। জাতীয় চেতনায় এই তত্ত্ব যদি একবার হৃদয়ঙ্গম হয় তাহলে বাজনীতিক বা বাণিজ্যিক স্তোকবাক্য এই নীতির বিরুদ্ধে কিছুমাত্র কার্যকরী হবে না। কিন্তু যদি জনগণ—নারীসমাজ, পুরোহিতকুল, পণ্ডিতগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকগণ এই ভাবাদর্শ বুঝতে এবং কার্যে পবিণত করতে সক্ষম হতেন তাহলে ইতিমধ্যেই সমস্ত সমস্যারই সমাধান হোয়ে যেত এবং যে বিপর্যয় থেকে ভারতকে রক্ষা করার প্রয়োজন হবে তার অস্তিত্বই থাকত না।

এ কথা স্পষ্ট ভারতীয় নারীর প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন, নূতন শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য নিম্নতর হওয়া উচিত

নয়। তাঁদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বিশিষ্ট উপাদান হবে জাতীয় আদর্শ, জাতীয় স্বার্থ ও স্বজাতি এবং স্বদেশের প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ যথার্থভাবে উপলব্ধি করা—কেবল লিখতে বা পড়তে শেখা হোতে পারে না যদিও নিঃসন্দেহে জনসাধারণেব মধ্যে সেটিই বেশী প্রচলিত হবে। প্রাচ্যের মতো য়ুরোপেও অভ্যাস এবং মতামত নূতনত্ব-বিহীন এবং কঠোর হোয়ে থাকলেও এখনও সেখানে কতক পরিমাণে নমনীয়তা আছে। কোন নির্দিষ্ট পবিবর্তন অপেক্ষা এই নমনীয়তাই প্রাচ্যের পক্ষে প্রয়োজন। এ হোল স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্বের একটি রূপ। এই সাংগঠনিক পবিবর্তনশীলতার জন্য য়ুরোপীয় সমাজগুলি সর্বজনস্বীকৃত এবং বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যসমূহ আয়ত্ত কবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিপূবক সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা রাখে। ভারতের কর্ম ক্ষমতা আছে, কিন্তু লক্ষ্যটি পরিচিত হওয়া আবশ্যক। মুহূর্তমধ্যে কয়েকজন ভাবতীয় নারী কোনরকম মেজাজ খাবাপ না কবে বা শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে কয়েকশত এমনকি কয়েক সহস্র অতিথিব জন্য রন্ধন কবতে একত্র হোতে পাবেন—যা হয়তো অনুরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্যনাবীগণ তাঁদেব রন্ধনশালাব জন্য করতে পারবেন না। কিন্তু যদি আমরা অতিথিদের 'বেকার' বলে অভিহিত করি এবং তাদেব 'সামাজিক সমস্যা' রূপে উল্লেখ কবি তবে প্রাচ্যদেশীয় লোক হতবুদ্ধি হোয়ে পড়ে, ঠিক যেমন আমরা (পাশ্চাত্য নারীরা) তাদের 'আগন্তুক' বলে উল্লেখ করলে হতবুদ্ধি হব। এটি স্পষ্ট যে কেবলমাত্র উদার জনজীবনের (public) ধাবণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জাতিদের এই ধরনের কাজ করার ধারাকে ভাবতবাসী গ্রহণ করতে পাবে।

যখন নারীগণ তাঁদের জন্মভূমির সঙ্গে এবং যে অতীতকাল থেকে তাঁরা উদ্ভূত হয়েছেন তার সঙ্গে যুক্ত হোয়ে যথাস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দেখবেন, যখন তাঁরা স্বজাতির প্রয়োজনের বিশালত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন, যখন তাঁদের মাতৃহৃদয় পরিবার, গ্রাম এবং

বাস্তুভিটার পরিবর্তে স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য স্পন্দিত হোতে শুরু করবে, যখন তাঁদের মন সেই মাতৃহৃদয়কে জানবার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হবে,—তখন—কেবল তখনি ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ তার প্রকৃত মহিমা নিয়ে জাতির নিকট আত্মপ্রকাশ করবে,—তখনি যোগ্য শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবে পরিণত হবে এবং তখনি উদ্‌ঘাটিত হবে প্রকৃত জাতীয় আদর্শ।

প্রাচীন ধারণাসমূহ থেকে সরাসরি উদ্ভূত হোলে তবেই এই জাতীয় পরিবর্তন সম্ভব। জাতীয়ভাব বাইরে থেকে আরোপ করা যায় না—ভিতর থেকেই এব বিকাশ হওয়া উচিত। জাতীয় ধর্ম-গুলির সঙ্গে এর পূর্ণ সঙ্গতি থাকা চাই। ইসলামধর্ম তার আধিপত্যের দিনে নিজেদের ভারতীয় ভূমিতে ভারতীয় বলে প্রতিষ্ঠিত করে আনন্দিত হয়েছিল। মোগল সম্রাটগণের স্থাপত্যবিষয়ক কীর্তি-গুলি অতীত ভাবতের প্রতি আবেগে পরিপূর্ণ, ইন্দো-সারাসেনীয় (Indo Saracenic) স্থাপত্য-ভঙ্গী মক্কা ও কন্‌স্তানতিনোপলের ন্যায় রাজপুতানার প্রতিও সমভাবে ঋণী। বিজেতা মুসলমান এবং বিজিত হিন্দুদের রুচি, নীতি ও চিন্তার ভঙ্গী এবং শিক্ষার মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ছিল না—কারণ উভয়েই ছিল এশিয়াবাসী। নবাগত সম্প্রদায় দেশেরই একজন সন্তানের মতো যেন স্বগৃহেই স্থায়ীভাবে বসবাস আবম্ভ করেছিল। তার সন্তানসন্ততি প্রথমে ভারতীয় এবং পরেই কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সভ্য। একদা যে শক্তির দ্বারা তাঁদের পূর্বপুরুষ আরব মরুভূমিকে মল্লভূমিতে পরিণত করেছিলেন—আজ ঐহিক প্রয়োজনের তাগিদে এবং নিজের দেশবাসী হিন্দুমুসলমান উভয়ের স্বার্থে সেই শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে তাব থেকে তাকে নিবৃত্ত করার কিছু নেই। হিন্দুদের পক্ষে বিষয়টি আরও স্পষ্ট। হিন্দুর অবতারগণ কেবল মানবজাতির কল্যাণের জন্যই জীবন ধারণ করেছেন। জাতীয় প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের আবির্ভাব। তাঁদের (অবতারগণের) পরেই

জনপ্রিয় নবজাগরণের এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্লাবন আসে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই দেশের দাবীকে প্রাধান্য দিতে দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। উভয় ধর্মেরই পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দেশেব জন্য জীবন বিসর্জন দেয় সে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ করে। দেশবাসীর প্রাথমিক কর্তব্য প্রসঙ্গে স্বার্থপ্রধান জগতে মাতৃভূমির পুনর্গঠনরূপ মহান্ ব্রতে ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে উভয় ধর্মই প্রস্তুত।

এইসব কারণে নূতন কবে গোঁড়ামিব অর্থ নির্ণয় করতে হবে এবং মূল প্রয়োজন কী তা আবিষ্কাব করা চাই। ইতিমধ্যেই এই পবিবর্তন আনবার জন্য বিপ্লব আরম্ভ হোয়ে গেছে। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি কবতে আরম্ভ করেছে যে, যদি দাবিদ্র্যকে জয় করতে হয়, যদি জাতীয় দক্ষতা অর্জন করতে হয়—তবে বেশীদিন অন্ধভাবে পরিবর্তনকে অস্বীকার কবে গর্ব অনুভব করা উচিত নয়। যে গোঁড়ামি জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, যে ভাবেই আমরা তাব ব্যাখ্যা করি না কেন, কেবল ভয় থেকে উদ্ভূত হোতে পারে না। সেটি সর্বদাই আত্মবক্ষামূলক, কখনই উগ্র নয় এবং সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাব শক্তি নিহিত। যার চিন্তা-ধাবাব অগ্রগতি থেমে গেছে, সে ইতিমধ্যেই পিছিয়ে পড়েছে। এক সময় ভারতে সবই তাব নিজস্ব ছিল। সেইসব দিনে সে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হয়েছে; কলঙ্কিত বা অপবিত্র হবার আতঙ্ক নিয়ে নূতনের সম্মুখীন না হোয়ে, তাকে—সেই নূতনকে শক্তি এবং জ্ঞানের অগ্রদূত হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে। ভাবতীয় গোঁড়ামিকে আর একবাব সংগ্রামেব সঙ্গে অগ্রসর হোতে শিখতে হবে। এখানে আমাদের বহুবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়। পরস্পর বিবোধী বহু পথের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেব? কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হোতে হবে? কি উপায় অবলম্বন করে? কোন্ কোন্ বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত? কোন্‌টি পরিহার করা কর্তব্য—এইগুলিই

বাস্তব অসুবিধা। সকলেই একমত যে কিছু করতে হবে। কেবল কারও পরিষ্কার ধারণা নেই যে কেমন করে তা করা যাবে।

দুর্বলতা সহজেই অনুসন্ধান করে বার করা যায়। যতদিন প্রাচ্যজাতি সংক্রামক বলে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ পরিহার করবে অথবা তাকে উৎকোচ বলে গ্রহণ করবে ততদিন পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য পরাজিত হবে। ভারত এতখানি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে যার ফলে সে কিনা একই (পাশ্চাত্যের) উপায় অবলম্বন করে একই বাজারে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবে —এই ধারণা যেমন ভ্রান্তিকর, তেমনি হীনতাপূর্ণ। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং প্রয়োজন হোলে অনশনে মৃত্যুবরণ—জাতীয় পবিত্রতার জন্য আত্মাহুতি—জনসাধারণের পক্ষে সামগ্রিকভাবে স্পষ্টতই বাস্তবানুগ নয়—যদিও বেশীদিন হয়নি আর্থ-নীতিক বিপর্যয়ের প্রবল আলোড়নে তা সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। তবে উপায় কী?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে পবিত্র (holy) বলে স্বীকার করে নিতে হবে। বিজ্ঞান হিসাবেই বিজ্ঞানের ধারণা উপলব্ধি এবং অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের জ্যোতির্বিদগণকে নিজস্ব বলে দাবী করবে। ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মানবজাতির মহৎ ও ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলিকে সত্যের ধারণা উপলব্ধি করার নূতন পন্থা হিসাবে ভারতকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে। কোন দূরবর্তী উদ্দেশ্যে প্রণোদিত না হোয়ে যে ভাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমূহ অনুসরণ করা হোয়ে থাকে,—সেইভাবে যেমন করে হোক, ঐগুলি আবেগের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এশিয়া মহাদেশীয় প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য। ঐহিক প্রয়োজনীয়তা সাধনের সুবিধাজনক উপায় হিসাবে গণিতবিদ্যা য়ুরোপে যে স্থান অধিকার করে, তার

(এশিয়া) কাছে সেই স্তরে (গণিত বিদ্যা) নেমে আসেনি, বরং এখানে তা সর্বদা প্রকৃতির মূল ঐক্য প্রকাশেব পবিত্র, অলঙ্ঘ্য উপায় হিসাবে স্বীকৃত। কোন মহান্ চিত্র বা হৃদয়স্পর্শী কবিতার ক্ষেত্রে আমাদের যেরূপ মনের ভাব হোয়ে থাকে, সেইরূপ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বিদগ্ধজন এ বিষয়ে উল্লেখ করে থাকেন। ভারতীয় কল্পনাশক্তি জ্ঞানকে স্বর্গীয় আনন্দের স্বরূপ মনে কবে শ্রদ্ধান্বিত। জগতে আব কাবও মেধাশক্তি (এশিয়াব মতো) এত অধিক তীক্ষ্ণ যুক্তিসম্মত, অনুসন্ধিৎসু নয়; অথবা একই সময়ে এত অধিক নিস্পৃহ আবার সেই সঙ্গে ব্যাপক ভাবে ধারণা কবার অধিকারী নয়। অতএব একটি বৃহৎ ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান অবাস্তব কল্পনা নয়, ববং প্রয়োজন হোলে অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে এটি গড়ে তোলা সহজসাধ্য। হিন্দুদেব উপলব্ধি করতে হবে যে, আধুনিক জ্ঞানেব একশত আট উপনিষদেব জন্য জগত প্রতীক্ষা কবে আছে; মুসলমানদের বুঝতে হবে যে 'Averrhoes' এবং 'Avicehna' এব জন্য পুনবায় সময় আগত এবং উভয়েই কেবল নিজেদের সুবিধা অর্জন করবে তা নয়, সংস্কৃতিব নূতন যুগ সৃষ্টি কববে।

এ কেবল প্রতিরক্ষার অনুপ্রেরণা নয়। প্রাচ্য পদ্ধতি মনের অনুশীলন এবং ব্যবহারেব বহু বিস্তৃত উন্নতিসাধন করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন কবেছিল। ভারতের যে কোন বড় শহর পর্যবেক্ষণ কবলে, (দেখা যায়) তাব সাধু ও পণ্ডিতের সংখ্যা লক্ষণীয়। লণ্ডনেব শহরতলীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অঞ্চলেও, তার ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীব মধ্যে এত সংখ্যক বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন বলে গর্ব করতে পারেন না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা এখন সম্পূর্ণতা লাভ কবেছে। সে কাজ সমাধা হয়েছে। সাধারণ মানুষেব তাতে নূতন কিছু যুক্ত করার অবকাশ নেই।

অতএব এখন প্রয়োজন সেই মহৎ বৌদ্ধিক সক্রিয় শক্তি যা

পূর্বেই অনুশীলিত হয়েছে, তার যথার্থতা প্রতিপাদন ও মানসিক ক্ষেত্রে জয়লাভের জন্য নূতন জগৎ আবিষ্কার ও নূতন বিষয় উদ্‌ভাবন করতে হবে এবং অগ্রগতির নূতন ক্ষেত্র প্রবর্তিত করে দিতে হবে—যার ফলে সাধারণ লোক বর্তমান জগতে নিজেদের শক্তি পরিমাপ করতে পারবে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হবে।

প্রধান উদ্দেশ্যরূপে নয়, কিন্তু একটি ঘটনা হিসাবে এই বিপ্লব থেকে অনিবার্যভাবে যান্ত্রিক নৈপুণ্যের উন্নতির উদ্ভব হবে—এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধি-সঞ্জাত দুর্নীতিগুলি প্রাচ্যদেশ পরিহার করতেও সক্ষম হবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত যে, ভারত যদি অবাধে যান্ত্রিক যুগকে গ্রহণ করে, তবে কারখানার শ্রমিকের মধ্যে সেই সব মানবোচিত গুণরাজি এবং নৈতিক অধিকার ফিবিয়ে আনবে—যা পাশ্চাত্যের শ্রমিক ক্রমেই হাবিয়ে ফেলছে।

এই পরিবর্তন সম্ভব করতে গেলে দেশের নানা অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে বহু ব্যক্তিব আবির্ভাব প্রয়োজন—যাদের হৃদয় ও মন সমন্বয়-ধর্মী। ভারত প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড। কিন্তু তার অধিবাসীদের মধ্যে অল্পলোকই তা উপলব্ধি কবে; এবং আরও অল্পলোকেব এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুভূতি আছে। এই সন্ধিক্ষণে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণ উচ্চাভিলাষ মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে না। মারাঠাগণ কেবল মহারাষ্ট্রের এবং শিখগণ কেবল পাঞ্জাবের কল্যাণ অনুসন্ধান যেন না করেন। বিগত কলহের বিষয়গুলি পুনরুজ্জীবিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এইসবের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা নেই। সমগ্র ভারতের অতীত এবং ভারতের সর্বজনীন গৌরবগাথায় সকলে একত্রে যুক্ত হবে। ভারতান্তর্গত প্রত্যেককে অপরের অবদান স্বীকার করে নিতে হবে। এমন সব চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন যাঁরা স্থানীয় ইতিবৃত্তের প্রত্যেকটি আকস্মিক

ঘটনাকে বুঝে তাকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারেন। পাঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং শিবাজীর নেতৃত্বাধীনে জাতীয়তার আবেগ এত প্রবল ছিল যে, শক্তিশালী মোঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে পেরেছিল। বাংলা দেশে কোনদিনই নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট ও সংহত রূপ না থাকায়, তার ইতিহাসের এই বিশেষ উপাদান অন্যান্য প্রদেশকে একত্র করতে তাকে সাহায্য করবে।

এই জাতীয় অনুপ্রেরণা সামাজিক এবং আর্থনীতিক। এ হোল ধর্মের শ্রেষ্ঠ অর্থ। গৃহ, বিদ্যালয় ও বাজারকে এই অনুপ্রেরণা দিয়ে প্রভাবিত করতে হবে। অতএব পুরুষের সঙ্গে নারীর সহযোগিতা প্রয়োজন বলে কোন প্রশ্ন উঠছে না। তার জন্যও নূতনতর ও অধিকতর গোঁড়ামির অবকাশ আছে। দেশীয় প্রথার প্রভাবে আজ নারী যে অবস্থায় উপনীত তিনি স্বেচ্ছায় সেইরূপ গ্রহণ করবেন। প্রাচ্য ধর্মবোধ বা শুচিতাবোধের মধ্যে রোগজীবাণু তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শীতলাকে রজকের গর্দ্দভের মতো একটি অপরিচ্ছন্ন পশুর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট বলে দেখানো হয়। রোগীদের স্বতন্ত্র রেখে জল ও সম্মার্জনীর সহযোগে তাঁর অর্চনা করা হয়। এই পৌরাণিক কাহিনীটি প্রশংসনীয়। য়ুরোপ এই জাতীয় কোন ভাল জিনিস দেখাতে পারে না। পরবর্তী কাজ প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আহার এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সকল সমস্যা নারীকে স্বাধীনভাবে জানতে, চিন্তা করতে এবং বিচার করতে হবে। আধুনিক যুগে শ্রমের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনকালের খাদ্য ও রন্ধন প্রণালীকে একেবারে অনুপযুক্ত করে তুলেছে। অজীর্ণ রোগ একটি জাতীয় অভিশাপে (National curse) পরিণত। তবুও এ এমন এক অসুবিধা, যাকে দূর করা সম্ভব। যে গোঁড়ামি চিরদিন দেহকে মানুষের প্রভু নয়, তার ভৃত্য করে রাখতে চেয়েছে, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে খাদ্য

সম্পর্কে আরও উদার নির্বাচন এবং রন্ধন প্রস্তুতির বিকল্প সহজ প্রণালীব প্রবর্তন প্রয়োজন।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও পরিবারকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করার প্রবণতার সঙ্গে একান্নবর্তী সংসারে জীবিকা অর্জনের উপায় ক্রমেই সীমিত হোয়ে আসছে। জাতীয় এবং গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক দায়িত্বগুলিকে বিবেচনা করার শক্তি বৃদ্ধি করে এর ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণ লোকায়ত জাতীয়-তার কৃষ্টিকে প্রকাশ কবে। প্রত্যেক ধর্মীয় আচারগত অনুষ্ঠান, প্রত্যেক ধর্মগত সংস্কার অলিখিত ইতিহাসে পূর্ণ। বর্তমান যুগ কোন কিছুব মাধ্যমে পাওয়ার পবিবর্তে ঘটনার প্রত্যক্ষ ও সহজ জ্ঞান দাবী কবে। এ দাবীর উদ্দেশ্য গোঁড়ামিকে আক্রমণ করা নয়, বরং তাকেই পরিপূর্ণ এবং উচ্চতম শক্তিসম্পন্ন করে তোলা।

গভীব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল এরূপ কোন বুদ্ধিবৃত্তিকে শিক্ষিত করার প্রশ্ন এখানে উঠছে না। যাঁরা ভারতীয় নারীসমাজে বর্তমান প্রচলিত প্রথা এবং (তাঁদের) অতীত জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, যাঁবা স্বীকার করেন যে, প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিকে অনুবর্তনের ফলে নারীর যে সকল গুণাবলী উন্নত এবং বিকশিত হয়েছিল, সেইগুলিরই প্রকাশের নূতন ভঙ্গী বা ধারা প্রবর্তন করা হচ্ছে মাত্র—তাঁরাই নারীর যথার্থ উপকার করতে সক্ষম। পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণার উপলব্ধি এবং তা প্রবর্তন করার দায়িত্ব প্রাচ্যদেশবাসীর জন্য তাদের নিজেদেরই সম্পাদন করা আবশ্যক, বিদেশী কর্তৃক সম্পাদিত হোলে চলবে না।

এইরূপ প্রণালীব ফল কোনভাবেই জাতীয়তার পরিপন্থী যেন না হয়। কোন আদর্শকে ভাবের দিক থেকে নিজস্ব করে গ্রহণ করা এবং নিজেদের মধ্যে সেই শক্তি প্রদর্শনকে অনুকরণ বলে না। অফিসে কর্মরত কেরানী, রাজনীতিক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনকারী, অথবা ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম

যন্ত্রশিল্পে জ্ঞানসম্পন্ন উৎপাদনকারীদের মধ্যে কেবল এই ধরনের পাশ্চাত্যের অনুকরণমূলক চেতনা প্রাচ্যের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ। কিন্তু পাশ্চাত্যের কর্ম উদ্যমকে প্রাণবন্ত, সক্রিয়, অন্তরঙ্গ ও যথাযথ ভাবে গ্রহণ এবং অবিলম্বে প্রাচ্যভাবে তার রূপায়ণ মৃত্যু নয়—জীবনের লক্ষণ।

বলা হয় যে প্রাচ্যদেশে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি যে উৎকর্ষতা লাভ করেছে তার ফল তাকে ভুগতে হয়। প্রতীচ্যের আদেশ হোল—'সত্য কথা বল'—আর অন্যদিকে বলে—'তোমার কথাগুলি যেন সৌজন্যপূর্ণ হয়।' আমরা কতবারই না দেখেছি যে এই পরস্পব বিবোধী নীতিবাক্যসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য ন্যায়শাস্ত্র অন্ধভাবে সংগ্রাম কবে যাচ্ছে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ বিফল। কিন্তু প্রাচ্যদেশে বিগত দুই হাজার বছর ধরে জনসাধারণ মনুব এই অনুশাসন অনুসরণ কবে আসছে—'সত্য কথা বল, কিন্তু অপ্রিয় কথা বোল না,—প্রিয় কথা বল, কিন্তু মিথ্যা বোল না (প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, সত্যং ব্রুয়াৎ, অপ্রিয়ম্ সত্যম্ মা ব্রুয়াৎ)।' হায়, এই বাক্যটির সম্পূর্ণতা আর নূতন কিছু যোগের অবকাশ রাখে না। সেই অবিজিত অঞ্চল যাব পূর্ণ সম্ভাবনাকে মন আবিষ্কার করতে উৎসুক, ঊষর নির্জন মরুপ্রান্ত যাকে পরীক্ষামূলক ভাবে পর্যবেক্ষণদ্বারা পুনরায় বাসযোগ্য এবং বিধিবদ্ধ এলাকার সঙ্গে যুক্ত করতে চায়, সেই সত্যস্বরূপ জলধিকে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা জানবার প্রচেষ্টা এবং তার ফলে সন্দেহ ও নাস্তিবাদের সম্মুখীন হওয়া এবং পরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ধীরে ধীরে তাকে জয় করা—এই সবই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার ভিতব দিয়ে দেখলে অনায়াসে সফল হওয়া যায়।

শিক্ষা বলতে যা বোঝায় আধুনিক ভারতে তার প্রবর্তনের চেষ্টা অল্পই হয়েছে। একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান

(organisation) প্রস্তুত। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের নিজেদের কাজের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে তারা এ গুলির মধ্যে নিজেদের কল্যাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করেছে। অধিকন্তু 'শিক্ষার' অর্থ সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত উদার আদর্শের অভাব দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, বর্তমান কালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে যেমন ধর্মীয় সংস্কৃতি বর্তমান, তেমনি কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ হোতে হোলে তার সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতির অনুশীলন আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির জগতে ক্রীড়ারত শিশু থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে (যেখানে ইতিপূর্বে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি) আরূঢ় নিঃসঙ্গ সাধক পর্যন্ত সকল অবস্থায় অনুরূপ ধর্মীয় প্রভাবের অধীন। অতঃপব সমাজে প্রত্যাবর্তনের পর যখন সেই নিঃসঙ্গ সাধক তাঁর ভ্রমণের বিষয় পর্যালোচনা করেন, তখন দেখতে পান যে, যে সমাজের মধ্যে থেকে তাঁর উদ্ভব তার মধ্যেই রয়েছে প্রভূত সহানুভূতি, সহৃদয়তা এবং নূতন প্রেরণা।

কোন প্রাচ্যদেশের সুমহান সভ্যতা এবং বিভিন্ন ধর্মমত সমূহ থেকে এক মহৎ জাতি সৃষ্টির প্রণালী কোনও ক্রমেই সহজ নয়। কিন্তু এমন কোন অস্ত্র বা উপায় নেই যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি (রাজবংশীয়গণের পরস্পরের তুচ্ছ দ্বন্দ্বের দ্বারা কৃষিনির্ভর জনগণের মৌলিক শান্তি ব্যাহত হয় না) কতক পবিমাণে ধর্মমত সমূহের অন্তর্নিহিত সামরিক উপাদানগুলিকে দুর্বল করে। তবু এখনও মহরম-পর্বের সময় অসিক্রীড়ার সাহায্যে আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শিত হয়। এখনও দুর্গাপূজার সময় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা হয়। এখনও বঙ্গদেশের বিশিষ্ট কায়স্থ পরিবারে এবং রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বার্ষিক তরবারি পূজার প্রথা প্রচলিত। এখনও ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধদেবতার

(কার্তিক) জন্মোৎসবের সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকগণ প্রজ্বলিত দীপ হস্তে মন্দিরে সমাগত হয় এবং দিনটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় কবে তোলে। আরও অসাধারণ এবং স্ববিরোধী ঘটনা হোল যে, যে ভারত শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু এবং অত্যন্ত নম্র—সেই ভারতেই আমরা দেখতে পাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত, রথের উপর আরূঢ় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃতবাণী জগতে সর্বাপেক্ষা উদ্দীপক এবং সংগ্রামধর্মী।

কোন জাতিকে মহান্ করতে গেলে আর একটি প্রয়োজন হোল সকল শ্রেণীর মধ্যে একত্ববোধ সঞ্চার করা। বংশ এবং আচার ব্যবহারেব তীব্র পার্থক্য দক্ষিণ ভারতে 'পারিয়া' শব্দটিকে প্রবাদে পরিণত করেছে এবং ভারতের নাম জাতীয় ঐক্যের পবিবর্তে জাতিভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তথাপি দক্ষিণভারতে সেই পারিয়াদের মধ্যেই একটা প্রচেষ্টা দেখা গেছে। গ্যালিলি দেশীয় আচার্যের (যীশুখৃষ্টের) মতো ধর্মনেতা রামানুজেরও সমগ্র জীবন সমাজে অবজ্ঞাত এবং পরিত্যক্তদের উদ্দেশে হৃদয়ের একান্ত আবেগের সঙ্গে নিবেদিত হয়েছিল। এখানেও জাতীয় সংহতি হিন্দুর কর্ণে কোন নূতন স্থর ঝঙ্কৃত করেনি। ইসলাম ধর্ম ভ্রাতৃত্বের মহান্ সমন্বয়ের বার্তা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উত্তরে গুরু নানক এবং দক্ষিণে শ্রীবামানুজ সেই মতবাদ তাঁদের জীবন এবং বাণীর মধ্য দিয়ে প্রচার করে তাকে চিরস্মরণীয় করেছেন। একবার যদি ভারতের মাতৃহৃদয় (Mother heart of India) দেশের ঐতিহাসিক এই সকল ঘটনার তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তবে আমরা দেখব যে সকল বাধা চূর্ণ—সকল অস্থবিধা অপসাবিত এবং এক নূতন যুগের সূচনা আসন্ন—যে যুগের মধ্যে অতীত ভারতের সমস্ত উপলব্ধি একযোগে বিকশিত হোয়ে শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করবে।

আমরা কেমন করে বলব যে, ভারতীয় নারী জাতীয়তার এই বিরাট রূপ ধারণা করতে সমর্থ হবেন? এই জাতীয়তার সংজ্ঞা

নিরূপণের মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাঁরা কেমন করে অর্জন করবেন? প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে কেমন করে তাঁরা সুস্পষ্ট এবং যথাযথ পাণ্ডিত্য লাভ করবেন? যে সব গায়কেরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে মহাকাব্য কীর্তন করতেন, তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করাই ছিল ভারতীয় রমণীদের চিরাচবিত প্রথা; আমরা কি আশা করব যে এই গায়কগণ সহসা ধর্মীয় ভাবাবেগপূর্ণ সঙ্গীত পরিহার করে জাতীয়তামন্ত্রের উদ্গাতা চারণ-গায়কে পরিবর্তিত হবেন? না তা হয় না। কারণ সেরূপ পরিবর্তন কেবলমাত্র এক বিরাট আলোড়নের পরিণামরূপে আসতে পারে,—তার হেতু হোতে পারে না, যে আলোড়নের ফলে জাতি দীপ্তিমান জয়যুক্ত এবং অনাগত কালের সন্তানদের কল্পনাকে প্রভাবিত করার মতো শক্তিশালী হোয়ে আবির্ভূত হোত। কিন্তু এইরূপ (জাতীয়) আলোড়নের উৎসকে কোথায় পাওয়া যাবে?

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা নিজেদেব এইভাবে আশ্বাস দিতে পাবি যে, জগত যখন কোন যুগান্তকারী ভাবেব জন্য প্রস্তুত হয়, যেমন বর্তমানে ভাবত অবশ্যই প্রস্তুত—তখন চারিদিক থেকে সেই ভাবধারা প্রতীক্ষমাণ চেতনার উপর বর্ষিত হোয়ে থাকে।

প্রতি প্রস্তবখণ্ড সেই বার্তা ঘোষণা কবে, প্রতি দবজা, জানালা, প্রাচীর ভেদ করে উচ্চৈঃস্বরে তার প্রত্যুত্তর জানায়; সাধারণের কল্যাণের জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম তরান্বিত হয়—আদর্শ এবং সংগ্রাম, পরস্পবকে বৃহত্তব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত করে ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত—যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের উদ্দেশ্য সংসাধিত না হয়।

বর্তমানে তার ও ডাক ব্যবস্থার এবং এক সর্বজনীন (Common) ভাষা ও সুলভ মুদ্রণের যুগে এ কথা আরও বেশী সত্য। অশোকের রাজত্বকালে ভারতে যে কার্য সমাধান করতে অন্ততঃ দুইশত বর্ষ অতিবাহিত হোত, বর্তমানে তা এক দশকের

মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। যেখানেই ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয়েছে সেখানেই জাতীয়তা মন্ত্রের প্রচারকের প্রয়োজন অনুভূত। কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারে না যে, নারীগণের মধ্যে কীভাবে এর উদয় হবে। কেউ বা নিজেই এই ভাব গ্রহণ করবেন। কেউ বা পুরুষের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করবেন। কেউ বা ইতিমধ্যেই তা লাভ করেছেন। এ কথা নিশ্চিত, নারীর মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে সমন্বয়ের স্বার্থকে রক্ষা করার যে ক্ষমতা আছে তার ফলে তিনি সমগ্রভাবে কোন ভাবধারা বিবেচনার অধিকার থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকতে অস্বীকার করবেন। জননীর স্বার্থ সর্বদাই ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। নারী সহজেই বুঝতে পারবেন যে, এক যুগের পরাজয় সমগ্র জাতিকে তার পূর্বপুরুষের অর্জিত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি দৃঢ়ভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে, তাঁর সন্তানের ভাগ্যে জয় সুনিশ্চিত, পরাজয় নয়।

একবার যদি প্রাচ্যরমণী এইভাবে দেশের সকল সমস্যার সমাধান করে জাতীয় তরণীর হাল ধরেন, তখন কে এ কথা বলবে যে তিনি তাঁর নিজের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের জন্য অপরের নিকট আবেদন করবেন?

কলকাতার হিন্দুপল্লীর জীবন

আমি যখন আবিষ্কার করলাম যে, কাজের জন্য আমাকে কলকাতায় হিন্দুপল্লীতে বাস করতে হবে, তখন যেমন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, চারদিক থেকে প্রতিবাদ আসতে লাগল। সবাই বলতে লাগলেন যে, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হোয়ে মৃত্যু ঘটবার তুলনায় আমার সুস্থ থাকবার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। যাই হোক, সে আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। এখানে আমি বেশ কয়েকমাস ধরে রয়েছি এবং একদিনের জন্যও অসুস্থ বোধ করবার কোন কারণ দেখতে পাইনি।

আমার চোখে আমার বাড়িটি অতি সুন্দর। দুটি প্রাঙ্গণ, ছোট্ট তিনতলা, আশ্চর্য পুরাণো ধরনের পাঁচটি ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া ও চত্বরওয়ালা ছাদ—সব মিলিয়ে বাড়িটি যথার্থ পুরাতন হিন্দু স্থাপত্যকলার একটা অসংলগ্ন নিদর্শন। বাড়িতে কোথাও এক টুকরো কাচের ব্যবহার নেই। জানালার নীচের দিকের অংশ লোহার ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ, উপরের দিকে কাঠের হুড়কো লাগানো। জানালার গায়ে গাঢ় সবুজ রঙ-এর মাদুরকাঠির পর্দা আমার পড়ার ঘরের বাইরের রৌদ্রকে স্নিগ্ধ করে তোলে। শোবার ঘর থেকে কিন্তু সারারাত্রি আকাশের তারা দেখা যায়। অতীতে এই বাড়িতে কোন বৃহৎ পরিবার বাস করে গেছে; খুব সম্ভব এখানেই তাদের একপুরুষ অন্ততঃ মারা গেছে। অবশেষে প্রাচীনদের মধ্যে শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবারের অন্যান্য সকলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েছে; কালে তারাই আবার নূতন বড় বড় পরিবার সৃষ্টি করবে। আমার জানালার নীচে, ঐ গলিটার মধ্যে, বাইরের পাড়ায় যে জীবন-প্রবাহ বয়ে চলেছে—মনে হয়, বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই পুরাণো বাড়িটা তারই মতো নিঃসন্দেহে অজ্ঞ ও বর্তমান জটিলতা মুক্ত, কিন্তু মানবিক কোমলতা ও সরল উপাসনায় পরিপূর্ণ।

গলিটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মানোরম ভাবে আঁকা-বাঁকা। প্রথমে একদিকে ঘুরে আবার অন্যদিকে ঘুরে গেছে এবং যেখানেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় বাড়িগুলির মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা থেকে গেছে—সেখানেই গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বস্তী। কাছেই একটা বস্তী আছে—একসারি নারকেল বৃক্ষের তলা ঘেঁষে গাঢ় বাদামী রঙ-এর দেওয়াল, আর লাল টালির ছাদওয়াল্য কয়েকটি মাটির ঘর। ঊর্ধ্বে নীলিমার বুকে নারকেল বৃক্ষগুলি মাথা তুলিয়ে চলেছে, নীচে একটি ছোট পুকুরের জলে ও গোয়ালঘরের ছাদে তাদের দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত হোয়ে পড়েছে, দেওয়ালের কোলে ছোট ছোট সবুজ তৃণগুলিকে রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করছে। আর একটি বস্তীর প্রবেশ পথে পাইপের মতো দেখতে একটি জলের কল—সব সময়ে সেখানে ঘোমটায় মুখ ঢাকা মেয়েদের ভিড়—তাদের সুদৃশ্য পেতলের অথবা মাটির ঘড়া করে জল নিয়ে যাচ্ছে। রৌদ্রে ভরা চারিদিক—আনন্দিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে মুখরিত ; সর্বত্র শুকাবার জন্য মেলে দেওয়া সদ্য ধৌত জামাকাপড় বাতাসে উড়ছে, ইতস্ততঃ দু-একটি গরু চরে বেড়াচ্ছে।

কতকগুলি বই, ছবি ও আধুনিক জীবনের নিদর্শন দু-একটা সূক্ষ্ম রুচির জিনিসে পরিবেষ্টিত হোয়ে টেবিল থেকে আমি বহু শতাব্দীর পুরাণো এক জগৎ দেখতে পাই। কেবল যে দেখতে পাই তা নয়, সেই জগৎ যেন এখানে আমার ঘরের মধ্যেই রয়েছে। যেদিন আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা ছ' পয়সা দামের রান্নার একটা উনুন কিনবার জন্য পরামর্শ করতে এল—সেদিনটির কথা আমি কখনই ভুলব না। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে সে তিনটি লোহার শিক, একটা বড় পাত্‌লা টালি আর একতাল গঙ্গামাটি কিনে এনে ঐসব দিয়ে নিজের জন্য সাদাসিধা একটা উনুন তৈরী করে নিল। গলার কাছে খাঁজ কাটা একটা গোল হাঁড়ি উনুনের ওপর চাপিয়ে সে রান্না করত। কদিন পরে বেশ ভয়ে ভয়ে আর

ছ'টা পয়সা চাইল—গরম হাঁড়ি নামাবার জন্য একটি বেড়ি কিনবে। ছোট্ট এবং দেখতে অদ্ভুত একটা সামান্য বাসন—মনে হয়, কেউ বলতে পারবে না, কতকাল ধরে তার পূর্বপুরুষেরা এই ধরনের জিনিসপত্র গৃহস্থালীর কাজে প্রয়োজনীয় নির্দোষ বিলাস-দ্রব্য বলে মনে করে এসেছে। এ সবই বহু পুরুষ ধরে সাহসের সঙ্গে ও শোভনভাবে মেনে নেওয়া এক হত দারিদ্র্যদশা প্রকট করে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হোল—যখন উনুনের ওপর একদিন হাঁড়িটা ফেটে গেল—ঘটনাটি মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আমার ঝি মৃদু আর্তনাদ করে উঠল। হাঁড়িটার দাম ছিল নগদ এক পয়সা! এই বৃদ্ধার বয়স সত্তরের ওপর, আর আমার বয়স তার অর্ধেক হোলেও আমিই তাকে 'ঝি' বা 'মেয়ে' বলে ডাকি। হিন্দুদের সুন্দর প্রচলিত প্রথানুযায়ী উচ্চবর্ণের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই নামেই দাসীকে ডেকে থাকে। বাড়ির কর্তা ও গৃহিণীরা দাসীদের 'বাবা' ও 'মা', আর বাড়ির মেয়েরা তাদের 'দিদিমণি'। এ সব পুরাণো দাসী অনেক সময় পরিবারভুক্ত হোয়ে ঠাকুরমা-দিদিমার স্থান অধিকার করে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাড়ির মনিবদের তিরস্কার এবং ছেলেমেয়েদের আদর দিয়ে নষ্ট করবার দাবী করা তাদের পক্ষে অতি সাধারণ ব্যাপার। এই সব ক্ষেত্রে পরিবারে দাসীদের সামাজিক হীনাবস্থা অপরিচিতের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। বাড়ির কর্ত্রী দাসীর আহার্য স্বহস্তে প্রস্তুত ও পরিবেশন করে থাকেন। পরিণত বয়সে এরকম কোন দাসীর মৃত্যু হোলে, যাদের সে আপনার জন বলে গ্রহণ করেছিল, তারাই রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের মতো তার জন্য শোক করে থাকে।

অনেকগুলি কাজ ঝি করত না, তার ফলে আমার কলকাতায় বসবাসের প্রথমদিনগুলি বেশ কৌতুকর করে তুলেছিল। দ্বিতীয় দিন বিকালে চা-এর পাত্রে গরমজল দেবার জন্য বলতেই সহসা

তাকে অদৃশ্য হোতে দেখে বেশ আমোদ অনুভব করলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য; তারপরেই ফিবে এল স্নান করে, সর্বাঙ্গে জল ঝরছে, কেন না তার মনে হয়েছিল, আমার খাদ্য বস্তু স্পর্শ করবার পূর্বে তার স্নান করা দরকার। অবশ্য এই ধরনের বাড়াবাড়ি ক্রমশঃ আপনা থেকেই বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল। এবং আশ্চর্যের কথা, এখন সে আমার স্পৃষ্ট পেয়ালা-পিরিচ ধুতেও প্রসন্নচিত্তেই সম্মত। অবশ্য অন্য কোন মেমসাহেব দেখা করতে এলে সেই বান্ধবীর আহারের বাসনপত্র আমাকেই পরিষ্কার করতে হয়। আহারাদি সম্পর্কে এ ধরনের ভারতীয় কুসংস্কার বিশদভাবে সমীক্ষা করে দেখলে অনেক কিছু জানা যায়। কেন যে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলিতে শুদ্ধির ধারণা এত অসুবিধা ও বিধি-নিষেধের সঙ্গে জড়িত, অথচ প্রাচীন গ্রীসে এ ব্যাপার স্পষ্টতই কোন বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে এবং শোভনভাবেই মিটিয়ে ফেলা হয়েছে।

আমার বাড়িতে একটা আঙ্গিনা আছে। কেন যে আমরা ইংরেজরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পরিবেশে যা শোভা পায়, সেই সব গৃহস্থাপত্যরীতি এখানে এই রৌদ্রছায়াময় প্রাচ্য দেশেও প্রবর্তন করতে চাই! দেশীয় রীতি গ্রহণ করাই সঙ্গত নয় কি? আমাদের অপেক্ষা হিন্দুরাই বাসগৃহ শীতল রাখার পন্থা উদ্ভাবন করতে অধিক সমর্থ হয়েছে। ধনীগৃহে যে প্রশস্ত শ্বেতপাথরের বাঁধানো আঙ্গিনা আমরা দেখতে পাই, তারই সিঁড়ির ধাপে ধাপে কিংবা থামের গায়ে গায়ে যে সব গুল্মলতাদি, তা এথেন্স কিংবা পম্পাই নগরীর স্থাপত্য সৌন্দর্যেরই অনুরূপ। আমার বাড়ির আঙ্গিনাটি অবশ্য খাঁটি শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো নয়, তবুও শীঘ্রই আমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম যে, প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সামনের দরজা খুলতেই আমার মন যে প্রফুল্ল হোয়ে ওঠে তার রহস্য কি! তখন দেখলাম বাড়ির মধ্যে এই জায়গাটি আমার আকাশ ও তারাদের সঙ্গে মিলনের স্থান। দিনের বেলা শীতলতা ও ছায়া দেয়, রাত্রে

অসীমের পূজার মন্দির হোয়ে ওঠে, হাসিখুশীতে মাতাল হাওয়ার খেলার স্থান—আবার একটি খোলা সূর্যঘড়ি—কে না এ রকম একটি আঙ্গিনাওয়ালা বাড়ি পছন্দ করবে?

আমার বাড়ির স্থাপত্যকলার অপর সৌন্দর্য হোল বাড়ির ছাদটি। ওখানে উঠে মনে করা যেতে পারে, আমি সিরিয়া দেশে এসেছি। চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত একই ধরনের ছাদের পর ছাদ ছড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে গাছপালা ও বাগানের সবুজ শোভা; উচ্চ তরুশ্রেণী, সারি সারি স্তম্ভ এবং খাড়া পাথরের সিঁড়ি তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে। লাহোরের ঘন বসতির জাঁকজমকপূর্ণ সৌন্দর্য বাংলাদেশের বড় বড় বাড়িগুলিতে নেই। এখানে বরং প্রশস্ততা, নির্জনতা, সারি সারি ছাদ, তালগাছের শ্রেণী আর ঊর্ধ্বে বিস্তৃত আকাশ। এখানে প্রভাতে, সূর্যাস্তকালে কিংবা নিশীথে চাঁদের আলোয় সমগ্র বিশ্বের মাঝে নিজেকে একা বলে অনুভব করা যায়। নীচে দেখা যায় রাত্রের রান্নার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে উনুনে আগুন পড়েছে—তার ধোঁয়া উঠছে—ইংলণ্ডের গ্রাম্যজীবনের আরামদায়ক দৃশ্য থেকে কত ভিন্ন রকম! আবার ঊর্ধ্বের দৃশ্যও কত পৃথক ধরনের! যদিও উভয় দেশেই আগুনের দৃশ্যই বাড়ি ফেরার সময়কে উজ্জ্বলতা দান করে। কারণ এখানকার উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলের প্রভাময় বিশুদ্ধতা এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রের বিপুল উজ্জ্বলছটার কথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

অন্দরমহলে অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকে যে সব হিন্দু ললনা তাদের কাছে এ রকম একটি ছাদ থাকা যে কতখানি! এখানেই তাদের জীবন দর্শন, বিমূর্ত জীবনের সঙ্গে পরিচয়—নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তার সাক্ষাৎ লাভ! এখানেই প্রতিবেশী অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, কারণ একটি অন্দর মহলের ছাদ আর একটি অন্দর মহলের ছাদের কাছাকাছি। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ রাত্রে বাড়ির মেয়েরা চুপি চুপি ছাদে উঠে আসে ঘুমাবার জন্য, চারিদিকে

শীতলতার মধ্যে হাসিগল্পে সময় কাটায়, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পায়। এই ছাদ থেকেই গঙ্গা দর্শন হয়, যা সব ক্লান্তি অপহরণ করে পূজা শেষের সঞ্জীবতা এনে দেয়। কি অপূর্ব শোভাময়ী গঙ্গা! আর তার সন্তানেরা তাকে কি ভালই না বাসে? গঙ্গায় নেমে পাদস্পর্শে তাকে মলিন করবার পূর্বে নত হোয়ে তারা মাথায় সামান্য জলস্পর্শ করে নেয়—কি অপূর্ব প্রাচীন সৌন্দর্যমাখা এই প্রণাম ভঙ্গীটি!

'শোন, শোন, কুকুর ডাকছে! শহরে ভিক্ষুকের দল এল!' ভারতীয় গৃহিণীর কাছে ভিক্ষুক অতি বাস্তব সমস্যা। সার বেঁধে তারা গলি দিয়ে আসে, সৌভাগ্যের বিষয় প্রত্যহ নয়। অনেকেরই উত্তম পরিচ্ছদ, বেশ হাসিখুশী দেখতে, অধিকাংশের পরনে শুভ্র বস্ত্র, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র—নরনারী দল বেঁধে আসে। সমাজে তারা এমন পূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছে যে, শহরের কোন্ পাড়ায় সপ্তাহের কোন্ দিনটিতে তারা দর্শন দেবে তা পূর্ব হোতেই ছক কেটে স্থির করা আছে। আমার আকর্ষণের পাত্র হোল নিঃসঙ্গ এক ভিক্ষুক। সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নগ্নপদ ভিক্ষু, বুদ্ধের ন্যায় পীতবসন পরিহিত, ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। হয়তো সে একেবারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারপর উচ্চৈঃস্বরে বারবার নাম করছে 'হরিবোল' বা 'সীতারাম' যা প্রার্থনার মতো শোনায়। ঈশ্বরের নামে ভারতবাসীর এই আবেগ লক্ষণীয়। বারবার এই নাম উচ্চারণই সবটুকু প্রার্থনা—এবং তারা বলে, বুঝে বা না বুঝে যে ভাবেই হোক আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পোড়ে, তেমনি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে ভাবেই হোক ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন কি কল্যাণ করবে না? হয়তো বা আমাদের পূর্বোক্ত ভিক্ষুক বন্ধুটি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হোয়ে রইল একটি গান আরম্ভ করবে বলে—এটা লক্ষ্য করবার বিষয়, কারণ অগাধ মাধুর্য ও রসসম্পদ

যুক্ত এক সাহিত্য-প্রতিভা এই ভিক্ষুকদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। বেশী দিনের কথা নয়, রামপ্রসাদের—যিনি বাংলা দেশের রবার্ট বার্ণস—অপূর্ব লোকগীতিগুলির যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে, তা এদেরই কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। গীতিকার সব সময় তাঁর রচিত গানের শেষ চরণে নিজের নাম উল্লেখ করে থাকেন—এই হোল প্রথা। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই প্রাচীন প্রথা কোন বিশেষ গীতিকারের রচনা সংগ্রহে সংগ্রাহকের কত সহায়তা করে। এক মুষ্টি চাল, দু-একটি ফল কিংবা দু-একটি পয়সা—সামান্য কিছু পেলেই এই ভিক্ষুকেরা সন্তুষ্ট! যেখানে বহুজনের দাবী সেখানে এর চেয়ে বেশী দেওয়াও সম্ভব নয়। 'মা, আমাকে খেতে দাও' বলে এসে দাঁড়ালে দাতার মনেও কোন বিরাগ জাগে না। 'প্রতিবেশীর খাদ্যে ক্ষুধার্তের স্বাভাবিক দাবী আছে' এ আপ্তবাণী ভারতবাসীর মনে কোন রকম রোমাঞ্চকর সাড়া জাগাবে না, কারণ এ তত্ত্ব পূর্ব থেকেই এখানকার সমাজ-জীবনের একটি মৌলিক নীতি বলে গৃহীত।

'নূতন মানুষ, অচেনা মুখ, অজানা মন'—এ সবের মধ্যে জীবন এখানে অনেক না চাওয়া আকর্ষণে পূর্ণ। যখন আমি লিখি—টেবিল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পাখীর ডানা ঝাপটানো ও কাকলীর শব্দ ভেসে আসে। আর একটু দূরে নিম, বট ও তাল বৃক্ষের মাথাগুলি আন্দোলিত হয়, আর গাছের নীচে আশেপাশে চারিদিকে প্রাচীনতার রহস্যে উজ্জ্বল অথচ নূতনের স্পন্দনে ধ্বনিত এক জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি হুইটম্যান, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও Beata Beatrix-এর অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দৃষ্টিকে চালিত করি। আমি চাই ইচ্ছামাত্র এক মানসিক আবেষ্টনী থেকে আর এক মানসিক আবেষ্টনীর মধ্যে চলে যাব—এ ধরনের যাতায়াত ব্যতীত নিছক শারীরিক উপস্থিতির মূল্য যৎসামান্য। আমার এ ইচ্ছা ব্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামান্যভাবে কিছুটা পূর্ণ

হয়েছে—যা ইতিপূর্বে কল্পনা করিনি এমন এক বৃহত্তর অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করেছি—এক সীমাহীন মানব জীবনের পরিচয় পেয়েছি, যে অসীমের মধ্যে কালের দূরত্ব সব মিলিয়ে যায়, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আর্যঋষিগণ তাদের মহত্তম বিকাশে এক হোয়ে গিয়েছেন, যা কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মানস-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এইভাবে ঃ

হে গণতন্ত্র, ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও, তোমার শ্রেষ্ঠ তরণী,
মূল্যবোধ তোমার দ্রব্যসম্ভার, তাতে শুধু বর্তমানই নেই,
আছে সঞ্চিত হোয়ে অতীতও,
তুমি যে শুধু তোমার একার অভিযানের ফল নিয়ে চলেছ তা নয়,
শুধু পাশ্চাত্য মহাদেশেরই নয়—
সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ তোমার সাথে ভেসে চলেছে।
হে তরণী, তোমার মাস্তুল ভারসাম্য ঠিক রেখেছে ;
তোমার উপর আস্থা রেখে সময়ও ভেসে পড়েছে,
পুরাতন জাতিগুলি তোমার সঙ্গে ডুবছে, ভাসছে,
তাদের বহুকালের সংগ্রাম, শহীদ, বীর, মহাকাব্য, যুদ্ধ
সব কিছু নিয়ে,
তুমিই ধারণ করে নিয়ে চলেছ প্রাচীনতম জাতিগুলিকে,
তাদেরও নিয়ে চলেছ—আবার তোমাকেও—
চলেছো বিজয়ের বন্দরের অভিমুখে।
অতএব সুদৃঢ় হাতে ধরো হাল, সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলো, হে কর্ণধার।
তোমার মহান্ সঙ্গীদের তুমি বহন করে নিয়ে চলেছ,
প্রাচীনতার জন্য শ্রদ্ধার্হ, পূজারী এশিয়া আজ তোমার
সাথে ভেসে চলেছে,
আর রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক য়ুরোপও ভেসে চলেছে
তোমারই সাথে।

আমাদের অন্দর মহলের চত্বর

যে সকল সুখী ও শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে ছু-এক ঘণ্টা অতিবাহিত করবার জন্য কলকাতার এই হিন্দুপল্লীতে এসে উপস্থিত হন, তাঁরা মধ্যযুগীয় শিল্পকলা ও আধুনিক বিকৃত শিল্পবস্তুর উপর অখণ্ড মনোযোগ ভঙ্গ করে বলবেন যে, আমাদের দরজার বাইরে যে গলিটা, তা ঠিক প্রথম যুগের অকৃত্রিম ইতালীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। আমরা চাই একথা কেউ বলুক ; কিন্তু আমাদের বাড়িটি যে সুন্দর সে বিষয়ে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। নভেম্বর মাসের কুহেলী সন্ধ্যায়, যখন অনেক দূরে দূরে দেওয়ালগিরির সঙ্গে ঝোলানো জোড়া জোড়া রাস্তার আলো বাড়ির অসমান প্রবেশ-পথগুলি আলোকিত করবার জন্য জ্বলে ওঠে,—মনে হয়, তারা যেন পরস্পরের পা মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে এবং গম্ভীর আগ্রহ নিয়ে—তখন আমাদের গলিটা যে খুব চমৎকার, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। হয়তো এদিকে একটা বারান্দা সামনে থেকে ঘুরে পেছনে চলে গেছে, সেদিকে একটা দেওয়াল ভিড় করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তাটা দেখবার জন্য। হয়তো কোন বাড়ির সামনের দিকে কোন প্রাচীন কারুকার্য আছে, বারবার চুনকামের আস্তরণে তার অর্ধেক ঢাকা পড়েছে। সর্বত্র এই সাদা রঙ-এর কলি বড় বড় ভারতীয় বাড়িগুলিকে দীর্ঘাকার মানুষের আকৃতি দান করে ; মনে হয় যেন আপাদমস্তক সাদা এবং সেলাই না করা প্রাচ্যদেশীয় পরিচ্ছদে মানুষটিকে সাজানো হয়েছে ; অথবা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এই বাড়িগুলি দেখে বিবর্ণ চাদরে ঢাকা মৃতদেহের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ শিউরে উঠতে পারে।

কিন্তু যদি সেই সকল আগন্তুক, যাঁদের হৃদয়ে সৌন্দর্যবোধ আছে, ভারতীয় এই গলিটির দ্বারা এতটা অভিভূত হোতে পারেন, তাহলে আমাদের অন্দরমহলের এই ছাদটি আমাদের দৃষ্টি দিয়ে

দেখলে তাঁরা কী বলবেন? পাঠকের কি তাঁর পাশ্চাত্য-গৃহে এমন কোন প্রিয় জানালা আছে, যেখান থেকে তৃণাবৃত ভূমি ও গাছপালা দেখা যায়? দেখতে পাওয়া যায়, যখন প্রথম বসন্তে মাটি বিদীর্ণ করে তৃণ ও চারাগাছের ঝালর জেগে ওঠে? কিংবা আছে কি তাঁর অগ্ন্যাধারের (ingle-nook) ঠিক পাশটিতে বিশেষ প্রিয় একটি কোণ—যেখানে আগুন, ছবি ও নীচু একটি বসবার আসন তাঁকে স্বাগত জানায়, মন ভরে ওঠে আলো ও শান্তিতে? তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন, আমাদের এই ছাদটি আমাদের কাছে কী! আমাদের চারটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে তৃতীয়টি দোতলা সমান উঁচু, তার তিনদিকে আরও উঁচু ছাদওয়ালা অনেকগুলি ঘর, আর চতুর্থ দিক উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকায় পর্দার কাজ করে। তার ঠিক মাঝখানে চার কোণে চারটি পাথরের থাম দিয়ে খাড়া করা খুব সাদাসিধা একটা হালকা কাঠের রেলিঙ, যে রেলিঙ আমাদের নীচের প্রাঙ্গণে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এই ছাদটির দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত একটি সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাড়ির একেবারে উপরে একটি চতুষ্কোণ বুরুজে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং খাড়া উপরের ছাদ ও চত্বরের মধ্য দিয়ে উঠে গেছে। আঃ, এই সিঁড়িটি! মনে হয় যেন ক্রিভেলীর (Crivelli) অঙ্কিত দেবদূত (Angel of Annunciation)[১] ঈশ্বরের বার্তাবহ হোয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ আশিস্ ধন্যা নারীর অনুসন্ধানে এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে পাবেন। অন্ততঃ এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হোতে পারি যে, ক্রিভেলীর দেবদূত ও তাঁর সিঁড়িটার মধ্যে সে ক্ষেত্রে কোন প্রভেদ থাকবে না।

অথবা যদি এখানে বিপরীতদিকে মুখ করে দাঁড়ানো যায়, তাহলে

---

১ পঞ্চদশ শতকের একজন Venice দেশীয় চিত্রকর। এখানে তাঁর বিখ্যাত Angel of Annunciation চিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

দেখা যাবে, দেওয়ালের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে একটি নিম গাছের শাখা প্রশাখা ও ফার্ণের মতো পর্ণরাজি। পূবে হাওয়া যে ম্যালেরিয়া রোগ বহন করে আনে তাকে দূর করবার জন্য প্রাচীন কলকাতার রীতি অনুযায়ী প্রতিবেশীর বাড়ির পাশে রোপিত এই রোগ নিরাময়কারী গাছটি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ। গাছটি সারাক্ষণ হাওয়া দিচ্ছে ও দুলছে। এর ভেতরে, বাইরে চারিদিকে শত্রুবৃন্দের নিকট থেকে আত্মগোপন করে খেলা করে চড়ুই পাখীরা। আর তার নীচে বসে লোকজন কথাবার্তা বলে, কখনও বা চুপ করে বসে চেয়ে থাকে। কিন্তু শুধু চড়ুই পাখীরাই গাছটির অতিথি নয়। এর উচ্চতম শাখায় কাকের দল ঝুলতে থাকে—যদিও তারা হাসতে পারে না, তাদের বেশ কৌতুক বোধ আছে। আমরা এইসব কলহকারী কাকেদের খুব বেশী নজরে আনি না, যদিও বেশ জানি, আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তারা নিরন্তর কৌতূহলী, এবং বন্ধুভাবে প্রণোদিত হোয়ে প্রায় আমাদের সতর্ক করে এবং নিজেদের জীবন ধারা সম্বন্ধে জ্ঞানদানও করে থাকে। তাদের ধরন দেখলে মনে হয় যে, আজ তারা সংবাদ হিসাবে যা পাঠাচ্ছে, সম্ভব হোলে আগামী কাল তাই পরিণত হবে উপদেশে। কবুতরেরাও আসে,—তারা বাস করে নীচের তলায় সামনের উঠানে, এবং অনেক সময় সারারাত বক বকম্ শব্দ করে কথাবার্তা বলে। হয়তো কখনও একটা মাছরাঙা একলা এল এবং সপ্তাহ দুই ধরে প্রত্যেকদিন একই জায়গা থেকে একই সময় তার সুউচ্চ সুস্পষ্ট ডাক ভেসে আসে তারপর কখন আবার উড়ে চলে যায়। কিন্তু আমরা সবচেয়ে ভালবাসি ছোট ছোট টুনটুনি পাখীগুলিকে,—এরা সংখ্যায় অগণিত, চড়ুই পাখীর থেকেও অনেক ছোট—তারপর দু-এক সময় আসে ময়না, আসে মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে নীচে নেমে আসা দোয়েল—নাম-না-জানা আরো অনেক পাখীকে সঙ্গে নিয়ে। হাঁ, যখন খুব ভোর বেলায় বা শেষ বৈকালে

আমরা পাখীগুলিকে দলবদ্ধ হোয়ে উড়ে যেতে দেখি—দূরে আরও দূরে উত্তর দিকে, তাদের শুভ্র বক্ষে ডানার তলায় সূর্যালোক ঝিকমিক করতে থাকে তখন মনে হয়, এই পক্ষীকুলের কাছে আমাদের বাসস্থান যদি কোনও ভাবে চিহ্নিত হোয়ে থাকে তাহলে তারজন্য আমাদের প্রতিবেশী এই নিমগাছটির কাছেই আমরা ঋণী। একমাত্র তারই অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের জন্য আমরা পাখীদের জীবনে ও তাদের পরামর্শ সভায় স্থান পেয়েছি।

যত সামান্যই হোক্ ভারতে এই প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে যে, গৃহস্থের বাড়িতে যে সব পাখী ও ক্ষুদ্র প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সকলেই পুণ্যবান। এরা হোল সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর অনুচর, সুতরাং তাদের আগমন সেই দেবীর সান্নিধ্যের ইঙ্গিত বহন করে। পীত বসন পরিহিত এক ফকীর একদিন আমাদের সঙ্গে বসে নীরবে এই সব প্রাণীর ভালবাসা, কলহ, চড়ুই পাখীদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ক্ষমা লক্ষ্য করছিলেন। তারপর সহসা গভীর চিন্তা থেকে উত্থিত হোয়ে বলে উঠলেন, 'আঃ কী সুন্দর, শাস্ত্রের অনুশাসন ছাড়াই এরা এমন ভাবে বেঁচে আছে!'

আমাদের চত্বরের দেওয়ালটি একটি কোণ সৃষ্টি করেছে যার উপর ফুলের ঝাড় ও লতা বেয়ে উঠেছে। তারপরে পশ্চিম থেকে দেওয়ালটি ঘুরে উত্তরে চলে গেছে। এই জায়গাটি সঙ্কীর্ণ, কারণ এখান থেকে বসবাসের ঘরগুলি শুরু হয়েছে। এই প্রান্তে ঘুলঘুলি দেওয়া দেওয়ালটি যেন পর্দার মতো, যার মধ্য দিয়ে অন্তরাল থেকে মেয়েরা পাড়ার মধ্যেই বাইরের আনন্দময় জগতের যতটা সম্ভব দেখে নেয়। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে দৃষ্টিগোচর হবে যে, দেওয়াল ছাড়িয়ে একটু দূরে ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাগড়ী বাঁধা প্রহরীর মতো একসারি নারকেল গাছ। একটার পর আর একটা এমন ভাবে সাজানো যে, যখন পূর্ব দিকে আলো ফুটে ওঠে, মনে হয় তারা যেন সেদিকে মুখ করে মিছিল করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন সূর্যের আলো গাছের সরল পাতা গুলির তলায় এসে পড়ে, তখন মিনিট দশেকের জন্য একটি আলোর রেখা সেখান থেকে সূর্যের অভিমুখে প্রতিফলিত হয়, মনে হয় যেন উদয় ভানুর উদ্দেশে একটি আলোর বন্দনা নিবেদিত হচ্ছে। তারপর গ্রীষ্মমণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল প্রভার অবগুণ্ঠনে আবার সব ধূসর হোয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে থাকে। কিন্তু নারকেল শাখায় প্রভাতের গরিমার দৃশ্যটুকুই সব নয়। ক্রমে অপরাহ্ণ হোয়ে আসে এবং সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বে পূর্বমুখী সূর্যরশ্মি আবার গাছের মাথায় ঐ সবুজ মুকুটের উপর এসে পড়ে। এবার সূর্যকিরণ নিম্নমুখী বাঁকানো পাতাগুলির উপরদিকে পড়ে। সুতরাং প্রতিদিন দুবার করে এই নারকেলবৃক্ষ শ্রেণী দেবতাকে বন্দনা জানায়। এইরূপ বিশ্বসৌন্দর্য অনুসন্ধান করে দেখতে এবং তাতে সাড়া দিতে হিন্দুগণ অভ্যস্ত। প্রাচীরের আবেষ্টনীর পিছনে অবস্থিত নিভৃত গৃহগুলির মধ্য থেকে দেবতার উদ্দেশে প্রভাতকালীন ও সান্ধ্য আলোর বন্দনার মহান্ দৃশ্য তাঁরা চোখ মেলে চেয়ে ছাখেন।

সকাল ও সন্ধ্যায় পূজার সময়ে প্রতিবেশীদের বাড়ির পূজার ঘর থেকে আমাদের এই চত্বরে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। আবার গোধূলি লগ্নে, চাঁদকে যখন নিমগাছের মাথার উপর স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তখন ক্ষণেকের জন্য অনন্তের আবরণ যেন অনেকখানি অপসারিত হয়, এবং মহৎ চিন্তারাশি মনকে অধিকার করে। আমাদের এই চত্বরটি যেন আত্মার নিরাপদ আশ্রয়, নীরবতা-পূর্ণ, জগৎ থেকে দূরে ও অন্তরালে অবস্থিত। নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত মধ্যরাত্রে, কিংবা দিনের বেলায় প্রাচীরের ছায়াতলে বসে, অথবা দরজার পাশে সূর্যের আলোয় চলাফেরা করার সময় ক্রিভেলীর দেবদূতের কথা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব, অথবা মানুষের অন্তর্লোকে দেবতার আবির্ভাবের জন্য সব কাজ ফেলে, অর্ধ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়।

চিতোর

চিতোরের দুর্গ যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। দুর্গপাদদেশের গ্রামগুলিতে আলো নিভে গেছে এবং সুদীর্ঘ পাহাড়টি আকাশের গায়ে, অন্ধকারে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থিত। পাহাড়টির গো-মুখের (Cows Mouth নামে ফাটল) প্রায় ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে রাণা কুম্ভের বিজয় তোরণ, যেন ঊর্ধ্বে অতীত গৌরবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। পর্বতগাত্রে যে তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া বিস্তৃত প্রাচীর বেঁকে চলে গেছে, তার অস্পষ্ট বক্র রেখাগুলি অন্ধকারেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিঃশব্দে আমরা মাইলখানেক দূরে একটা নীচু পাথরের উপর বসে সেই দৃশ্যের মধ্যে তন্ময় হোয়ে গেলাম। হয়তো এইভাবেই প্রাচীন যুগেব কোন রাজপুত তার যাত্রার প্রথম অথবা শেষ দিনে প্রিয় স্বদেশের দিকে নির্নিমেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকত। হয়তো পদ্মিনীও তাঁর অদৃষ্ট নিয়ামক এই নগরের প্রতি এই ভাবেই প্রথম দৃষ্টিপাত করেছিলেন!

যে গাথাগুলির জন্য চিতোর প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তাদের মধ্যে বেশ একটা পারম্পর্য নেই। শত শত বৎসর ধরে প্রচলিত যে আশ্চর্য বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর দ্বারা চিতোরের ইতিহাস পরিপূর্ণ তার কোন কোনটি মৃদু দীপ্তিতে, এবং কোনটি বা আলোর ঝলকে আকর্ষণীয়। চিতোরের অতীত কল্পনা করার প্রয়াসকে সমতলভূমি থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে পার্বত্য-শীর্ষদেশে আরোহণ করার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বার বার গাছপালা ও পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে রাজপুত গোষ্ঠীপতিদের নিশানগুলি দেখা যায়, আবার বার বার সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হোয়ে যায়। যেখানেই ইতিহাসের কুহেলিকা অপসৃত, সেখানেই প্রাচীন যুগের নারীকুলের সাহস ও আত্মগৌরব এবং পুরুষজাতির কীর্তির আদর্শ উদ্ঘাটিত। চিতোর

কেবল সন তারিখ সাজানো ঐতিহাসিক বিবরণীমাত্র নয়, সে ভারতীয় প্রতিভার এক বিশেষ অবস্থার অন্তরতম প্রদেশ—এক শাশ্বত প্রতীক।

ভাস্কর্যের দিক থেকে এই শহরের জাঁকজমক তার গৌরবকে সমর্থন করে। যে পর্বতের উপরে চিতোর অবস্থিত সেটি চারদিক থেকে ভিতরের দিকে ঢালু, যার ফলে দেখা যায়, সেখানে অসংখ্য জলাশয় এবং তার জলসরবরাহ প্রায় অপর্যাপ্ত। প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষগুলি প্রকৃতপক্ষে দুটি নগরীর—একটি উত্তর-পূর্বদিকে,—বাপ্পারাও-এর পূর্ববর্তী প্রাচীন রাজধানীর—অপরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক—যে নগরটি ৭২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ বাপ্পারাও-এর সিংহাসন আরোহণের পর এবং আকবরের আমলে তাঁর বংশের সিংহাসনচ্যুতি এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে নির্মিত।

অষ্টম শতাব্দীতে জমিদারির অন্তর্ভুক্ত যে প্রাচীন গোলাবাড়ির বারান্দায় বসে বাপ্পা রাওল (Bappa Raoul) বিচারের কার্য পরিচালনা করতেন, তার সঙ্গে প্রাসাদ সম্পর্কীয় আমাদের আধুনিক ধারণা কদাচিৎ খাপ খায়। ঠিক এর সামনেই অদূরে একটি বিজয় তোরণ যা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং সর্বত্র প্রথম দুর্গের ভিত্তি-প্রস্তরগুলি যথাযথ অবস্থায় কাছেই দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রা আশ্চর্যভাবে তাঁবুর মধ্যস্থ জীবনযাত্রার অনুরূপ। এই চূড়াবহুল পর্বতগাত্রে অবস্থিত দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত চিতোরকে দেখে মনে হবে যেন একটি শীর্ণ ধূসর বর্ণের সিংহ লাফিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। শত শত বৎসরেরও পূর্বে পদ্মিনীর বিবাহকালীন শোভাযাত্রা স্বদেশ অভিমুখে অগ্রসর হোয়ে শেষবার যেখানে থেমেছিল এবং সশস্ত্র রক্ষীদল ফিরে যাবার আগে যেমন করে সেখান থেকে চিতোরকে দেখেছিল, ঠিক তেমনভাবে আজ রাত্রে সদ্য আগত

পর্যটক তাকে নিরীক্ষণ করতে পারে। এখন যেমন, তখনও তেমনি সুদীর্ঘ প্রাচীর তাঁবুর ক্যানভাসের (Canvas) মতো শহরটিকে আদরের সঙ্গে বেষ্টন করে রেখেছিল। শ্বেতপদ্মের (Lotus Fair) মতো পদ্মিনী নিশ্চয়ই সুদূরবর্তী পিতার দুর্গ থেকে যাত্রার সেই শেষ রজনীতে নিদ্রা যেতে পারেননি! যে দুর্গে আগামী কাল তিনি নববধূ ও সম্রাজ্ঞীরূপে প্রবেশ করবেন, আজ রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সেই দুর্গ-প্রাকারের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং দুর্গ রক্ষার জন্য প্রাকারস্থিত ঐ বুরুজ ও মিনারের সঙ্গে বিজড়িত গাথাগুলির স্মৃতিচারণেই তন্ময় ছিলেন! তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল ভারতীয় পত্নীর সেই সুগভীর বিশ্বাস—নিজের সম্বন্ধে যিনি মনে করেন, তিনি যেন প্রাচীন কাহিনীর এক নূতন অধ্যায় মাত্র। যেন এই কিছুক্ষণ পূর্বেও যে সূত্রটি হাতে ধরা ছিল, অথচ মৃত্যুতে পরিত্যক্ত, সেটি পুনর্বার খুঁজে পেয়েছেন। আগামী কালই তাঁরা (পতি ও পত্নীরূপে) প্রথমবার সম্মিলিত জীবনযাত্রার উদ্যোগ করছেন তা নয়, এ যেন জন্মজন্মান্তর ধরে দুটি আত্মার মিলন। সেই মহান্ পতিগৃহে প্রবেশের গৌরব মুহূর্তে ভবিষ্যতের কোন আশঙ্কার আভাস বা ছায়া কি তাঁর যাত্রা পথে পড়েনি? যা দেখে পদ্মিনী সঙ্কুচিত হয়েছেন, বা যাত্রা বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়েছেন? ভবিষ্যতে যে বিষাদময় কীর্তি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল, শৈশবে কোনও চারণ কবি কি তাঁকে তার ইঙ্গিত দেয়নি? তিনি কি তখন জানতে পেরেছিলেন যে, যতদিন চিতোরের উপর দিয়ে বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাবে ততদিন তারা তাঁরই বন্দনা গাইবে; এবং সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত বিশ্ববাসীর মনে চিতোরের প্রতি প্রস্তর খণ্ড, প্রতি অট্টালিকার সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত থাকবে! রাজপুত জাতির গৌরব অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর সামনে আর কোনও পথ ছিল না। এই কথাই কি সব সময়ে বলা হয় না যে, জন্ম মুহূর্তে বালকের চক্ষু ছুরিকা ও বালিকার দৃষ্টি প্রদীপের উপর

নিবদ্ধ থাকে? কারণ পুরুষ বীরের মতো তরবারি অবলম্বনে এবং নারী তার সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নি আলিঙ্গন করে জীবন বিসর্জন দেবে।

গোপালের মা : বালখৃষ্টের জননী

ভারতীয় ভাষা কোমল ছোট ছোট ভাবব্যঞ্জক শব্দরাশিদ্বারা অদ্ভুত ভাবে সমৃদ্ধ। ঐ শব্দগুলির ব্যবহার বিশেষ সম্পর্কের ওপর এতই নির্ভরশীল যে, তাদের ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদি আমরা তিন বৎসর বয়স্কা কোন বালিকাকে 'মা' অথবা ঐ বয়সের একটি বালককে 'বাপ' বলে সম্বোধন করি, তার মধ্যে গাম্ভীর্য ও কৌতুকের যে সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ আমরা প্রকাশ করতে চাই, তা একান্তভাবে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে। কোন বিদেশী ভাষায় তাদের রূপান্তরিত করবার প্রয়াস ব্যর্থ না হোয়ে পারে না। এই জাতীয় চিত্তাকর্ষক শব্দগুলির অন্যতম হোল 'গোপাল'। 'গোপাল'-এর আক্ষরিক অর্থ রাখাল বা গো-পালক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'গোপাল' শব্দে বৃন্দাবনের কৃষ্ণকেই বোঝায়। শব্দটি অর্থের সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত যে, ইংরেজি ভাষায় তার প্রকৃত তাৎপর্য হোল বালখৃষ্ট (Christ-Child)। যে নারী তাঁর শিশুপুত্রকে 'গোপাল' সম্বোধন করে অন্তরের আবেগে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেন, তাঁকে কেবল সেই রকম ইংরেজ জননীর সঙ্গেই তুলনা করা যায়, যিনি ভাবেন, তাঁর শিশু যেন বালখৃষ্ট, নিশীথে ঝড়ের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর কাছে নানা আবদার করবার জন্য। এই অর্থে আমাদের ঘরে ঘরে সকলের মুখে 'গোপাল' নামটি শোনা যায়। আমাদের অন্তঃপুরের একটি কক্ষে এক বৃদ্ধা রমণী বাস করেন—তিনি গোপালের মা বা বালখৃষ্টের জননী বলে পরিচিত।

* * *

সারারাত্রি ধরে আমরা মৃত্যু পথযাত্রীর অতি ক্ষীণ গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করছিলাম। গভীরে, গভীরে আরো গভীরে শ্বাস যেন ক্রমশঃ রুদ্ধ হোয়ে আসছিল, মনে হয় ঐ বার্ধক্য-পীড়িত

দেহে জীবনের লক্ষণ আর দেখা যাবে না, কিন্তু তারপরেই শ্বাসমুক্তি, আবার পর পর কয়েকটি দ্রুত শ্বাস গ্রহণ। সবাই বলছিলেন, এই ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাস কদাচিৎ দেখা যায়—সুদীর্ঘকাল প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল। ঐ প্রাণায়াম বৃদ্ধা রমণী নিজের অজ্ঞাতসারেই জপমালা হাতে দিবারাত্র তাঁর ইষ্ট-মন্ত্র 'গোপাল' জপ করে অভ্যাস করেছিলেন।

যাঁর পাশে আমরা বসেছিলাম এবং সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করছিলাম তিনি হলেন গোপালের মা—সেই শ্রেষ্ঠ সাধিকা যাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মাতৃবৎ জ্ঞান করতেন।

কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না করে সারাজীবন যে ভাবে কাটিয়ে এসেছেন, এখনও ঠিক সেইভাবেই শায়িত—চিত্ত সেই চিন্তায় সমাহিত—যা তাঁর জীবনসর্বস্ব, অন্তিম মাধুর্য ও শান্তিতে পরিপূর্ণ আনন। এইভাবে গঙ্গাতীরে একদিন একরাত্রি তিনি শুয়ে আছেন। আমরা যখন তাঁকে নিয়ে বাড়ির দরজার বাইরে পা দিই, আকাশে তখন দেখা গিয়েছিল পূর্ণচন্দ্রের উদয়। পার্থিব বন্ধনের প্রথম আবেষ্টনী গৃহবন্ধনকে যখন তিনি জয়োল্লাসের সঙ্গে ত্যাগ করলেন, সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম, তাঁর আত্মা নীরব ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করছে। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে যখন পৌঁছলেন, উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে শীতল সমীরণ সঞ্চারের মধ্যে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন, তখন আবার তাঁর মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল—সচরাচর মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় না। তারপরে শেষবারের মতো নির্বাপিত হবার পূর্বে কয়েকঘণ্টা ধরে তাঁর জীবন-প্রদীপ জীর্ণ দেহাধারে প্রজ্বলিত রইল।

সম্ভবতঃ তিনি সম্পূর্ণভাবে অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন না, কারণ তাঁর দৃষ্টি যাদের অনুসরণ করছিল, তাদের মনে হয়েছে তিনি যেন চিনতে পারছেন। আর শেষ প্রভাতে যখন এক ব্রাহ্মণ এসে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবেই

সাড়া দিলেন, যাকে প্রায় উত্তেজনার প্রকাশ বলা চলে। নব্বই বছরের বার্ধক্যহেতু মৃত্যুকালে তাঁর জীর্ণ দেহ অবশেষে পুনর্বার শৈশবাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। সারা জীবন তিনি দিব্য শিশু গোপালের সাধনা করে এসেছেন, এ যেন তারই উপযুক্ত পরিণাম। এ অবস্থায় কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মৃদু সঞ্চালন বা একটু মাথা হেলানোর মধ্য দিয়েই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ করা সম্ভব ছিল।

কিন্তু এও কিছুক্ষণ পূর্বের কথা। আবার রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। স্থিরভাবে বহুক্ষণ শায়িত, চিত্ত অন্তর্মুখী, শান্তিতে পূর্ণ—কারণ এ জগতে তাঁর কোন প্রত্যাশা ছিল না।

আমরা—প্রতীক্ষারত মেয়েরা, কাছে বসে শুনতে পাচ্ছি ঘাটের সিঁড়ির শেষধাপে আছড়ে পড়া গঙ্গার দীর্ঘ মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মধ্যে মধ্যে নদীর তরঙ্গের উপর বয়ে যাওয়া বর্ষাভারাক্রান্ত বাতাসের মৃদু বিলাপ ধ্বনি। এবং একবার—তখন কি মধ্যরাত্রি, অথবা ঘণ্টাখানেক, কিংবা তারও পরে? নীরবতার মধ্যে মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের নীচে নদীতে সহসা তীরবেগে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে এল, নোঙর করা ছোট ছোট নৌকাগুলির মধ্যে পরস্পর ঠোকাঠুকি লেগে গেল, রব উঠল—'জোয়ার আসছে'। কয়েকজনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল,—পরপারের যাত্রী একাধারে তাঁদের বন্ধু ও গুরু। জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি এই আশঙ্কাই করছিলাম না যে, এইবার তিনি চলে যাবেন, তাঁর বাসভূমি, পরিচিত ব্যক্তিগণ আর তাঁকে ফিরে পাবে না?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল একভাবে। কোন পরিবর্তন নেই। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কেউ কেউ উঠে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে ছোটখাট সযত্ন পরিচর্যায় ব্যাপৃত হলেন। একজন একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য শুয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ একটা চাঞ্চল্যের আভাস, একটা মৃদু করস্পর্শ নিদ্রিতকে জাগিয়ে দিল। একজন বললেন, 'বাহকদের ডাক, শেষ সময় এসে গেছে।' সিঁড়ির ওপর ঘাটের

চত্বরে বাহকরা বসেছিলেন। সারারাত্রি বসে তাঁরা অতীত প্রসঙ্গ ও এই পরলোকযাত্রীর যে সব মহান্ ব্যক্তির সঙ্গে যোগসূত্র ছিল তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সুতরাং অবিলম্বে তাঁদের ডেকে আনা সহজ ছিল। মুহূর্তকাল পরে গৈরিক ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিত বাহকগণ মুমূর্ষু দেহখানি খাটিয়ায় তুলে কাঁধে করে দ্রুত ঘরের বাইরে উত্তর দিকে নিয়ে এলেন, তারপর সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে গঙ্গাতটে এমনভাবে রাখলেন, যাতে শায়িত অবস্থায় গোপালের মার পদদ্বয় গঙ্গার পবিত্র বারি স্পর্শ করতে পারে, তারপর তিনি চলে যাবেন।

সেইখানেই তিনি শায়িত ছিলেন—কিছুক্ষণ অন্তর শেষ নিঃশ্বাস সহজভাবে পড়ছিল। বাল্যকাল থেকে গোপালের মার পরিচিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কপালে কপাল ঠেকিয়ে অস্ফুট মৃদুস্বরে অন্তিমকালে হিন্দু যে মন্ত্র শুনতে ভালবাসে—সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন : ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! এক মুহূর্ত পরে যাঁরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে বসেছিলেন তাঁদের একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—'হরিবোল'! কারণ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গোপালের মার আত্মা ঊর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করেছে, শরীর পড়ে আছে পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো।

খাটিয়ার মাথার দিকে যিনি ছিলেন মেঘের পিছনে স্বচ্ছ হোয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভোর হোয়ে এল কি?' পায়ের দিক থেকে উত্তর এল, 'হাঁ, তাই বটে, ভোর হোয়ে এসেছে।' নীচের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখলাম, যে জলধারা এতক্ষণ মৃত্যুপথযাত্রীর চরণ ধৌত করে বয়ে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যেই তা সরে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেছে। গোপালের মা ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন—পূর্ণ জোয়ার অবসানে ভাঁটার মুখে।

সতী

পুরাকালে দক্ষ নামে এক দেবতা ছিলেন। তিনি নিজেকে দেবতা ও নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। একবার এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয় এবং সেই সভায় শিব ব্যতীত অন্যান্য দেবতারা দক্ষকে যথোচিত সম্মান দেখিয়ে তাঁকে সকলের অধীশ্বর বলে মেনে নিলেন। মহাদেবও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন— ভস্মলিপ্ত, কটিমাত্র আবৃত, একজন সাধারণ ভিক্ষুকের বেশে, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হাতে। কিন্তু তিনি নত হোয়ে দক্ষের পাদস্পর্শ করেননি। কেবল কৃপা পরবশ হোয়েই তিনি প্রণাম করেননি। কারণ, আমরা সকলেই জানি যে, কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি মহৎকে নিজের সামনে অবনত হোতে দেখে, তবে তার মতো দুর্ভাগ্য আর নেই। ভারতবর্ষে এমনও বলা হোয়ে থাকে যে, তোমার ভাগ্যে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে তখনি তোমার মস্তক স্বস্থানচ্যুত হবে। সুতরাং দক্ষের প্রতি কৃপাবশতঃ শিব তাঁকে সম্মান জানাতে বিরত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ পরে সব ঘটনাটি বিস্মৃত হন। কিন্তু সেই হতভাগ্য দেবতাটি (দক্ষ) শিবেব মনোভাব বুঝতে অক্ষম হোয়ে সেইদিন থেকেই তাঁকে শত্রুরূপে গণ্য করে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিদ্বেষ করতে লাগলেন।

দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিল। তবে ইতিপূর্বে সকলেরই বিবাহ হোয়ে যায়। বাকী ছিলেন কেবল সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, যিনি তাঁর অশেষ সৎ স্বভাবের জন্য সতী নামে পরিচিত ছিলেন (কারণ 'সতী' শব্দের অর্থ 'হওয়া' বা 'অস্তিত্ব' বোঝায়, এবং সৎ বস্তু ব্যতীত যথার্থ আর কোন্ বস্তুর অস্তিত্ব আছে !)।

অতি সঙ্গোপনে সতী তাঁর সমগ্র হৃদয় মহাদেবের আরাধনায় পূর্ণ করেছিলেন। তিনি শিবমূর্তিকে ভক্তি করতেন এবং দিনের পর দিন জল ও নৈবেদ্য অর্পণ করে প্রার্থনা জানাতেন, যেন

কেবল শিবকে ভালবেসেই তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়।

এমন সময় দক্ষ ঘোষণা করলেন, সতীর বিবাহের সময় উপস্থিত এবং একটি স্বয়ম্বর সভারও আয়োজন করলেন। বেচারী সতী! যখন তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করে মহাদেব বিরাজ করছেন, তখন সে কেমন করে আর কাউকে বিবাহ করতে পারে! কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দিনটি এসে গেল। বিশাল রাজসভায় জমকালো সিংহাসনে নিমন্ত্রিত দেবতাগণ ও রাজন্যবর্গ বৃত্তাকারে সমাসীন হলেন। বরমাল্য হাতে সতী সভায় আগমন করে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সভায় উপস্থিত দেবতা ও নরপতিগণের পার্থক্য সতী বুঝতে পারলেন, কারণ জ্যোতির্ময় দেবতাগণের চোখের পলক বা দেহের ছায়া পড়ে না, কিন্তু নৃপতিগণের পড়ে। এঁদের মধ্যে দেবতা বা নরপতি যাঁকে ইচ্ছা তিনি নির্বাচন করতে পারেন। নির্বাচিত পতি এবং সতীর পিতা উভয়েই সুখী হবেন। রত্ন-অলঙ্কারে তাঁরা ঝলমল করছিলেন। বহুমূল্য বিচিত্র রঙ-এর পোশাকে তাঁদের উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বারবার সতীর দৃষ্টি সর্বত্র যাঁকে অনুসরণ করে ফিরছিল তিনি সেখানে ছিলেন না। সে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! হতাশ হোয়ে অবশেষে সতী সভাগৃহের মধ্যস্থলে স্থিরভাবে দাঁড়ালেন, এবং বরমাল্যটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে বললেন—'যদি আমি যথার্থ সতী হই, তাহলে হে শিব, তুমি আমার এই বরমাল্য গ্রহণ কর।' কী আশ্চর্য! সকলের মাঝখানে সেই মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত!

সতীর পিতা দক্ষ ক্রোধে আস্ফালন করতে লাগলেন, কিন্তু কী-বা করতে পারেন? রাজকন্যার পতি নির্বাচনের উপর কোনও কথা চলে না। সুতরাং বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করতেই হোল। বিবাহের পরে সতীকে নিকটে ডেকে দক্ষ চীৎকার করে বললেন, 'অকৃতজ্ঞ সন্তান! এই ভিক্ষুককে তুমি স্বয়ং পতিরূপে বরণ করেছ। এখন যাও, সেই ভিক্ষুকের পত্নী রূপে তার সঙ্গে বাস

কর ; কিন্তু আর কোনদিন আমার কাছে ফিরে এসো না, বা আমার মুখ দেখো না।'

সুতরাং শিব সতীকে কৈলাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে সতী অনেক বেশী সুখ লাভ করলেন, যা তিনি কৈশোরের প্রার্থনা ও স্বপ্নের ভিতর দিয়েও কল্পনা করতে পারেননি। যাই হোক একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁর গৈরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হোয়ে যেন একটা গুরুতর সংবাদ বহন করে এনেছেন এইরূপ বেশ গর্বিতভাবে কৈলাসে উপস্থিত হলেন।

নারদ শিবের কাছে গেলেন। ব্যাঘ্রচর্মে সমাসীন শিব তখন গভীর ধ্যানমগ্ন। বাক্যালাপের উদ্দেশ্যে নারদ তাঁর নিকট উপবেশন করলেন। অবশেষে ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত শিবের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া মাত্র তিনি বললেন, 'আপনার শ্বশুর দক্ষ এক মহোৎসবের আয়োজন করেছেন। রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গ নিমন্ত্রিত হয়েছেন।'

কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই শিব উত্তর দিলেন, 'বাঃ বেশ!'

নারদ কৌতূহলের সঙ্গে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'তিনি আপনাকে কিন্তু আমন্ত্রণ করেন নি।'

শিব বললেন, 'না, তা করেন নি। ভালই হয়েছে না?'

বিমূঢ় হোয়ে নারদ বলে উঠলেন, 'সে কী! দেবাদিদেব মহাদেবকে উপস্থিত হোতে আহ্বান না করে এতবড় রাজকীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আপনি কি অপমানিত বোধ এবং এটা ধর্মবিগর্হিত কাজ বলে মনে করছেন না?'

ক্লান্তস্বরে শিব বললেন, 'আঃ, লোকে যদি আমাকে এইসব থেকে রেহাই দিত, তাহলে জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করার দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে আমি অনন্ত ধ্যানে মগ্ন হোয়ে যেতাম!'

নারদ দেখলেন, শিবের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তায় কোন

মজা পাওয়া যাবে না। তাঁকে শাস্তিতে থাকতে দেওয়ায় মহাদেব তাঁর শ্বশুরের উপর অতিশয় কৃতজ্ঞ।

অতএব নারদ চললেন সতীকে সংবাদটি দেবার জন্য। তৎক্ষণাৎ সতীর স্ত্রীজাতিসুলভ কৌতূহল জাগ্রত হোয়ে উঠল। নারদকে হাজার রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হোল। আয়োজন কেমন চলছে, অতিথিদের সংবাদ কী, ঠিক কিভাবে যজ্ঞ ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হবে ইত্যাদি সব সতী জানতে চাইলেন। অবশেষে 'আমিও নিশ্চয় যাব' এই বলে সতী স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, এবং নারদও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত মনে ত্বরিত গতিতে প্রস্থান করলেন।

এদিকে কৈলাসে সতী নিভৃতে শিবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'আমি উৎসব দেখতে যেতে চাই'—সতী বললেন।

শিব উত্তর দিলেন, 'কিন্তু তোমাকে তো নিমন্ত্রণ করেনি ?'

সতী অনুনয় করে বললেন, 'পিত্রালয়ে যাবার জন্য কন্যার কোন নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না।'

শিব বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু প্রিয়ে, তোমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না। যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তারা তোমাকে ভয়ঙ্কর অপমান করবে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।'

তখন মহাদেবের চোখের সামনেই দেখতে দেখতে সতীর মুখমণ্ডল ও আকৃতি পরিবর্তিত হোতে লাগল। মহাদেব তাঁকে 'কিছুতেই যাওয়া চলবে না' বলে আদেশ জারী করেছেন। এখন সতী তাঁকে দেখিয়ে দেবেন, যে সতী মহাদেবকে ভালবাসেন ও পূজা করেন তিনি যথার্থ কে এবং কি ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর মহীয়সী ও ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করলেন। তিনি দশভূজা, সিংহবাহিনী দুর্গারূপে আবির্ভূতা হলেন—বিশ্বের যিনি সম্রাজ্ঞী, অধীশ্বরী। তিনি দেখা দিলেন জগৎ পালয়িত্রীরূপে। মৃত্যুরূপা ভীষণা কালীমূর্তি ধারণ করলেন। অবশেষে ভীত, কম্পিত মহাদেব

সতীকে নিজের সমকক্ষ জ্ঞান করে স্তুতি করলেন। তখন পুনরায় তিনি কোমলা অনুগতা সতীতে পরিণত হলেন এবং সাধারণ মর্ত্যলোকবাসী পত্নীর মতোই পতির কাছে অনুনয়পূর্বক বললেন, 'প্রভু, আপনি যেমন বলছেন, হয়তো ঐ সব ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু মর্ত্যবাসীর কাছে যথার্থ সতী স্ত্রীর আদর্শ তুলে ধরার জন্য এ সব তো ঘটবেই।' তা ছাড়া জগতের সমস্ত বস্তু ও প্রাণীকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করে আছেন সেই দেবীকে কোন রূঢ় ভাষণ কেমন করে আঘাত দেবে?'

অগত্যা শিবকে সম্মতি প্রদান করতে হোল। পুরাতন অনুচর নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে ভিক্ষুক পত্নীর দীন পরিচ্ছদে ভূষিতা সতী তাঁর পিতা দক্ষের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অবশেষে গন্তব্যস্থলে উপনীত হোয়ে তিনি যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলেন। কয়েক বৎসর পূর্বেব যৌবনসম্পন্না সুন্দরী সতী এখনও সেইরকম যুবতী, বরং অধিক রূপলাবণ্যসম্পন্না— কিন্তু এক অদ্ভুত ছদ্মবেশে সজ্জিতা। সমাগত অতিথিবৃন্দ অট্টহাস্য করে তাঁর সম্বর্ধনা করলেন। এঁরা ছিলেন তাঁরই ভগিনীবৃন্দ। মহার্ঘ রেশমী পরিচ্ছদ ও রত্ন অলঙ্কারে ভূষিতা প্রত্যেকে সিংহাসনে স্ব স্ব পতির বামপার্শ্বে বিরাজ করছিলেন।

সতী দেখলেন, যজ্ঞ গৃহের শেষ প্রান্তে, পুরোহিত ও অমাত্য-বর্গের মধ্যস্থলে দক্ষ তখন যজ্ঞ আরম্ভ করতে উদ্যত। সতী শ্রদ্ধাবনত শিরে পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দক্ষ কিন্তু তাঁকে দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। 'এই যে ভিক্ষুকের স্ত্রী, তুমি এখানে কেন? আমি না তোমাকে অভিশাপ দিয়ে আমার সামনে থেকে দূর করে দিয়েছিলাম?' দক্ষ বলে উঠলেন।

পিতার পাদস্পর্শ করবার অভিপ্রায়ে ভূমিষ্ঠ হোয়ে সতী বিনম্র উত্তর দিলেন, 'পিতার অভিশাপ সুসন্তানের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।' 'সুসন্তান কখনও ভিক্ষুককে পতিরূপে নির্বাচন করে

না'—দক্ষ উত্তর দিলেন। 'তোমার স্বামীটি কোথায়? সেই চোর, দুর্বৃত্ত, শয়তান, অসাধু কন্যা অপহরণকারী?'

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ ততক্ষণে সতী সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন—তাঁর মুখমণ্ডল আরক্তিম। সৌন্দর্য ও মনোবেদনার সংমিশ্রণে তাঁকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। একটি হাত তিনি ঊর্ধ্বে তুলেছিলেন—যেন 'স্তব্ধ হও' কথাটি বলবার জন্য।

সতী বললেন, 'পিতা, পতিব্রতা স্ত্রীর এসব কথা শ্রবণ করাও উচিত নয়। যে কর্ণদ্বয় এই কথাগুলি শ্রবণ করেছে তা আপনার। আপনিই তাদের দিয়েছিলেন—কারণ এ জীবন, এ শরীর আপনারই দান। তাহলে এ সবই ফিরিয়ে নিন। এসব আবার আপনারই হোল। এত অপমানের পর আর এক মুহূর্তের জন্যও আমি এ শরীর ধারণ করব না।'

সঙ্গে সঙ্গে সতীর নিষ্প্রাণ দেহ দক্ষের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। ভীত, সন্ত্রস্ত হোয়ে সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে উঠল। নিজেরই কথার পরিণাম দেখে আতঙ্কিত দক্ষও যেন প্রস্তরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, আর কোন উপায় ছিল না। অশেষ সৌন্দর্যশালিনী পতিব্রতা সতীর দেহপিঞ্জর মুক্ত আত্মা তখন ঊর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করেছে।

সতীর পুরাতন অনুচর নন্দী কৈলাস অভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করলেন—মহাদেবকে সংবাদ দিতে হবে। কিন্তু প্রস্থানের পূর্বে কম্পিত কলেবরে দ্বার দেশে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'দক্ষ, যদি এই কুকীর্তির পরেও তুমি জীবিত থাক, তবে ঐ নরদেহের উপর ছাগমুণ্ড ধারণ করেই থাকতে হবে।' এই সব অলৌকিক মুহূর্তেই মানুষ সত্যদৃষ্টি লাভ করে। এমন কি, ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত পায়।

ঊর্ধ্বে কৈলাসে মহাদেবকে ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত করাই ছিল

কঠিন। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি নন্দীর বক্তব্য শুনলেন ও ঘটনার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করলেন, তখন তাঁর ক্রোধ ও শোক দুই-ই সীমা ছাড়িয়ে গেল। স্বীয় মস্তক থেকে একটি কেশ ছিন্ন করে তিনি সম্মুখস্থ ভূমিতে রাখলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভাব হোল যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক দৈত্যের। শিব সেই দৈত্যকে তাঁর গণ-বাহিনীর সেনাপতি করে দিলেন। তারপর মাথার জটা নাড়া দিতেই জটা থেকে দলে দলে বামন, দৈত্য ও সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব হোল। সেই সব সৈন্যবাহিনী সেনাপতির পশ্চাতে সারিবদ্ধ হোয়ে দাঁড়াল, সেনাপতি দাঁড়াল মহাদেবের পশ্চাতে, তারপর সকলের একত্র যাত্রা শুরু হোল দক্ষপুরীর উদ্দেশ্যে।

সেখানে উপস্থিত হবার পর সৈন্যবাহিনী তাদের কাজ আরম্ভ করে দিল। দক্ষ রাজার শিরশ্ছেদ ও সমগ্র প্রাসাদ ধ্বংস করা হোল।

শিব কিন্তু একেবারে সোজা সেখানে চলে গেলেন, যেখানে নিপতিত ছিল সতীর দেহ। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সতীর দেহ স্কন্ধে তুলে নিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত, এমন সময় ক্রন্দনরতা এক নারী এসে তাঁর পাদবন্দনা করলেন। অবশেষে শোকোন্মত্ত মহাদেবের কর্ণে সে বিলাপধ্বনি পৌঁছল।

তিনি বলে উঠলেন, 'কে আমার পূজা করছ। পরিচয় দাও।'

'আমি সতীর জননী।'

শান্তভাবে শিব বললেন, 'বল মা, তুমি কী চাও ?'

'আমি শুধু চাই তোমার কৃপা ; আমার পতি দক্ষের জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে।'

মহাদেব তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তথাস্তু। সে বেঁচে উঠুক।'

মহাদেবের আদেশে তাঁর অনুচরবৃন্দ দক্ষের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। দক্ষ বেঁচে উঠলেন কিন্তু মুণ্ডহীন, তাঁর ছিন্ন মুণ্ড খুঁজে

পাওয়া গেল না। যজ্ঞের জন্য যে ছাগ বলি দেওয়া হয়েছিল তার মুণ্ডের প্রতি নির্দেশ করে সেনাপতি বললেন, 'এটি বেশ মানাবে।' সঙ্গে সঙ্গে একজন মুণ্ডটি দক্ষের দেহের উপর বসিয়ে দিলেন। সুতরাং নন্দীর কথা ফলে গেল। দক্ষ বেঁচে রইলেন, কেবল তাঁর নরদেহের উপর ছাগমুণ্ড ধারণ করে।

সতীদেহ ধারণ করে মহা শোকে মগ্ন মহাদেব দীর্ঘ পদবিক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলেন। পরিক্রম করলেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। তাঁর চক্ষু থেকে আগ্নেয়গিরির মতো বহ্নি উদ্গীর্ণ হোতে লাগল, তাঁর পদক্ষেপে প্রকম্পিত হোল সর্বলোক। তখন সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করবার জন্য বিষ্ণু এসে দাঁড়ালেন শিবের পশ্চাতে। সুদর্শন চক্র দিয়ে বার বার তিনি সতীর মৃতদেহে আঘাত করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বাহান্নবার আঘাতে দেহটি খণ্ড খণ্ড হোয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হোল। তারপর ভারমুক্ত শিব কৈলাসে প্রত্যাগমন করে পুনরায় নির্জনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

এরপর কেমন করে সতী আবার গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে উমারূপে জন্ম গ্রহণ করলেন, আবার মহাদেবকে লাভ করবার জন্য তপস্যা করলেন, এবং সতীগতচিত্ত মহাদেব উমাকে প্রত্যাখ্যান করে কটাক্ষে মদন ভস্ম করলেন—এ-সব কথাই কী কবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' নামক মহাকাব্যে বর্ণনা করেন নি ?

উমা হৈমবতীর উপাখ্যান

সতী এবার ধরাতলে রাজকন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। নরলোকের দীর্ঘ দিনগুলি দেবলোকের মাত্র একদিন, সুতরাং উমার শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্তি অতি অল্পকালের মধ্যে সমাপ্ত হোল। নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন্। তাঁর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য পুনরায় শিবকে পতিরূপে লাভ, এবং নিত্য তাঁর সঙ্গে বিহার—এ কথা তাঁর স্মৃতিতে জাগরূক ছিল।

মহাদেবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন এবং জামাতারূপে তাঁকে লাভ করে যিনি নিজেকে বিশেষ ধন্য জ্ঞান করতেন, সেই নগাধিরাজ হিমালয়কে তিনি এবার পিতারূপে গ্রহণ করলেন। উমা বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ সদ্‌গুণের অধিকারিণী। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন কর্তব্য এবং শঙ্করের প্রিয় পূত অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি যে কেবল তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তা নয়, পূজা ও অত্যধিক কঠোরতার সঙ্গে উপবাসে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোত। স্বাস্থ্য ভঙ্গ, এমন কি জীবনের আশঙ্কায় ভীত জননী এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে বিরত হবার জন্য তাঁকে অনুনয় করতেন। রাজকুমারী কিন্তু নিজ নিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন। কারণ উমা জানতেন, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী হোলেও—সতীকে বিস্মৃত হোয়ে শিব তাঁর প্রতি কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন—এ কাজটিও তাঁর পক্ষে সুসাধ্য নয়। সুতরাং মন ও বুদ্ধিকে শুচিশুভ্র করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ঐসব কঠোরতা সত্ত্বেও রাজকুমারী দিন দিন অধিকতর সৌন্দর্যময়ী হোয়ে উঠতে লাগলেন। যদি তোমরা উমার বাসস্থান সেই মহিমান্বিত গিরিশৃঙ্গগুলি দেখতে, তবে তোমাদেরও মনে হোত, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেখানে সারারাত্রি ধরে সরলশীর্ষ ঘন দেওদার বৃক্ষগুলি উদার আকাশের গায়ে আন্দোলিত হয়, বনজ গোলাপ

ও রক্তবর্ণ দাড়িম্বকুসুমগুলি বসন্তকালকে পরিপূর্ণ করে তোলে অপরূপ শোভায়। চারিদিকে মনোহর তরুরাজি, সুস্বাদু ফলের প্রাচুর্য এবং অজস্র প্রস্ফুটিত বনফুল। পশুপক্ষী সেখানে বাস করার সৌভাগ্যে অবিরাম জয়গান করে, আর উচ্চে বন্ধুর গিরিচূড়াগুলির উপর তুষারপাত যেমন মহিমময়, নিম্নে শ্যামলিমাপূর্ণ অরণ্যপ্রদেশগুলিও তেমন পরম রমণীয়!

যাঁর দর্শন এবং শ্রবণেন্দ্রিয় এমন মধুর নিসর্গ শোভায় পরিতৃপ্ত তেমন কোন্ কুমারীই বা দিন দিন কমনীয় হোয়ে না উঠবেন এবং প্রকৃতির অধিকতর সান্নিধ্য অনুভব না করবেন?

হিন্দুরমণীগণ প্রশংসিত পাণ্ডুর গৌরবর্ণই ছিল উমার সর্বশ্রেষ্ঠ লাবণ্য। বস্তুতঃ এই বর্ণের জন্য তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আজ পর্যন্ত ভারতে কেবল রাজকুল রমণীগণই সুবর্ণ নূপুর ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁদের চরণ ভূষিত করতে পারেন। প্রজাবর্গ চরণে কেবল রূপার অলঙ্কার পরিধান করে, কারণ উমার গাত্রবর্ণ ছিল স্বর্ণাভ এবং সেজন্য চরণ দ্বারা স্বর্ণ স্পর্শ করা ধর্ম বিগর্হিত।

ক্রমে উমা অষ্টাদশবর্ষে উপনীত হলেন। অপর দেবতাগণও উমার মনোগত অভিলাষ পূরণে উদ্‌গ্রীব হোয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের কারণও ছিল। কিছুদিন পূর্বে সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা এক অসুরের প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করে তাকে অসাধারণ শক্তির অধিকারী করেন। সেই বর-প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান ও গর্বে স্ফীত অসুর ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন দেবগণের সিংহাসন বলপূর্বক অধিকার করে নেবার ভয় দেখায়। দেবগণ তখন ব্রহ্মার নিকট কাতরভাবে সমুদয় নিবেদন করলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁদের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করে প্রশ্রয়ের সঙ্গে মৃদুহাস্যে বললেন, 'আমার সৌহার্দ্য লাভ যে করেছে তার উপর তোমাদের হোয়ে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা কি সেই প্রবাদ বাক্যটি

জান না, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ (এমন কি, বিষবৃক্ষ পর্যন্ত রোপন করে স্বয়ং তাকে ছেদন করা যায় না)?" যাহোক, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখছি, শিব রাজকন্যা উমাকে বিবাহ করবার পর,—এবং উমা ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি বিবাহ করতে পারেন না, একটি পুত্রের জনক হবেন এবং সেই পুত্রই দেব সেনাপতি হোয়ে স্বর্গরাজ্য জয় করবে। অতএব ঐ পরিণয় যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় তোমরা তার চেষ্টা কর। আর তার দ্বারাই সেই দেব সেনাপতির আগমন ত্বরান্বিত হবে।'

স্রষ্টার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর মহাশূন্যে বিলীন হোয়ে গেল। দেবতারা পরামর্শ করতে লাগলেন কী করা কর্তব্য। অবশেষে ঐ সকল দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র—ভারতে প্রেমের দেবতা যে মদন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন।

মদন, তাঁর স্ত্রী রতি এবং বিশ্বস্ত সখা ও সেনা বসন্ত—তিনজনে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধ শুনলেন। ইন্দ্র এই অভিলাষ প্রকাশ করলেন যে, মদন শিবের হৃদয়ে তাঁর অদৃশ্য শর নিক্ষেপ করবেন।

যখন উপলব্ধি করলেন, তাঁর নিকট কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে তখন সেই দীর্ঘদেহী, কান্তিমান তরুণ দেব ভয়ে বিবর্ণ হোয়ে গেলেন। স্বর্গলোকে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রচলিত ছিল যে, সেই দেবাদিদেব সর্বপ্রকার মানবিক হৃদয়দৌর্বল্যের উর্ধ্বে। সুতরাং পার্থিব প্রেমের আঘাতে তাঁকে আহত করার প্রচেষ্টা নিতান্তই ধৃষ্টতা—এমন কি, এই সব সদানন্দ দেবগণের পক্ষেও। আশঙ্কা হোল, মহাদেবের ক্রোধাগ্নি তাঁদের সব উদ্যম ব্যর্থ করে দেবে।

অথচ অম্বরপতি ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ছিল। বহুভাবে তাঁরা ইন্দ্রের নিকট ঋণী ছিলেন এবং তাঁদের আগ্রহ ছিল ইন্দ্রের আদেশ পালন করতে। অবশেষে মদন বললেন, 'বসন্ত যদি অগ্রসর হোয়ে আমাকে সাহায্য করেন, যেমন তিনি বরাবর করে এসেছেন, তাহলে আমি চেষ্টা করতে সম্মত।' এই প্রতিশ্রুতির

পর ইন্দ্র তাদের পরিত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। তবে তিনি সন্ধান দিয়ে গেলেন, কোন্ তরুকুঞ্জে শিবের দর্শন পাওয়া যাবে।

বসন্তকে পুরোগামী করে মদন মহাদেবের অনুসন্ধানে যাত্রা করলেন। বসন্তঋতুর সমাগমে এবং তাঁর হস্তস্থিত দণ্ডের আন্দোলনে অরণ্যের তরুশাখায় হরিৎপত্রের পরিবর্তে নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হোয়ে উঠল। তারপর প্রবেশ করলেন মদন তাঁর সুন্দরী পত্নী রতি সহ, এবং সারা জগৎ উদ্বেল হোয়ে উঠল প্রাণিগণের পরস্পরের ভালবাসায়। পাখীর কলগানে পরিপূর্ণ হোল দিক, বন্য মৃগের দল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অরণ্যের স্রোতস্বিনীতে বারিপানে প্রবৃত্ত হোল, ভ্রমরের গুন্‌গুন্ ধ্বনিতে বাতাস হোল মুখরিত, এমন কি, বসন্তের দাক্ষিণ্যে নিকটতর হোয়ে এল প্রভাবিত কুসুমের মুকুলিত হবার সময়।

সখা বসন্তের অনুসরণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন পুষ্পধন্বা মদন এবং ক্রমে বনের মধ্যস্থলে উপনীত হলেন। সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্য। এক প্রাচীন বিশাল দেওদার ছায়াতলে ধ্যানে বসবার জন্য বিস্তৃত রয়েছে একখানি কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম। পরমুহূর্তে আবির্ভাব হোল এক বৃদ্ধের। শাসনের ভঙ্গীতে হস্ত উত্তোলন করে তিনি বললেন, 'চুপ।' ইনিই নন্দী। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল। মনে হোল, অরণ্যটি যেন শূন্যে অঙ্কিত চিত্র। একটি বৃক্ষপত্র কম্পিত হয় এমন মৃদু বাতাসও ছিল না। তরুশাখা সকল কূজনোদ্যত পক্ষীকুলে সমাকীর্ণ, কিন্তু কোন শব্দ শ্রুত হোল না। পতঙ্গের দল নিশ্চল হোয়ে ডানায় ভর দিয়ে রইল। কামদেবের পুষ্পধনুর আকর্ষণে যে সব মধুমক্ষিকা মধুপান করতে এসেছিল, তারা ঐ শরের উপর আর একটি কৃষ্ণবর্ণের ধনু রচনা করল, অথবা কুসুমনির্মিত তূণটি মৃত্যুর শীতল অবগুণ্ঠনে আবৃত হোয়ে গেল।

তারপর এক শ্বেতমূর্তি মদনের দৃষ্টিগোচর হোল এবং ধীরে

ধীরে সেই আকৃতি দেওদার তরুতলে পরিণত হোল শিবমূর্তিতে—যে শিবের জন্য প্রতীক্ষারত ছিলেন কামদেব। মহাদেব সেই তরুতলে সমাসীন হলেন—নিশ্চল, ধ্যানমগ্ন। তাঁর ললাটের মধ্যস্থলে দেখা গেল বলিরেখার মতো একটি অস্পষ্ট কৃষ্ণরেখা, ঈষৎ কম্পিত। কামদেবের হৃদয় স্পন্দন দ্রুত হোল। তিনি জানতেন, ঐটি হোল মহাদেবের বিশাল তৃতীয় নেত্র, যে কোন মুহূর্তে তার থেকে অগ্নিস্ফুরণ হোতে পারে। কখন যে ঐ নেত্র উন্মীলিত হবে তা তিনি জানেন না। প্রার্থিত সুযোগ উপস্থিত, কিন্তু তখনও মদন শর বর্ষণ করতে সাহসী হলেন না, কারণ নিকটে এমন কেউ ছিল না, যাকে উপলক্ষ্য করে তিনি মহাদেবের প্রতি প্রেমের শর নিক্ষেপ করতে পারেন। ক্রমে ক্রমে সেই অরণ্যে নন্দী প্রভাবিত নিঃস্তব্ধতায় প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মদন দেখলেন, তাঁর অভীপ্সিত নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। অদৃষ্টপূর্বা অপরূপ সৌন্দর্যশালিনী এক কন্যা কাননে প্রবেশ করলেন। পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিহিতা সেই কন্যার আচার আচরণ মহিমান্বিত, রাজকন্যা-জনোচিত। তিনি ছিলেন উমা, হিমালয় দুহিতা; মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালীন পূজা নিবেদন হেতু তাঁর আগমন।

উমা যখন মহাদেবের পাদমূলে উপনীত হলেন, কামদেব তখন অবস্থান করছিলেন বৃক্ষের অন্তরালে। শিবের সান্নিধ্যে তন্ময় গৌরী মহাদেবের সম্মুখে প্রণতা হওয়া মাত্র শিব পূজারিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মৃদু হাস্য করলেন।

সেই মুহূর্তে দুঃসাহসী কন্দর্প শরাসন আকর্ষণ করে লক্ষ্য নির্ণয়ে উদ্যত হলেন। ক্ষণকালমাত্র—কিন্তু সেই ক্ষণকালের মধ্যেই চকিতে মহাদেবের মনে হোল ঐ কন্যার অধর অতি রক্তিম। অতঃপর চিন্তাটি নির্দিষ্ট রূপ নেবার পূর্বেই এক আতঙ্ক তাঁকে অভিভূত করে ফেলল এবং তাঁর তৃতীয় নয়ন বিস্ফারিত করে এই বৃথা আবেগের কারণ অনুসন্ধান করলেন। মুহূর্তমাত্র—তারপরেই

শরবর্ষণে উদ্যত স্পর্ধিত দেবতার স্থানে পড়ে রইল মনুষ্যমূর্তির আকারে একমুষ্টি ভস্ম।

ধীরে ধীরে মহাদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেওদার বৃক্ষতল থেকে অপসৃত হোল। উমা একাকী তাঁর পূজা উপচার সহ প্রণতা রইলেন।

সহসা করুণ আর্তস্বরে বনবীথি পরিপূর্ণ হোয়ে উঠল। রুদ্রদেবের চকিত রোষাগ্নি মদনের সঙ্গে তাঁর পত্নী রতিকে ভস্মীভূত করেনি —সুতরাং রতির শোক সান্ত্বনার অতীত। তিনি পতির সখা বসন্তকে চিতা প্রস্তুত করবার জন্য আহ্বান করলেন, মৃত্যুবরণ করে তিনি স্বামীর অনুগমন করবেন। সেই মুহূর্তে অরণ্য প্রতিধ্বনিত করে ইন্দ্রের অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'হে সুন্দরি, অবিবেচকের মতো কাজ কোর না। তোমার স্বামীর নিকট থেকে তুমি কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছ সত্য, কিন্তু সে যে কাজ আরম্ভ করেছিল, কয়েকমাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে। পার্বতীর সঙ্গে বিবাহের পর শঙ্কর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোয়ে মদনকে পুনর্জীবিত করবেন। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা কর।' বসন্তও ইন্দ্রের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে রতিকে অপেক্ষা করতে বললেন।

অরণ্যে একাকিনী পরিত্যক্তা উমা উপলব্ধি করলেন, তাঁর রূপলাবণ্য একলহমার জন্যও স্বামীকে তাঁর 'সতীরূপ' বিস্মৃত করাতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং তাঁকে আরও মর্মস্পর্শী আবেদন জানাতে হবে, এবং সম্পূর্ণ অন্য উপায়ে।

রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে লোকালয় থেকে বহুদূরে পর্ণকুটীরে উমা বাস করতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র পরিধেয় হোল শুষ্কতৃণ মেখলা ও বল্কল। সর্বদা শিবনাম জপের বিরতির সময়টুকু মাত্র তিনি অনাবৃত ভূতলে শয়ন করে নিদ্রা যেতেন। অবিরাম জপমালা ঘর্ষণে তাঁর দক্ষিণ বাহু চিহ্নিত ও অবসন্ন হোল। তাঁর সুদীর্ঘ কেশরাশি জটাবদ্ধ হোল এবং আহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হলেন।

এইভাবে উমার অজ্ঞাতসারে বহুকাল কেটে গেল। অবশেষে একদিন এক ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাবার সময় ভিক্ষাপ্রার্থী হোয়ে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হলেন।

নিজে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হোলেও অপরের দারিদ্র্যে সর্বদা মাতার ন্যায় করুণাময়ী উমা ভিক্ষাদানের জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন। ভিক্ষুক কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণের পরেও স্থানত্যাগ না করে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'হে ভদ্রে, কার জন্য তোমার এই কঠোর তপশ্চর্যা? তুমি যুবতী এবং সুন্দরী। আমার মনে হয়, এই তপস্যার জীবন বৃদ্ধ বা হতাশ ব্যক্তিদের জন্য। কার প্রেমে তোমার হৃদয় আকৃষ্ট ও এই জীবন গ্রহণ?'

উমা উত্তর দিলেন, 'আমি শিবকে হৃদয় দান করেছি।' ভিক্ষুক বললেন, 'শিব! কিন্তু তিনি তো এক অদ্ভুত ব্যক্তি, অতি দরিদ্র এবং স্বপ্নবিলাসী! হে দেবি, আশা করি এরূপ উন্মাদ ব্যক্তিকে তুমি হৃদয় দান করনি।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শান্তস্বরে উমা উত্তর দিলেন, 'আঃ, আপনি তাঁর সম্পর্কে না জেনে এইরূপ উক্তি করছেন। মহান্ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ প্রায়শঃ সাধারণ মনের অগোচর। মহাদেবের আচরণ আপনার বুদ্ধির অতীত।'

অবিচলিতভাবে ভিক্ষুক বললেন, 'বিশ্বাস কর, আমি ভাল-কথাই বলছি। তোমার অনুরাগের অযোগ্য এরূপ ব্যক্তিকে লাভ করবার বৃথা চেষ্টায় জীবন নষ্ট কোর না। শিবের চিন্তা পরিত্যাগ কর। এমনকি, তাঁর সম্বন্ধে তোমার সকল ধারণা সত্য হোলেও তিনি তোমার যোগ্য নন।'

প্রতিবাদ করে উমা বললেন, 'আপনি চুপ করুন। যথেষ্ট কথা বলবার অবকাশ দিয়েছি। আর একটি কথাও আমি শুনতে চাইনা।' কথা শেষ করে উমা চলে যাবার উপক্রম করলেন।

গমনোদ্দেশ্যে উমা তাঁর চরণ উত্তোলন করেছেন, তাঁর দৃষ্টি

তখনও ব্রাহ্মণের প্রতি নিবদ্ধ, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের আকৃতিতে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল, যা লক্ষ্য করে রুদ্ধনিঃশ্বাসে নিশ্চল হোয়ে উমা দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশ্চয় দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। উমা নিজ চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু অবশেষে তাঁকে বিশ্বাস করতে হোল। কেবল দেহ লাবণ্য কখনই যা সাধন করতে পারত না, উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সম্মুখে যে ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি আর কেউ নন্—স্বয়ং মহাদেব।

সাবিত্রী

আলসিস্‌টেসের উপাখ্যানের ন্যায় এমন প্রিয় গ্রীক কাহিনী অতি অল্পই আছে। কেমন করে তাঁর স্বামী এ্যাড্‌মিটাস্‌ শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন—এবং যদি তাঁর পরিবর্তে অন্য কেউ মৃত্যুবরণ না করে তবে এক নির্দিষ্ট দিনে এ্যাড্‌মিটাস্‌কেই কাল কবলিত হোয়ে যমরাজ প্লুটোর অন্ধকার রাজ্যে বাস করতে হবে—সে কাহিনী সকলেরই স্মরণ আছে। এ কথাও কেউ বিস্মৃত হোতে পারে না যে, এ্যাড্‌মিটাসের প্রাণরক্ষার জন্য এমন একজন ছিলেন যাঁর পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা বরণ করা ছিল অতি তুচ্ছ। তিনি হলেন তাঁর পত্নী আলসিস্‌টেস্‌। সুতরাং সেই সাহসিনী নারী সূর্যালোকিত পৃথিবী পশ্চাতে রেখে পাতালে মৃত্যুপুরীর উদ্দেশে একাকী যাত্রা করলেন।

এ্যাড্‌মিটাসের গৃহে বেদনা ও শোকের ছায়া নেমে এল। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ও পরদুঃখকাতর এক অতিথির আগমন হোল। তিনি হলেন প্রবলশক্তিমান হিরাক্লিস্‌। এ্যাড্‌মিটাসের দুঃখে কাতর হিরাক্লিস মৃত্যুপুরী গমন করে তাঁর অনুগতা পত্নীর আত্মাকে ফিরিয়ে আনলেন। এইভাবে তাঁর শাপমোচন হয় এবং শমন বা মৃত্যুর অধিপতি স্বয়ং মানব কর্তৃক পরাজিত হন। আলসিস্‌টেস্‌ পুনরায় তাঁর পতি এ্যাড্‌মিটাসের সঙ্গে বহুবৎসর বাস করেন। শস্য যেমন সুপক্ক অবস্থায় শস্যাগারে সঞ্চিত হয়, তেমনভাবে পরিণত বয়সে মৃত্যুর পরে পুনরায় তাঁরা পূর্বপুরুষগণের সঙ্গে স্বর্গে একত্র মিলিত হন।

এই কাহিনীর মাধ্যমে নারী সম্বন্ধে গ্রীক জাতির ধারণা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে অনেকখানি জানা যায়। আমরা জানতে পারি যে, সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং তার পক্ষছায়ায় অবস্থান করলেও প্রেমের শক্তিতে নারী সিংহের ন্যায় সাহসী

হোতে পারেন। পুরুষ যেখানে ভয়ে কম্পিত, নারী সেখানে সানন্দে বিপদ বরণ করতে অগ্রসর হন—এ কথা গ্রীকজাতি অবগত ছিল।

ভারতের শ্বেত অবগুণ্ঠনাবৃত ললনাকুলের শান্ত লালিত্যের মধ্যেও সেই সাহস, সেই শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও সকলে অবগত আছেন যে, যে কোনও একজন ভীরু বালিকা, নিতান্ত সাধারণ মানবের এক সাধারণ কন্যা—সতী বা উমার মতো দৈবী সত্তা সম্পন্না নয়—জগতের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে যার পরিচয় নেই—সেও অন্যকে রক্ষার জন্য সহসা দুঃসাহসী হোয়ে উঠতে পারে। ভারতের জনসাধারণ জানে যে, এমন কোন দুর্দিন নেই যখন যথার্থ সহধর্মিনী তাঁর স্বামীর পাশে এসে না দাঁড়াবেন, এমন কোনও কঠোরতা বা সংগ্রাম নেই, যা তিনি স্বামীর জন্য বরণ না করবেন। অথচ আদর্শ নারী সম্বন্ধে তাঁদের (ভারতীয়গণের) কাহিনী আলসিস্‌টেসের এই কাহিনী থেকে আশ্চর্যভাবে ভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু কোথায় যেন মিল আছে। তোমরা শোন, তারপর নিজেরাই বিচার করবে।

রাজকন্যা সাবিত্রী ছিলেন সুন্দরী এবং অশেষ গুণসম্পন্না। অথচ তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে জগৎ তাঁর পবিত্রতার কথাই স্মরণ করে থাকে। প্রার্থনামন্ত্র যেন স্বয়ং মূর্তি ধরে তাঁর পিতামাতার নিকটে এসেছিলেন। বিবাহের বহুকাল পরেও রাজা অশ্বপতি ও রাজ্ঞীর অদৃষ্টে কোনও সন্তানলাভ ঘটেনি, এবং এই কারণে উভয়েরই মনে গভীর দুঃখ ছিল। উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হোতে চলেছেন। অশ্বপতি প্রতিদিন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে সাবিত্রীমন্ত্র পাঠ করতেন এবং দেবতাদের নিকট একটি সন্তানের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাতেন। একদিন পূজাকালে সাবিত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করবার সময় তিনি গভীর ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হন। সহসা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে এক নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটল—তিনি হলেন

ভারতীয় মন্ত্রগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী। দেবী তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, তিনি ও তাঁর পত্নী একটি কন্যা লাভ করবেন। ঐ কন্যার ভাগ্য অসাধারণ। মন্ত্র অনুযায়ী তাঁর নাম হবে সাবিত্রী। এইরূপে সেই রাজদম্পতির প্রগাঢ় ভক্তির ফল-স্বরূপ রাজকুমারী সাবিত্রীর জন্মগ্রহণ।

অশেষ সৎপ্রকৃতি ও সেই সঙ্গে অসীম শক্তিসম্পন্না সেই কন্যা। অতি ধীর ও করুণাময়ী সাবিত্রীর মধ্যে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য বা নির্বুদ্ধিতার লেশমাত্র ছিল না। প্রতিশ্রুতি পালনে অবিচল, অভাবগ্রস্তের প্রতি আশ্বাসদাত্রী, নির্ভীক, দুরূহ সমস্যার সমাধানে তৎপর সাবিত্রী তাঁর পিতামাতা ও প্রজাগণের সান্ত্বনাস্থল ছিলেন। ক্রমে অশ্বপতি কন্যার বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন। সাবিত্রীর বয়স সপ্তদশ বা অষ্টাদশ হোলেও এ পর্যন্ত তাঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়নি। তাঁর পিতামাতার কোন ধারণা ছিল না যে, অনুরাগের সহিত অপেক্ষমানা রাজকুমারীর পক্ষ থেকে কোন্ রাজকুমারের কাছে বিবাহ্ প্রস্তাবের ইঙ্গিতস্বরূপ নারকেল প্রেরণ করা হবে। এমন সময় সাবিত্রী স্বয়ং একটি প্রস্তাব করলেন। বিবাহ উদ্যোগের পূর্বে তিনি সুদূর তীর্থ পর্যটনে গমন করবেন। মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা জানাবেন; সাধুসন্তদের নিকট উপদেশ শ্রবণ ও তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন; স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যানে মগ্ন হবেন। প্রত্যাগমনের পরেও যদি কোন নির্দেশ না আসে তাহলে বিবাহ সম্বন্ধে স্থির করার যথেষ্ট অবকাশ থাকবে। এ সকল বিষয় বিধিনির্ধারিত। অতএব এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সহসা কিছু স্থির করা সঙ্গত নয়। সকলেই একবাক্যে প্রস্তাবটির প্রশংসা করলেন। তাঁর পিতার অমাত্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মনে করলেন, এই উপায়ে সাবিত্রী ভবিষ্যৎ রাজ্ঞীর উপযুক্ত শিক্ষালাভ করবেন। সমগ্র দেশ দেখতে পাবেন এবং সজ্জন ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার সুযোগ

লাভ করবেন। অন্যেরা দেশভ্রমণের দ্বারা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যলাভের সুযোগের কথা চিন্তা করলেন। তাঁর জনক জননী কেবল জানতেন, যে ভাবে রাজকন্যা তাঁদের কাছে এসেছেন সেই উপায় অবলম্বন করে—অর্থাৎ প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তিনি পতিগৃহে গমন করবেন।

মহা সমারোহে যাত্রার উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হোল। রাজকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলেন শুভ্রকেশ প্রাচীন সভাসদবর্গ। তাঁর পরিচর্যার জন্য প্রেরিত হোল অসংখ্য অনুচর। রাজকুমারী স্বর্ণ-মণ্ডিত, লোহিতবর্ণ, সূক্ষ্ম চিনাংশুকে আবৃত শকটে আরোহণ করবেন, যার মধ্যে অপরের নিকট অদৃশ্য থেকেও তিনি স্বয়ং সব দেখতে পাবেন। অরণ্য ও উপবনে ভ্রমণের জন্য শকটের পরিবর্তে একখানি শিবিকাও প্রেরণ করা হোল। শিবিরের নানাবিধ সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, খাদ্যসম্ভার ইত্যাদি বহন করবার জন্য বহু লোক ও হস্তীবর্গ অনুগমন করল। সেদিন ছিল প্রতিপদ তিথি। সন্ধ্যা-রাত্রে যাত্রা শুরু হোল, যাতে অন্ধকার থাকতেই তপ্ত, শুষ্ক সমতলভূমি অতিক্রম করে তাঁরা প্রাতঃকালে অরণ্যে উপনীত হোতে পারেন। ইতিপূর্বে রাজকুমারী এতদূর ভ্রমণ করেননি। এ পর্যন্ত তিনি রাজোদ্যানে বিচরণ করেছেন। নগর ও তৎসংলগ্ন প্রমোদ কাননে ভ্রমণকালে বদ্ধশকটে আরোহণ করেছেন। এবারকার ভ্রমণ ভিন্ন প্রকৃতির। এবার তিনি এক অভিযানে যাত্রা করেছেন—একাকী, স্বাধীনভাবে। তাঁর মনে হোল, তিনি যেন অনুপ্রাণিত হোয়ে কোথায় চলেছেন। প্রতি পদক্ষেপ যেন আনন্দপূর্ণ এক কর্তব্যের উদ্‌যাপন। পিতামাতার সঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছেদ তাঁর জীবনে এই প্রথম। তথাপি তিনি সুখী। বাতাসে আন্দোলিত বৃক্ষের সারি, উচ্চরবকারী শিবাকুল ও মধ্যরাত্রির আকাশ তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করল। এমনকি, শোভাযাত্রার অগ্রগামী মশাল-চারিগণ যখন গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রের গর্জনে চমকিত তখনও সাবিত্রীর

হৃদয় উদ্বেগশূন্য। এ ধরনের যাত্রায় নক্ষত্র-খচিত আকাশ যেন মহীয়সী মাতৃহৃদয়, এবং সেখানে আমরা অবগাহন করি কোন কণ্ঠস্বর শ্রবণ অপেক্ষা গভীরতর নির্জনতা অনুভব করবার জন্য।

পরদিন প্রভাতে বহুক্ষণ যাত্রার পর অবশেষে তাঁরা এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তীরে অরণ্যপ্রান্তে উপনীত হলেন, যেখানে সাবিত্রী স্নান ও পূজা সমাপনান্তে স্বহস্তে নিজের জন্য সাধারণ আহার্য প্রস্তুত করতে পারেন। অবশিষ্টকাল ঐ স্থানে যাপন করে পবদিন প্রত্যূষে পুনরায় তীর্থযাত্রা শুরু হোল।

বহুমাস এইরূপে অতীত হোল। সময়ে সময়ে তাঁরা কোনও আশ্রমেব সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে শিবিকায় আরোহণ করে সাবিত্রী কোন তপস্বীর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হতেন উপহারাদি প্রদান ও সাধুর আশীর্বাদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে। তাবপর অবগুণ্ঠিতা সাবিত্রী তাঁব সামনে ভূমিতে উপবেশন করতেন, যদি তিনি কোনও উপদেশ প্রদান করেন এই আশায়। তপস্বী মৌন থাকলে তাঁকে নিরীক্ষণ করেই তৃপ্ত হতেন। যেহেতু মহাত্মাকে দর্শন করলেই আঁখি পরিতৃপ্ত হয়!

তাঁর জীবনের সেই পরম লগ্ন ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল—যে পরম মুহূর্ত তাঁর নাম নারীজগতে যুগ যুগ ধরে আদরণীয় করে রাখবে। অরণ্যে ভ্রমণকালে একদিন শিবিকার আস্তরণের মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘকায় শক্তিশালী যুবককে তিনি দর্শন করলেন। যুবকের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে সাবিত্রীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হোয়ে এল। তাঁর এক হস্তে স্কন্ধস্থিত কুঠারখানি ধৃত, অপর হস্তে জ্বালানী কাষ্ঠভার; সর্বাঙ্গে বনবাসীর পরিচয় পরিস্ফুট। অথচ তাঁর আচরণ সাহস ও সৌজন্যে পূর্ণ। যেরূপ শিষ্টাচারের সঙ্গে তিনি সাবিত্রীর অনুচরবর্গের একজনকে সাহায্য করলেন এবং তাদের চলে যাবার জন্য পথপার্শ্বে সবে দাঁড়ালেন, তার থেকে

বোঝা গেল, তিনি অতি উচ্চবংশীয় ও মহানুভব। যুবকের নামধাম ও পিতামাতার পরিচয় সংগ্রহ করা হোল। তারপর রাজকুমারী পরিজনবর্গসহ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন। কারণ সাবিত্রী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, ঐদিন তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি উপস্থিত—অনন্তকাল ধরে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাঁর সঙ্গে তিনি বারবার মিলিত হয়েছেন। সে ব্যক্তি বনবাসী কিংবা কোন নৃপতিও হোতে পারেন। তীর্থভ্রমণ ও প্রার্থনার ফলে তাঁর দৃষ্টি এখন নির্মল ও স্বচ্ছ এবং তিনি চিনতে পেরেছেন, পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি যাঁর পত্নী ছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি—এবং একথাও তিনি জানলেন, অতীতে যা ঘটেছে ভবিষ্যতে তারই পুনরাবৃত্তি হবে। এই ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর পরিণয় সম্পন্ন হবে।

অশ্বপতি রাজসভায় উপবিষ্ট এমন সময়ে তাঁর কন্যা প্রবেশ করলেন। সাবিত্রীর অভিপ্রায় ছিল, পিতার সঙ্গে একাকী সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু কাষায়বস্ত্র পরিহিত নারদ ঋষি নৃপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন এবং নরপতি তাঁর সামনেই সাবিত্রীকে দ্বিধাহীন চিত্তে মনোভাব ব্যক্ত করতে আদেশ দিলেন। প্রথম দর্শনের অভিবাদনাদি সমাপ্ত হোলে পিতা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎসে, কোথায় তুমি বাগ্দান করবে স্থির করেছ কি?' উত্তর দিতে গিয়ে সাবিত্রী লজ্জায় আরক্তিম হোয়ে উঠলেন।

অশ্বপতি আগ্রহসহকারে বললেন, 'বল, সেই যুবকের পরিচয় দাও।' সাবিত্রী ভীরুকণ্ঠে বললেন, 'পিতা, কোন বনভূমিতে আমরা এক যুবকের দর্শন লাভ করেছি, তিনি বনবাসীর জীবন যাপন করছেন। তাঁর পিতা একজন অন্ধ নৃপতি, বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত, অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে অরণ্যে জীবন যাপন করছেন। এই যুবাকেই বিবাহ করতে আমি মনস্থ করেছি। তিনি ধীর, শান্ত, বীর্যবান ও শিষ্টাচারসম্পন্ন,—তাঁর নাম সত্যবান।'

সাবিত্রী তাঁর মনোনয়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে আরম্ভ করা মাত্র নারদ চমকিত ও উৎসুক হোয়ে উঠলেন। কিন্তু সহসা তিনি হস্ত উত্তোলন করে বলে উঠলেন, 'না, না, তাঁকে নয়।'

অশ্বপতি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকালেন। 'কেন নয়?' তিনি বললেন, 'আমার কন্যার যথেষ্ট সম্পদ আছে, উভয়ের জীবন যাপনের জন্য।'

নারদ বললেন, 'না, তার জন্য নয়—সাবিত্রী তাঁকে বিবাহ করলে নিশ্চিত বৈধব্য লাভ করবেন। কারণ সত্যবানের প্রতি অভিশাপ আছে, আজ থেকে দ্বাদশ মাস পরে তাঁর মৃত্যু অবধারিত।'

রাজদুহিতা ভয়ে বিবর্ণ হোয়ে গেলেন। প্রত্যেক হিন্দু নারী স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে নিজের মরণ কামনা করেন। অশ্বপতি তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'বৎসে, এ সংবাদ অতিশয় দুঃখের, তুমি পুনরায় অন্য কাহাকেও নির্বাচন কর।' সাবিত্রী বললেন, 'পিতা, তা হয় না। জীবনে একবারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়। পতিরূপে আমি আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে পারি না। পতিহীনা হওয়া পরিতাপের বিষয়। কিন্তু সত্যবানকে যখন মনোনীত করেছি, তখন আমাকে এই মনোনীত পতির সঙ্গে সর্বপ্রকার অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

রাজা অশ্বপতি ও দেবর্ষি নারদ উভয়েই কথাগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করলেন। পরদিন অশ্বপতি নারকেল সহ দূত বনবাসী রাজপুত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। এর অর্থ রাজার অভিপ্রায় রাজপুত্র তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবান ও তাঁর পিতামাতা সানন্দে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, কেবল একটি শর্ত হোল, বৃদ্ধবয়সে সত্যবানকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সাবিত্রী তাঁদের গৃহে বাস করবেন।

শুভ পরিণয়ের সংবাদ ঘোষিত হোল। মিলনের সাক্ষীস্বরূপ প্রজ্বলিত হোল অগ্নি। রাজকুমারীর বাম মণিবন্ধ অলঙ্কৃত হোল

মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ লৌহ কঙ্কণে; সত্যবান ও সাবিত্রীর উত্তরীয় ও অঞ্চল একত্র গ্রন্থিবদ্ধ হোল এবং উভয়ে পরস্পরের হাত ধরে পবিত্র হোমাগ্নি সপ্তবার প্রদক্ষিণ করলেন। প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর পুরোহিত জাতির সেই প্রাচীন মন্ত্রসকল উচ্চারণ করলেন,—এ জীবন যেন উভয়ের নিকট সৌভাগ্যকর হয়। তারপর তাঁরা প্রস্থান করলেন অরণ্যে, এবং রাজকুমারীর মহামূল্য পরিচ্ছদ ও আভরণাদি পরিত্যাগ করে সাবিত্রী তাঁর নবলব্ধ পিতামাতার অনুগতা প্রিয় কন্যারূপে বাস করতে লাগলেন। কেবল তাঁর স্বামীর প্রতি উচ্চারিত কঠোর দণ্ডাদেশের কথা তিনি কোনক্রমেই বিস্মৃত হোতে পারলেন না। নারদ কর্তৃক উক্ত তাঁর স্বামীর অবধারিত মৃত্যুর তারিখটি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। কারণ সম্ভবতঃ সর্বলোকের মধ্যে মৃত্যুর দেবতা যমই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কদাচ বাক্য ভঙ্গ করেন না, এবং 'মৃত্যুর মতো ধ্রুব' কথাটি ভারতে এমনভাবে প্রচলিত যে, যমকে সেখানে সত্য এবং বিশ্বাসের দেবতা বলেও উল্লেখ করা হয়।

এই চিন্তাতেই মন্দভাগ্য সাবিত্রীর হৃদয়স্পন্দন দ্রুত হোত। তিনি জানতেন, অভিশাপ বিস্মরণের কোন আশা নেই—অর্থাৎ অভিশাপ ফলবেই। সাবিত্রী জানতেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ এই বিষয় অবগত ছিলেন না। স্বামীকে রক্ষা করবার কোন উপায় আছে কিনা তখন তাও সাবিত্রীর কাছে অজ্ঞাত।

সেই অতি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল অবশেষে যখন তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট—তরুণী পত্নী ত্রিরাত্র জাগরণের এক কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। তিন রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় তিনি প্রার্থনায় রত থাকবেন এবং ঐ তিন দিবস তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করবেন না। এই উপায়ে সাবিত্রী এমন এক স্তরে উপনীত হবার আশা করলেন—যেখানে সাধারণ মর্ত্যবাসীর অগোচর বস্তু তিনি দর্শন ও শ্রবণ করতে পারবেন।

অন্ধ নৃপতি ও তাঁর বৃদ্ধা মহিষী তাঁদের নবলব্ধ কন্যাকে এই প্রচেষ্টা হোতে বিরত হওয়ার জন্য বারবার মিনতি জানালেন। কিন্তু সাবিত্রী যখন সহজ উত্তর দিলেন, 'আমি ব্রত গ্রহণ করেছি,'— তখন তাঁরা নিরস্ত হলেন। এ অবস্থায় তাঁর সঙ্কল্প অতি পবিত্র এবং তাঁরা কেবল সাবিত্রীকে সঙ্কল্প রক্ষার জন্য সাহায্যই করতে পারেন। অবশেষে তিন রাত্রি অতিবাহিত হোল, কিন্তু চতুর্থ দিন প্রভাতেও সাবিত্রী আহার স্পর্শ করলেন না। তিনি বললেন, 'রাত্রে আহারের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আজ প্রথম আপনাদের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের পুত্রের সঙ্গে আমাকে বনে গমন করতে ও সারাদিন অতিবাহিত করতে অনুমতি দিন।' পিতামাতার সম্মুখে সত্যবানের নাম উচ্চারণ না করার বিষয়ে সাবিত্রী সতর্ক ছিলেন কারণ তা প্রগলভতা ও অভদ্রতাসূচক। বৃদ্ধ দম্পতি মৃদুহাস্য করলেন। উভয়ে বলাবলি করলেন, 'মেয়েটি অতি সৎ প্রকৃতির। এ পর্যন্ত আমাদের কাছে কিছুই প্রার্থনা করেনি। সত্যবানের সঙ্গে যেতে দেওয়া উচিত। সত্যবান, তুমি আমাদের এই কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করবে।' এই কথা শ্রবণ করে সাবিত্রী তাঁদের পাদস্পর্শ করে স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করলেন।

তিনি পূর্বেই নিরূপণ করেছিলেন, বিপর্যয় ঘটবে মধ্যাহ্নে। সুতরাং সময় নিকটবর্তী হোলে তিনি প্রস্তাব করলেন, অতঃপর আর অগ্রসর না হোয়ে তাঁরা একটি ছায়াবহুল স্থানে বিশ্রাম করবেন। সত্যবান তৃণাদি সংগ্রহ করে সাবিত্রীর জন্য একটি আসন রচনা করলেন। তারপর প্রচুর বন্য ফলে তাঁর ক্রোড় পূর্ণ করে কাষ্ঠ ছেদনে প্রবৃত্ত হলেন।

বেচারী সাবিত্রী বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে লাগলেন, সত্যবান কুঠার দিয়ে বৃক্ষছেদন করে চলেছেন। ক্ষণকাল পরেই কুঠারের শব্দ অস্পষ্ট ও ক্ষীণতর

হোতে লাগল। অবশেষে সত্যবান স্খলিতপদে সাবিত্রীর নিকট উপনীত হোয়ে বললেন, 'ওঃ, মাথায় বড় যন্ত্রণা!' তারপর সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করে তিনি গভীরভাবে অচৈতন্য হোয়ে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে সাবিত্রী বুঝতে পারলেন, কঠোর ও ভয়ঙ্কর এক মূর্তি জঙ্গলের দিক থেকে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। গভীর নিশীথের মতো কৃষ্ণবর্ণ সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—তাঁর এক হাতে ফাঁস দেওয়া একখণ্ড রজ্জু. ক্রমে তিনি সাবিত্রীর সমীপবর্তী হলেন। তৎক্ষণাৎ সাবিত্রী মৃত্যুর অধিপতি ধর্মরাজ যমকে চিনতে পারলেন।

যমরাজ সাবিত্রীর প্রতি সদয়ভাবে মৃদুহাস্য করলেন। 'বৎসে, আমার আগমন সম্প্রতি তোমার জন্য নয়,' বলতে বলতে তিনি নত হোয়ে সত্যবানের আত্মা রজ্জুগ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ করলেন, যাতে তিনি সত্যবানকে তাঁর পশ্চাতে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

যমরাজ যতক্ষণ ঐ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সাবিত্রীর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু যখন তাঁর স্বামীর আত্মা যমরাজের অনুসরণের জন্য উঠে দাঁড়াল, তিনিও আত্মস্থ হোয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠল, করজোড়ে তিনি সত্যবানের সঙ্গে মৃত্যুপুরীতে গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

গমনোদ্যত যমরাজ পশ্চাতে তাকিয়ে বললেন, 'বিদায় বৎসে, শোকে অধীর হয়ো না, মৃত্যুই একমাত্র নিশ্চিত অতিথি।'

বনবীথির মাঝখান দিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। কিন্তু যতই তিনি অগ্রসর হোতে লাগলেন ততই পশ্চাতে স্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন। যমরাজ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সত্যবানের আত্মাকে নিয়ে যাওয়া তাঁর কাজ, সাবিত্রীকে নিয়ে যাওয়া নয়। সাবিত্রী কি করছেন? তিনি কি যমকে অনুসরণ করছেন? যে ভাবে হোক সাবিত্রী কি যমরাজকে দৃষ্টিগোচর করতে সক্ষম? কোন্ শক্তি সাবিত্রীর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিকে এরূপ তীক্ষ্ণ করেছে?

অধিকাংশ মর্ত্যবাসীর কাছে মৃত্যু অদৃশ্য। পিছনে ক্রমাগত শব্দ হচ্ছেই! নিশ্চয়ই তাঁকে কেউ অনুসরণ করছে, তারই পায়ের শব্দ! নির্বোধ বালিকা। সে কি স্বামীকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করছে! আগে হোক পরে হোক, ওকে তো গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে! যাই হোক, তিনি চেষ্টা করবেন নানাবিধ বরদানে বালিকাকে শোকে সান্ত্বনা দিতে। যমরাজ সহসা সাবিত্রীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাবিত্রি, তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত যে কোন বস্তু প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা অবিলম্বে পূরণ হবে। তারপর গৃহে গমন কর।'

সাবিত্রী নত হোয়ে বললেন, 'আমার শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি যেন পুনরায় লাভ হয়।' যমরাজ বললেন, 'তথাস্তু, এবার বিদায়, এ স্থান তোমার উপযুক্ত নয়।' তথাপি পদধ্বনি যমরাজকে অনুসরণ করতে লাগল। অরণ্য ক্রমে গভীরতর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হোয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মনে হোল, যেখানেই তিনি যাবেন সাবিত্রী তাঁর অনুসরণ করতে সমর্থ।

যম বললেন, 'বৎসে, তোমার আর একটি অভিলাষ পূরণ করতে প্রস্তুত। তারপর কিন্তু তোমাকে ফিরতেই হবে।'

সাবিত্রী নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, যম তাঁর প্রতি ক্রমেই সদয় হচ্ছেন এবং তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল, হয়তো যম শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন।

সাবিত্রী উত্তরে বললেন, 'আমার শ্বশুরের রাজ্য ও সম্পদ পুনরায় ফিরে পেতে চাই।'

যম পশ্চাতে ফিরে বললেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে ; এবার যাও।' তথাপি বিশ্বস্ত পত্নী স্বামীর অনুগমন করতে লাগলেন এবং স্বয়ং যমও তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারলেন না। যম ক্রমাগত বরদান করে চলেছেন এবং সাবিত্রীও যে গৃহে তখন পর্যন্ত তাঁর এক বৎসরকালও অতিবাহিত হয়নি, সেই গৃহের

আনন্দের জন্য কিছু না কিছু প্রার্থনা করছেন। অবশেষে যম তা লক্ষ্য করলেন।

আদেশের সুরে তিনি বললেন, 'সাবিত্রি, এবার তুমি নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা কর। তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর কোন বস্তু। কিন্তু এই আমার শেষ বর প্রদান। এই বরদানের পর তুমি আমার সম্মুখ থেকে নির্বাসিত হবে।'

সাবিত্রী বললেন, 'তাহলে এই বর দিন যে, আমি যেন বহু সন্তান লাভ করি এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের সুখী দেখে যেন আমার মৃত্যু হয়।'

যমরাজ আনন্দিত হলেন ও ভাবলেন তাহলে সাবিত্রী তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে উৎসুক। তিনি বললেন, 'অবশ্য, অবশ্য, অতি সৎ আকাঙ্ক্ষা।'

কিন্তু তথাপি সাবিত্রী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন অপেক্ষা করছেন। অবশেষে যম বললেন, 'তোমার প্রার্থনা কি পূরণ করিনি? আর নয়!'

এ কথায় সাবিত্রী গ্রীবা উন্নত করে হেসে বললেন, 'ভগবন, বিধবা পুনর্বার বিবাহ করে না!'

সেই ভীষণ দেবতা ক্ষণেকের জন্য সাবিত্রীর দিকে তাকালেন। মৃত্যুর দেবতা হোয়ে তিনি কী করে মৃতকে পরিত্যাগ করবেন? আবার স্বয়ং ধর্মরাজ হোয়ে সাবিত্রীকে অধার্মিক হোতেই বা প্ররোচিত করেন কেমন করে? মুহূর্তের জন্য তিনি ইতস্ততঃ করলেন, তারপর নত হোয়ে মৃত্যুপাশ খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অরণ্য তাঁর প্রসন্ন হাস্যে মুখরিত হোয়ে উঠল।

তিনি (যম) বললেন, 'যে নর্ভীক হৃদয় মৃত্যুপুরী পর্যন্ত ীর অনুগমন করে স্বয়ং যমরাজের নিকট থেকে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনে, নারীকুলে সে অতুলনীয়া। এইভাবেই দেবগণ মর্ত্য-মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে ভালবাসেন।'

ঘণ্টাখানেক পরে সেই তরুতলে—যেখানে সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে সত্যবান মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়েছিলেন—সেখানেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন। অস্পষ্টস্বরে তিনি বললেন, 'এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, মনে হোল আমার যেন মৃত্যু হয়েছে।'

সাবিত্রী উত্তরে বললেন, 'প্রিয়তম, এ স্বপ্ন নয়। কিন্তু রাত্রি আসন্ন। চল, আমরা শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।'

তাঁরা গমনে উদ্যত এমন সময় তাঁদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাজ অনুচরের কলরবে বনভূমি মুখরিত হোয়ে উঠল। সেই দিনই সত্যবানের পিতা রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংবাদ পেয়েছেন। কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের চিরতরে অবসান ঘটেছে।

সীতার অগ্নি পরীক্ষা

রামচন্দ্রের সমগ্র হৃদয় সীতাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠল। যে প্রভাতে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করে স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, জীবনের সেই প্রভাতের সুন্দর মাধুর্য তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন। অথচ তিনি একজন সাধারণ মানব নন যে, অন্ধ আবেগের বশবর্তী হোয়ে মুহূর্তের খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। দূরদৃষ্টি সহায়ে তিনি বুঝলেন, যদি তাঁদের পুনর্মিলন নিরাপদ করতে হয়, তাহলে তা প্রকাশ্যেই ঘটা উচিত এবং তাঁর পত্নীর মর্যাদা ও পতিভক্তি সাধারণের নিকট এমনভাবে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, যা তাদের মনে চিরস্থায়ী হবে। সীতার প্রতি প্রজাগণের ভালবাসা ও সম্পূর্ণ আস্থা না থাকলে তাঁর সুখ-শান্তি সম্ভব নয়। সর্বপ্রকার সন্দেহ ও নিন্দার উর্ধ্বে সীতার নাম প্রতিষ্ঠিত না হোলে রামচন্দ্রেরও কোন সুখ থাকবে না।

তথাপি তাঁর প্রথম কর্তব্য এ সকল প্রশ্ন সংক্রান্ত নয়। এই মুহূর্তে তিনি এক বিজয়ী সেনাবাহিনীর অধিপতি। তাঁর প্রথম দায়িত্ব হোল স্বীয় সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা ও ধনরত্নাদিসহ নগরকে রক্ষা করা। সুতরাং অবিলম্বে তিনি বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করে লঙ্কার অধীশ্বররূপে ঘোষণা করবার জন্য ব্যস্ত হলেন। তারপর গোপনে হনূমানকে আহ্বান করে বললেন, নব অভিষিক্ত নৃপতির নিকট লঙ্কা নগরী প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। নির্জনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামচন্দ্রের বিজয় সংবাদও জানাতে বললেন।

প্রকাশ্যে তিনি শিষ্টাচার অনুযায়ী বিভীষণের নিকট প্রস্তাব করলেন, তিনি যেন স্বয়ং কোশলেব রাজ্ঞীকে সঙ্গে করে রামচন্দ্রের সম্মুখে নিয়ে আসেন। রাজ্ঞীও রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিত হোয়ে

আসবেন। যে দীন পরিচ্ছদে তিনি অশোক কাননে বন্দিনীর জাবন যাপন করছিলেন, সেই বেশেই পতি সন্নিধানে ছুটে যাবার জন্য পত্নীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় উন্মুখ হোয়ে উঠেছিল। বিভীষণ শান্তভাবে তাঁর পতিব বিশেষ অভিপ্রায় স্মবণ করিয়ে দিলেন এবং ক্লেশকর মনে হোলেও সীতা সে আদেশ শিরোধার্য করলেন। রাজকুমাবীর চলার পথ প্রকৃতই কত না কঠিন! প্রতি পদক্ষেপে যেন নিজ হৃদয়কে দলিত করে তবেই সীতা তাঁর পতিদেবতার সমীপবর্তী হোতে পারবেন।

অবশেষে যথারীতি সুসজ্জিতা রাজ্ঞী সুবর্ণ ও বহুমূল্য রক্ত-বর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত শিবিকায় আরোহণ করলেন,—যে শিবিকা তাঁকে বহন করে রামচন্দ্রেব নিকট নিয়ে যাবে। সীতাব আগমন বার্তা ঘোষণার জন্য অশ্বারূঢ় বিভীষণ স্বয়ং অগ্রবর্তী হলেন। নগরের প্রবেশদ্বারে অনুনয় জানানো হোল, সীতা যেন শিবিকা থেকে অবতরণ কবে উন্মুক্ত শিবির শ্রেণীর মধ্য দিয়ে পদব্রজে অগ্রসব হন। রাজা রামচন্দ্রের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সীতা এমনি তন্ময় ছিলেন যে, এ-সব তুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দেবার অবসর তাঁর ছিল না। সুতরাং কিছু না বুঝেই তিনি আবৃত শিবিকার আসন থেকে উত্থিত হোয়ে প্রশস্ত, অনাবৃত পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর দক্ষিণে, বামে চতুর্দিকে সেনাবাহিনী। সামনে ভাবগম্ভীর পরিবেশে, অসংখ্য জনাকীর্ণ বিরাট সভায় রামচন্দ্র উপবিষ্ট। সকলের দৃষ্টি সীতার উপর নিবদ্ধ, যিনি শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ সহজাত বুদ্ধিতে অনুধাবন কবলেন যে, সঙ্কুচিতা ও লজ্জাশীলা রাজ্ঞী এই অবস্থায় অত্যন্ত বিব্রত বোধ করবেন। সাধারণের অগোচরে রাজদম্পতির সাক্ষাৎকার ঘটুক এই উদ্দেশ্যে তিনি জনতাকে সরে যাবার আদেশ দানের উপক্রম করছেন, এমন সময় রামচন্দ্র হস্ত উত্তোলন করে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি আদেশ দিলেন,—'সকলেই

উপস্থিত থাকুক। এই সব মুহূর্তে 'সমগ্র বিশ্বই রমণীর আবরণ স্বরূপ, এবং সকলেই নিষ্পাপ চক্ষে সীতাকে দর্শন করতে পারে।'

ইতিমধ্যে ক্রমেই সীতা রাজ্ঞী জনোচিত ধীর পদক্ষেপে রামচন্দ্রের সমীপবর্তী হলেন। রামচন্দ্রের মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি পরিবর্তন সীতা মগ্ন চিত্তে নিরীক্ষণ করছিলেন। সীতাকে সম্বর্ধনার জন্য রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করলেন; কিন্তু সমবেত জনতা দেখল, তিনি সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অধোমুখে, নতনেত্রে দণ্ডায়মান। রাজ্ঞী কি অপরূপ সুন্দরী! কী মহিমান্বিতা ও লাবণ্যময়ী! তাঁর প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি জনতার মনে হোল, যদিও তিনি রাজকীয় আভরণে ভূষিতা, তবু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃতই এক মহীয়সী নারী, অনুগতা ও প্রেমময়ী পত্নী এবং তাঁর রাজ্যের সকল সুখী পরিবারের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল স্বরূপ। সেদিন জনতার প্রত্যেকে তাঁর মধ্যে এক মহান্ নারীত্বের বিকাশ দেখে ভয় ও ভক্তিতে অভিভূত হোয়ে গিয়েছিল।

পতির ইঙ্গিতে রাজ্ঞী কয়েক পদ দূরে স্থিরভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। স্বীয় মনোভাব গোপন রেখে সীতাকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র গম্ভীর ও সংযত স্বরে বললেন,—'রাবণ পরাজিত ও নিহত। এইভাবে অযোধ্যার অবমাননার চরম প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। রাজ্ঞীকে রাবণ তাঁর স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, এখন তিনি নিজে স্থির করুন, কার অভিভাবকত্বে ও কী ভাবে তিনি অবস্থান করবেন।' ক্ষণেকের জন্য কোমলতায় আপ্লুত রামচন্দ্র সীতাকে সোজাসুজি সম্বোধন করে বললেন,— 'হে শান্তশীলে, তোমার অভিলাষই পূর্ণ হবে।' কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি বললেন, রাবণের প্রাসাদে অবস্থান করায় সীতার সুযশ কলঙ্কিত হয়েছে, পূর্বস্থানে তাঁকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

সহসা রামচন্দ্রের এই ধরনের উক্তি সীতার মর্মবিদ্ধ করল, বেদনা ও বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর ওষ্ঠাধর কম্পিত ও চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হোল, তথাপি তিনি তাঁর গর্বিত শির যথাসম্ভব সমুন্নত করে অনুপম কণ্ঠে স্থির অচঞ্চল স্বরে বললেন, 'আমার চরিত্র সম্বন্ধে অবশ্যই ভুল ধারণা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমার মহত্ত্ব সম্বন্ধে রামচন্দ্রও ভ্রান্ত হোতে পারেন। তাহলে আমি সত্যই নিরুপায়! প্রভু রামচন্দ্র যদি লঙ্কা নগরীতে আমার বন্দী থাকাকালে বলতেন যে, তিনি অযোধ্যাব সম্মান রক্ষার জন্যই আমাকে উদ্ধার করবেন, তাহলে সকল কঠোর পরিশ্রম থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিতাম। সেখানেই মৃত্যু বরণ করা আমার পক্ষে কত না সহজ হোত! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আমাকে উদ্ধাব করার তাঁর অন্য উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্মণ, যাও, আমার জন্য চিতাগ্নি প্রস্তুত কর। আমার মনে হয়, যে দুর্ভাগ্য এখন উপস্থিত, এই তার একমাত্র প্রতিকার।'

তাহলে এইরূপ অভিভাবক ও আশ্রয় নির্বাচন করাই সীতার অভিপ্রায়! ক্রোধে ও বিস্ময়ে লক্ষ্মণ ভ্রাতার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কেবল নীরব ইঙ্গিত পেয়ে তিনি সত্বর চিতা প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হলেন। সৃষ্টির সংহারকালে স্বয়ং মৃত্যুর ন্যায় রামচন্দ্রের ভীষণ মুখমণ্ডল দর্শন করে উপস্থিত কেহই তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে সাহসী হলেন না। সীতা অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করলেও ধৈর্য সহকারে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যখন চিতা প্রস্তুত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হোল, সীতা অবনতমস্তকে তিনবার পতিকে প্রদক্ষিণ করলেন। সকলেই উপলব্ধি করলেন, তাঁর হৃদয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তারপর অগ্নিসম্মুখে উপনীত হোয়ে করজোড়ে তিনি প্রার্থনা করে বললেন, 'হে অগ্নি, আপনি জগতের সাক্ষীস্বরূপ! চিরপতিব্রতা আমাকে রক্ষা করুন! হে জ্বলদর্চি,

আমাকে গ্রহণ করুন। পবিত্রতার অধীশ্বর আপনার মধ্যেই পবিত্রাত্মা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।'

কথাগুলি উচ্চারণ করে এবং প্রজ্বলিত চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ-পূর্বক সমবেত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণান্তে নির্ভীক হৃদয়ে সীতা অগ্নিপ্রবেশ করলেন। স্বর্ণবেদিকায় স্বর্ণ স্থাপনের মতো সীতাদেবী জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পদক্ষেপ করলেন। সমবেত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিলাপ ধ্বনি উত্থিত হোল। আশ্চর্য, সীতার পদযুগল অগ্নি স্পর্শ করা মাত্র স্বর্গ থেকে দেবগণ রামচন্দ্রের যশগৌরব ও শ্রীভগবানের (রামচন্দ্রের) সঙ্গে নিজ শক্তির অবিচ্ছেদ্য মিলন রহস্য বর্ণনা করে মধুর স্বরে গান গেয়ে উঠলেন! এবং স্বয়ং অগ্নিদেব জ্বলন্ত অগ্নির মধ্য থেকে সীতাকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হোলেন। দক্ষিণহস্তে তাঁকে ধারণ করে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার অভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে অগ্নিদেব সীতাকে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপনীত করলেন। রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্‌ভাসিত হোয়ে উঠল। অগ্নিদেব উভয়কে মিলিত করে বললেন,—'হে রাম, সীতা একান্ত তোমারই। তিনি কায়মনোবাক্যে তোমার চির অনুগতা পত্নী। আমার আদেশেই তুমি তাঁকে পুনরায় গ্রহণ কর। কারণ আমি বলছি, সীতা কেবল তোমারই অনুগত।'

রাম সীতাকে গ্রহণ করে বললেন, 'প্রিয়তমে, তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে তোমার সত্যতা প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন ছিল। যথার্থই তুমি আমার। আমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চিন্তা তুমি মনেও স্থান দিও না। তুমি আমারই, এবং সূর্যদেব যেমন কদাপি তাঁর রশ্মি থেকে বিচ্ছিন্ন হোতে পারেন না, আমিও তেমনি তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করতে পারি না।'

এইভাবে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন; যৌবনে যেমন পুরোহিত কর্তৃক তাঁদের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল, এখন স্বয়ং অগ্নিদেব কর্তৃক

তাঁরা পুনরায় তেমন পরিণীত হলেন। উপস্থিত সকলের মনে হোল যেন উর্ধ্বে সহসা স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাঁবা দেখলেন, রথোপরি উপবিষ্ট রাজা দশরথ রাম ও সীতাকে আশীর্বাদ করে তাঁদের অযোধ্যার রাজা ও রাণী বলে ঘোষণা করছেন।

সত্যই তাঁদের বনবাসের চৌদ্দ বৎসর সমাপ্ত। এই দৃশ্য থেকে রামচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, অযোধ্যায় প্রত্যাগত ও রাজ্যে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁব পিতার আত্মা শান্তিলাভ করবে না। অতএব সত্বর যাত্রার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন। সৈন্যসামন্তদের মধ্যে ধনরত্ন ও পুরস্কারাদি বিতরণে দু'একদিন অতিবাহিত হোল। তারপর তিনি সীতার সঙ্গে শ্বেতহংসবাহিত রাজকীয় রথে আরোহণ করে আকাশপথে অতি দ্রুত অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন।

কথিত আছে, রামের রাজত্বকালে পতিহীনাদের কোন দুঃখ ছিল না, ব্যাধি বা হিংস্র জন্তু থেকে ভয় ছিল না। দস্যুভয় নিবারিত হয়েছিল এবং অন্য কোন প্রকার ক্লেশ ছিল না। যুবাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্য বৃদ্ধরা আহুত হতেন না। সকলেই একত্র সুখে শান্তিতে বাস করত, এবং পরস্পারের প্রতি দ্বেষ ছিল না। বৃক্ষসকল নিরন্তর প্রচুর ফুল ও ফল প্রদান করত। ইচ্ছামাত্র বারিবর্ষণ হোত। মনোরম বাতাস প্রবাহিত হোত। রামচন্দ্রের রাজত্বে সকলেই সত্যবাদী ও ধার্মিক ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী সর্বপ্রকার সৌভাগ্যমণ্ডিত ছিল।

এইভাবে সমাপ্ত হোলে কাহিনীটি কতই না সুখের হোত! মহাকবি বাল্মীকির এইরূপই অভিপ্রায় ছিল; এবং বহু শতাব্দী ধরে এই ঘটনাই নিশ্চয় লোক প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীযুগে কোন অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক এক পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়। এই পরিশিষ্ট অদ্ভুত বিষাদময়। তাতে বলা হয়েছে, সীতার সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-পরীক্ষা যথেষ্ট বলে প্রতিপন্ন হয়নি; অথবা ঘটনাটি বহুদূরে সংঘটিত হওয়ায় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হোতে পারেনি। যে সংশয় ও

অপবাদ-গুঞ্জন রামচন্দ্র আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হোল। যখন রামচন্দ্র এ কথা শুনলেন তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বৃথা। এখন থেকে তাঁকে ও সীতাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ে বাস করতে হবে। প্রজাদের কল্যাণার্থে রাজাকে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য রাজদম্পতির আচরণ সন্দেহাতীত হওয়া প্রয়োজন। যদিও তাঁর সঙ্কল্প ছিল বীরের ন্যায় দৃঢ়, তথাপি তিনি সীতার সম্মুখীন হোয়ে তাঁকে শেষ বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে ভরসা করলেন না। অতএব, তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকে, তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ সুদূর গঙ্গা-তীরস্থ বাল্মীকি ঋষির আশ্রমে প্রেবণ করলেন। সেখানে লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে বিদায় নিলেন।

কী নিদারুণ দুঃখ সীতার অদৃষ্টে ছিল! কেবল সান্ত্বনা এই, পতি ও পত্নী পবস্পরকে জানতেন। পবস্পরের নিকট শেষ বিদায়-বাণী বিবাহেব অঙ্গীকারের মতোই ছিল পবিত্র।—যদিও সীতা জানতেন এই বিচ্ছেদ চিরকালের জন্য। অন্তর্লোকে তিনি সর্বদা পতির সঙ্গে অভিন্ন থাকবেন, কিন্তু ইহজীবনে রামচন্দ্রের মুখদর্শনের আশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হোল।

এইরূপে মহাপ্রাজ্ঞ বাল্মীকি ঋষির পিতৃসুলভ স্নেহচ্ছায়ায় নির্বাসনের বিশ বৎসর অতিবাহিত হোল। সীতাব যমজ পুত্রদ্বয় ঋষিকে সহৃদয় ও স্নেহময় মাতামহ জ্ঞান করতেন। বিশ বৎসর পরে অযোধ্যায় এক রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হোল। ইতিমধ্যে ঋষি, রামায়ণ কাহিনী রচনা করে রামের পুত্রদ্বয় লব ও কুশকে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন, বালকদ্বয়কে অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন এবং যজ্ঞ উপলক্ষে তারা ঐ কাব্য পিতার সমীপে গান গেয়ে শোনাবে।

সঙ্গীত সমাপ্ত হবার বহু পূর্বেই রামচন্দ্র বালকদ্বয়কে আত্মজ

বলে চিনতে পারেন। এই কাব্য আবৃত্তি করতে বহুদিন লাগলেও রাম তাঁর সভাসদ্‌বর্গ সহ আগ্রহ সহকারে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করেন। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রাম মহাকবি বাল্মীকিকে সম্বোধন করে বললেন,—'হায়, কেবল সীতা যদি এখানে থাকতেন! কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার তাঁর সতীত্ব পবীক্ষায় সম্মতি প্রদান করতেন না।'

বাল্মীকির একান্ত আগ্রহ ছিল, উভয়ের সুখের জন্য পতি ও পত্নীর পুনর্বাব মিলন সম্পাদন করবেন। সুতরাং তিনি উত্তরে বললেন,—'আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কবে দেখব।'

সীতা পরদিনই প্রকাশ্য সভায় পুনরায় পরীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন শুনে রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন। তবে এবার অগ্নি পরীক্ষার পরিবর্তে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

পরদিন প্রভাত হোল। রাজা তাঁর অমাত্যবর্গ ও পরিজনসহ বাজসভায় উপবেশন করলেন। সীতার এই পরীক্ষা দেখবাব জন্য দেশের সর্বস্থান থেকে, সর্বস্তরের বিশাল জনমণ্ডলী আহুত হলেন। বাল্মীকির অনুসরণ করে রাজ্ঞী সভায় আগমন করলেন। সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠিতা, নতশিরে, যুক্তকবে, সাশ্রুনেত্রে তিনি অগ্রসর হলেন; স্পষ্টই প্রতীয়মান হোল, তাঁর সমগ্র চিত্ত রামচিন্তায় বিভোর। দর্শকদের মধ্য থেকে আনন্দ ও প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেল। অনতিবিলম্বে তাঁদের কোন্ দৃশ্য অবলোকন করতে হবে তা কেহই স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।

বাল্মীকি রাজা ও সভাসদ্‌বর্গের নিকট রাজ্ঞীকে উপস্থিত করলেন। রামচন্দ্র সমাগত প্রজাবর্গের সমীপে তাঁর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য সম্পর্কে অঙ্গীকার করবার জন্য সীতাকে আহ্বান করলেন। তখন সকলেই লক্ষ্য করলেন, দেবগণের আবির্ভাবসূচক স্নিগ্ধ মৃদু বাতাস প্রবাহিত হোচ্ছে। সীতার প্রতি রামচন্দ্রের উচ্চারিত বাণীর ফলাফলের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।

সেই আত্মমর্যাদাসম্পন্না ও শান্তহৃদয়া সীতা নীরবে যতদূর সম্ভব সহ্য করেছেন। মাধুর্যময়ী ও সম্পূর্ণ অনুগতা সীতা বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করে দীর্ঘ বিশ বৎসর একাকিনী নীরবে অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আজ তার অবসান। তিনি বিলাপ করে বললেন,—'হে মাতা ধরিত্রী দেবী, যদি রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি হৃদয়ে স্থান না দিয়ে থাকি, তবে আমার পাতিব্রত্যের জন্য আমাকে তোমার অঙ্কে স্থান দাও। যদি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর আমি তাঁর কল্যাণ কামনা কবে থাকি, তবে এই মহৎ গুণের জন্য তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।' এই কাতব বিলাপ ধ্বনিত হওয়া মাত্র এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা গেল। মেদিনী বিদীর্ণ করে এক অত্যুত্তম রত্ন-সিংহাসন উত্থিত হোল। পাতালের অধীশ্বর নাগগণ সেই দিব্য-সিংহাসন মস্তকে ধারণ করেছিলেন। আশ্রয় অন্বেষণে কাতব, শরণাগত কন্যাকে গ্রহণের জন্য মাতা বসুন্ধবা দুবাহু প্রসাবিত করে সেই সিংহাসনে আসীন। সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট হোলে ধীবে ধীরে সিংহাসনটি পুনরায় পাতালে প্রবিষ্ট হওয়ার সময়ে উভয়ের উপর স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হোতে লাগল। সেই সময়ে অন্তরীক্ষে দেবগণেব সাধুবাদ শোনা গেল,—'ধন্য, ধন্য, সীতা।' সীতাদেবী সহ মাতা বসুন্ধরা লোক-লোচনের বাইরে অদৃশ্য হওয়া মাত্র মুহূর্তকালেব জন্য যেন সমস্ত জগতে এক পরম শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

কেবল একজনই এই শান্তি অনুভব করতে পারলেন না। রাম-চন্দ্রেব হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হোল। সীতা যেমন বামের প্রতি অনুগত ছিলেন, রামও তেমনি ছিলেন সীতাব প্রতি চির বিশ্বস্ত। যে সব রাজকীয় অনুষ্ঠানে বাজমহিষীর সাহায্য অপরিহার্য, সে সব ক্ষেত্রে তিনি পত্নীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা পার্শ্বে রেখে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এইভাবেই ঘটনাস্রোত চলেছিল। অবশেষে কোন মানুষই যাকে রোধ করতে পারে না, সেই অন্তিমকাল উপস্থিত হোলে রাম তাঁর

অনুজগণসহ বিদায় গ্রহণ করলেন। অতঃপর অযোধ্যা নগরীর বাইরে সরযূ নদীতীরে তাঁরা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে মর্ত্যবাসীর অগোচর দিব্য-শরীরে বিলীন হোয়ে গেলেন।

বহুযুগ পরে তাঁদের কাহিনী স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হোল। কারণ তাঁদের সমসাময়িক আর কেহই জীবিত ছিলেন না।

গান্ধারীর বিলাপ

সংগ্রাম শেষে কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে যে সূর্যের উদয় হোল তা অতি পাণ্ডুর। অষ্টাদশ দিবসে দুর্যোধন নিহত হন। যুদ্ধের শেষ রাত্রে নিদ্রাভিভূত পাণ্ডব শিবিরে বিজেতাগণের পুত্র, পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রপক্ষ প্রভৃতি সকলকে নির্বিশেষে হত্যা করা হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ভীষণতাকে উগ্রতর করবার জন্যই যেন সে রাত্রে, যারা ভাগ্য নির্ধারিত বলি, তারা সহসা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে জাগরিত হয় এবং অন্ধকারে কোন সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে মনে করে নিজেরাই পরস্পরকে হত্যা করে। প্রভাতে দেখা গেল নৈরাশ্যব্যঞ্জক এক নিদারুণ দৃশ্য। সত্য বটে কৃষ্ণসহ বিজেতা পাণ্ডবগণ অক্ষত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চারিদিকে সকল আশা নির্মূল। এখন থেকে সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁদের অধিগত, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যভার অর্পণ করবার জন্য কোন উত্তরাধিকারী তাঁদের নেই। সিংহাসন নিষ্কণ্টক, কিন্তু তাঁদের গৃহ পরিজনশূন্য।

পাণ্ডবগণের চারিদিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরগণ চিরকালের জন্য নিদ্রিত। বিবিধ বর্ণের পতাকা উড্ডীন করে যাঁরা রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, যাঁদের রথ দেখা যেত সর্বাগ্রে, যাঁদের অশ্ব ছিল সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, যাঁদের তূর্যের গম্ভীর নিনাদ শোনা যেত, যাঁদের প্রকৃত স্থান ছিল গজপৃষ্ঠে, এখন তাঁরা শীতল কঠিন ভূমি শয্যায় শায়িত; শকুনী, গৃধিনী, শৃগাল ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর করুণার পাত্র, এমন কি, তাঁদের শত্রু দুর্যোধনের পরাক্রান্ত সৈন্যদলের মধ্যে মাত্র তিনজন অমাত্য জীবিত।

দূরে দেখা গেল, কুরুবংশের শোকাচ্ছন্ন রাজকুলনারীগণ পরিজন-বর্গের শবদেহ পরিদর্শনের নিমিত্ত ধীরে ধীরে আগমন করছেন। তাঁদের নিরীক্ষণ করে পাণ্ডবগণ বিস্ময়ে কম্পিত হলেন। যে সব রাজবধূগণের অবরোধ এত দুর্ভেদ্য ছিল যে, এ পর্যন্ত দেবতারাও

কদাচিৎ তাঁদের দর্শন পেতেন, এখন তাঁরা প্রচণ্ড শোকে বিমূঢ়, লোক সাধারণের দৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, পদব্রজে চলেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ শায়িত।

কেবল সম্ভ্রান্ত পরিচয় বা পদমর্যাদা হেতু নয় পরন্তু অপরিসীম শোক, বার্ধক্য ও অন্ধত্ব যাঁদের এক মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দান করেছে, সেই মহিষী গান্ধারী ও মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্যান্য সকলের নিকট থেকে কিছু দূরে রাজকীয় রথে উপবিষ্ট ছিলেন। পরাজিত পক্ষের তাঁরা কুলাধিপতি ; আবার জ্ঞাতিসূত্রে বিজেতা পরিবারের তাঁরাই প্রধান। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে জয়ের সংবাদ ব্যক্ত করা অপেক্ষা নত হোয়ে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করাই অধিকতর সঙ্গত। অতএব তরুণ রাজা যুধিষ্ঠিব—প্রজাগণের নিকট এখন থেকে যিনি ধর্মরাজ বলে অভিহিত, তাঁর চার ভাই, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণসহ তাঁদের সমীপস্থ হোয়ে চরণবন্দনা করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বৃদ্ধা গান্ধারী সেই নিদারুণ শোকের সময়েও রাজ্ঞীজনোচিত মহীয়সী ছিলেন। তাঁর পতি ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। বিবাহের পর থেকে গান্ধারী সাধ্বীজনোচিত ভক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছায় বস্ত্রখণ্ড দিয়ে স্বীয় দৃষ্টি আবৃত করে রেখেছিলেন। এর ফলে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তাঁর বাক্য ছিল অদৃষ্টের মতো অমোঘ। তাঁর উচ্চারিত বাক্য কখনও মিথ্যা প্রতিপন্ন হোত না। যুদ্ধের সময় প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুর্যোধন তাঁর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন, তিনি যেন সেদিনের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। গান্ধারী কেবল বলতেন, 'পুত্র, ধর্মেরই জয় হবে।' প্রথমাবধি তিনি জানতেন, কুরুক্ষেত্র সমরে তাঁর বংশ ক্ষয় হবে। এমনি তাঁর কঠোর আত্মসংযম যে, শতপুত্রের বিরহ অপেক্ষা দুঃসহ শোকে ও নৈরাশ্যে জর্জরিত স্বামীর জন্যই তাঁর অন্তর হাহাকার করছিল। তিনি ভাল করে জানতেন যে, এ কথা যথার্থ, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতা

ও বাসনাই তাঁদের এই চরম সর্বনাশের হেতু। গান্ধারীর দৃঢ় সঙ্কল্প কখনও বিচলিত হয়নি। অন্তরের অন্তস্তলে ক্ষণেকের জন্যও ধর্মের পবিবর্তে সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগেনি। যে স্বামী স্বকৃত কর্মফলে দুর্ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত, এই দুঃসময় তাঁরই জন্য গান্ধারীব হৃদয় বেদনায় আপ্লুত। সমস্ত জগতের নিকট গর্বিত ও নির্দয় হোলেও স্বামীর নিকট গান্ধারী পতিব্রতা স্ত্রী, শান্ত, প্রেমময়ী এবং তাঁর বেদনায় কাতব। তিনি ভাল করে জানতেন, তাঁর অন্তরের পুঞ্জীভূত শোক জগতে ধ্বংস আনয়নে সক্ষম; সুতরাং অভিবাদনার্থে সমাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি অপরিসীম ক্ষমতায় আত্মসংবরণ করলেন। বস্ত্রাবরণের ভিতর দিয়ে তাঁর নতদৃষ্টি কেবল যুধিষ্ঠিরের পায়ের উপর পতিত হোল; কথিত আছে, তাঁর দৃষ্টির শক্তি এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, ঐ দৃষ্টিপাতের ফলে তৎক্ষণাৎ উক্তস্থান দগ্ধ হয়।

পাণ্ডবজননী রাজমাতা কুন্তী ও দ্রৌপদীর সঙ্গে সহানুভূতিসূচক বাক্যালাপের পর সকলের নিকট থেকে দূবে সরে গিয়ে গান্ধারী কৃষ্ণকে সম্বোধন করলেন। কেবল কৃষ্ণের নিকটেই তাঁর আত্মসংযমের প্রয়োজন ছিল না। তিনি সঙ্গে থাকলে গান্ধারীর পক্ষে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রত্যেকটি বিবরণ বিশদভাবে মনশ্চক্ষে তুলে ধরা সম্ভব ছিল। ভগবান কৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি যেন সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে, সকলের কথা চিন্তা করতে ও তাঁর হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করে সকল কথা ব্যক্ত করতে পারতেন।

গান্ধারী বিলাপ করে বললেন,—'হে পদ্মপলাশলোচন, আমার এই পুত্রবধূগণকে দেখ! পতিহীনা, আলুলায়িতা কেশা তাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ কর। মৃতদেহগুলি নিয়ে বিলাপ করার সময়, সেই ভারত-বীরগণেব মুখ তারা স্মরণ করছে। ঐ দেখ, মৃতদেহগুলির মধ্যে তারা তাদেব পতি, প্রভু, পুত্র ও ভ্রাতাদের অন্বেষণ করছে। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র সেই বীরগণের পুত্রহীনা মাতা

ও পতিহীনা পত্নীদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জীবিতকালে যারা ছিল সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সেই মহাবীরগণের মৃতদেহ এখন ভূপতিত। তাদের অঙ্গের মহার্ঘ রত্ন, স্বর্ণময় বর্ম, অলঙ্কার ও মাল্যসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বীরহস্ত নিক্ষিপ্ত গদা, তরবারি ও বিভিন্ন আকারের বর্শা একাকার হোয়ে পড়ে রয়েছে, হত্যার ভীষণ সংবাদ বহন করে আর তারা শত্রুর প্রতি ধাবিত হবে না। হিংস্র পশুসকল মৃতদেহগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ যথেচ্ছ বিচরণ করছে। হে কৃষ্ণ, কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য এই রণভূমি! হে বীর, এই সকল দর্শন করে আমার হৃদয় শোকে দগ্ধ।

‘এই জগৎ সংসার এখন কী শূন্য বলেই মনে হচ্ছে! নিশ্চিত কুরুপাণ্ডবের এই ভয়ঙ্কর সমরে সৃষ্টির মূল কারণ পঞ্চভূতই যেন ধ্বংস হোয়ে গেছে। এই কলহে যে সকল বীর দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, এখন তারা নির্বাপিত অগ্নির ভস্মরাশির ন্যায় পরিত্যক্ত। সুকোমল সুখশয্যায় যারা শয়ন করত, এখন তারা অনাবৃত ভূমিশয্যায় নিদ্রিত। চারণগণ যাদের যশোগাথা কীর্তন করত, এখন শিবাকুল তাদের নিকট চীৎকার করছে। অস্ত্রশস্ত্র আলিঙ্গন করে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিতলে শয়ান। ক্ষুধার্ত পশুর গর্জনের সঙ্গে মিশ্রিত রমণীদের বিলাপধ্বনি তাদের বিশ্রামকালের সঙ্গীত-ধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। হে কৃষ্ণ, কোন্ অদৃষ্ট আমাদেব অনুসরণ করেছে? কোথা থেকে এই নিদারুণ অভিশাপ আমাদের উপর পতিত হোল?’—এই ভাবে কাতর ক্রন্দন ও বিলাপ করে কুরুকুলসম্রাজ্ঞী সহসা সচেতন হলেন যে, অদূরে তাঁর পুত্র দুর্যোধনের মৃতদেহ নিপতিত। এই দৃশ্য সেই ভাগ্যহত নারীর নিকট অসহনীয় হওয়ায় তাঁর শোক পুনরায় উথলে উঠল। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি অবনত পুত্রের মস্তকে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন, ‘হে পুত্র, ধর্মের জয় হবে’,—নিজের সেই ভয়ঙ্কর আশীর্বাণীর কথা তাঁর স্মরণ হোল। সংগ্রাম আরম্ভ

পর্যন্ত প্রতিদিন যে দৃশ্য তাঁর মনশ্চক্ষে উদিত হয়েছে, আজ তা বাস্তবে পরিণত। এতদিন ধরে তিনি আগামী দুঃখের আতঙ্কে মিশ্রিত বেদনার পথে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি যেন দুঃখ ও বিচারের নিত্যসঙ্গী এবং সেখানে প্রতিকার প্রার্থনার কোন অবকাশ ছিল না। কুরুকুলাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ছিলেন মহীয়সী সম্রাজ্ঞী; কিন্তু তিনিই আবার নারী এবং জননী—তাঁর সেই অর্ধ বিলাপ ও অর্ধ প্রার্থনা মিশ্রিত শোক সহসা নূতন সুরে ধ্বনিত হোল।

'হে কৃষ্ণ, দেখ, দেখ, সমরে অজেয় আমার পুত্র এখন বীরশয্যায় শায়িত। কালকর্তৃক আনীত পরিবর্তন কী ভীষণ! যিনি পূর্বে শত্রুগণের ভীতিস্বরূপ, এবং নৃপতিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, তিনি এখন ধূলায় লুণ্ঠিত। যাঁর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, বর্তমানে ক্ষুধার্ত শৃগাল ব্যতীত তাঁকে সঙ্গদানের কেউ নেই। রাজন্যবর্গ পরিবৃত হোয়ে গর্বের সঙ্গে যিনি অবস্থান করতেন, এখন তিনি নিহত ও শকুনী-গৃধিনী পরিবেষ্টিত।

'শিকারী পক্ষীগণ ঘৃণ্য দুর্গন্ধময় পক্ষদ্বারা তাঁকে বাতাস দিচ্ছে। সিংহকর্তৃক নিহত গজরাজের ন্যায় যুবরাজ ও যোদ্ধা আমার পুত্র ভীমকর্তৃক নিহত। গদাযুদ্ধে নিহত রক্তাক্তকলেবরে, অনাবৃত ভূমিতে শায়িত আমার পুত্রকে তুমি দেখ। এইতো সেদিন দেখেছি, অদ্বিতীয় রাজা দুর্যোধন কর্তৃক শাসিত পৃথিবী ছিল গজ, বাজি ও পশুপূর্ণ। আজ দেখতে পাচ্ছি সেই পৃথিবী প্রাণীশূন্য ও অন্যের দ্বারা শাসিত।

'হায়, যুদ্ধে আমার প্রিয় পুত্রগণ নিহত—এই দৃশ্য দেখেও আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে না! এই সব ক্রন্দনরতা কন্যাগণ ও আমি এমন কী মহাপাতক করেছিলাম যে, কাল আমাদের উপর এই দুর্ভাগ্য নিক্ষেপ করেছে?'

দুর্যোধন ও নিজ পরিবারের অন্যান্য পুত্রগণের উদ্দেশ্যে এইভাবে চিন্তার পর রাণীর বিলাপ এখন অন্য দিকে প্রবাহিত হোল। প্রত্যেক বীরের জন্য শোক প্রকাশকালে গান্ধারী যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করে গেলেন। অবশ্যম্ভাবী এই দুর্ঘটনা যদি নিবারণ করা যেত—এই অসম্ভব কল্পনা বার বার তাঁর চিন্তায় উদিত হচ্ছিল। বার বার তিনি অদৃষ্টের অমোঘ পরিণামের কথা উল্লেখ করলেন। মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত শোকে তিনি বিহ্বল হোয়ে বলতে লাগলেন,—'হে ভগবন, আমার পুত্রগণ কত অকালেই ধ্বংস হোয়ে গেল।'

গান্ধারীর কণ্ঠস্বর অবসন্ন ও স্খলিত হোল; ক্ষণেকের জন্য শোকের প্রচণ্ডতা থেকে তিনি বিরত হলেন। সেই মুহূর্তে দ্রুত-গতিতে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। পর্বত আরোহন করলে যেমন অপর পার্শ্বের সকল দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তেমন চকিতে পাণ্ডবদের শোকেব কথাও তাঁর স্মরণ হোল। যুদ্ধ যেন তাঁর কাছে ক্রীড়াক্ষেত্র বলে প্রতিভাত হোল, যেখানে দু'দল সেনাবাহিনী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হোয়ে পরস্পরকে নিঃশেষ করেছে। এই সব পুতুলদের চালক কে? কে তিনি, যিনি এই ঘটনা নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে এই পরিণাম ঘটতে দিয়েছেন? চকিতদৃষ্টিতে গান্ধারী সত্য অনুধাবন করলেন। বহুদূর প্রসারিত দৃষ্টিদ্বারা নিয়তি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ বক্তার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে এবং শোকবিহ্বলার পরিবর্তে বিচারকের স্থান গ্রহণ করে, ধীরে ধীরে তিনি সর্বনিয়ন্তা কৃষ্ণকে আহ্বান করে বললেন,—

'হে কৃষ্ণ, উভয় সৈন্যদলই নিঃশেষিত। যখন তারা এইভাবে পরস্পরকে ধ্বংস করছিল, তখন তোমার চক্ষু কেন মুদ্রিত ছিল? তোমার অভিপ্রায় অনুসারে যখন শুভ ও অশুভ দুইই তুমি সংঘটন করতে পার, তখন কেন আমাদের সকলের জন্য এই অশুভ পরিণতি

বিধান করলে? হে গদাচক্রধারী, নারীর সতীত্ব ও সত্যপালনের বলে আমি যে পুণ্য অর্জন করেছি তার দ্বারা আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করছি। হে গোবিন্দ, যেহেতু কুরু পাণ্ডবদের পরস্পরের বিনাশের কালে তুমি উদাসীন ছিলে, সেহেতু তোমার স্বজনবর্গের ধ্বংস তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হবে। হে কংসসূদন, আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবার পর পুত্র ও জ্ঞাতিগণের বিনাশের পরে তুমি একাকী অরণ্যে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। তোমার বংশের কুলবধূগণ পুত্র-জ্ঞাতি-বান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় এই ভরতকুলজাত নারীগণের ন্যায় শোকাশ্রু বিসর্জন ও বিলাপ করবে।'

আশ্চর্য, গান্ধারীর বাক্য শেষ হোলে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্মিতহাস্যে বললেন, 'গান্ধারী, তোমার কল্যাণ হোক! তুমি আমার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করেছ। সত্যই আমার কুলজাত বৃষ্ণিগণ অপরাজেয়। অতএব তারা পরস্পরের হাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। মাতঃ, আমি তোমার অভিশাপ গ্রহণ করলাম।' সমাগত ব্যক্তিগণ এই কথা শ্রবণ করে ভয়ে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হলেন।

তারপর সেই পুণ্যাত্মা মহাবীর কৃষ্ণ বৃদ্ধা রাজ্ঞীর সম্মুখে অবনত হোয়ে বললেন,—'হে গান্ধারি, উত্থান কর। শোকে হৃদয় অবসন্ন কোর না। শোককে প্রশ্রয় দিলে তা দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। হে নারি, মনে করে দেখ, ব্রাহ্মণ পত্নী সন্তান ধারণ করে এই উদ্দেশ্যে যে, তার সন্তান তপশ্চর্যা করবে। গাভী বৎস প্রসব করে তারা ভার বহন করবে বলে। শ্রমজীবী স্ত্রীলোক শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই সন্তান ধারণ করে। কিন্তু রাজকুলে যাদের জন্ম, জন্ম থেকেই তারা যুদ্ধে মৃত্যুবরণের জন্য নির্দিষ্ট।'

গান্ধারী নীরবে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন। তিনি ভাল করেই তার সত্যতা অনুধাবন করলেন। অন্তর ও বাহির নৈরাশ্যে

পরিপূর্ণ। অরণ্যে তপশ্চর্যার জীবন ব্যতীত তাঁর সম্মুখে আর কিছু ছিল না। এই নিদারুণ ঘটনার পরিণামে বিশুদ্ধ দৃষ্টিলাভ করে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য। আর অধিক কিছু বলবার ছিল না, সুতরাং তিনি মৌন রইলেন। তারপর মোহজনিত শোক সংবরণ করে তিনি ও ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে মৃতগণের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হলেন।

ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে, আরও আরও ঊর্ধ্বে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ বসবাসের জন্য আমাদের যে বাড়িটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, সেখানে পৌঁছতে গেলে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে যে সোপানাবলী অতিক্রম করতে হয়, মনে হয় যেন তার আর শেষ নেই। অবশেষে এখানে পৌঁছে দেখা যায় যে, আনওয়া রাজাদের (Rajas of Annwa) এই অট্টালিকাটি এক দস্যু ভূম্যধিকারীর আস্তানা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সত্য সত্যই দস্যুবৃত্তি যাদের পেশা, এ আস্তানা সেরূপ জমিদারদেরই। পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত খাঁচার দাঁড়ের মতো অর্ধলম্বমান বাড়িটি দৃষ্টির অন্তরালবর্তী, অথচ বাড়ি থেকে দৃষ্টিগোচর হয় এ অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ অংশ। অদ্ভুত রকমের ছোট, ও পাশ্চাত্য ধারণা অনুসারে কিঞ্চিৎ অরক্ষিত এই বাড়িটির দুটি অংশ—ভিতরের অংশে দেখা যায় একটি প্রাঙ্গণ, তার শীর্ষে প্রশস্ত চত্বরওয়ালা ছাঁদ—যা বলপূর্বক ভিতবে প্রবেশের পক্ষে সুরক্ষিত; বাইরের অংশে উন্মুক্ত চতুষ্কোণ স্থানের দুপাশে সারি সারি কতকগুলি কক্ষ। সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য অট্টালিকার অন্যতম আকর্ষণ, সে আকর্ষণ আবার এর অনস্বীকার্য সৌন্দর্য প্রভাবে বর্ধিত। উপরি উক্ত দুটি কারণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার কারণ হোল যে, যে বাড়িতে আমরা একুশদিন বাস করব, সেই বাড়িতে বিগত পঁচিশ বা ত্রিশ বছর ধরে একাদিক্রমে মানুষ বসবাস করে এসেছে। কারণ যে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমরা অমসৃণ পাহাড়ের গায়ে উঠে আসি তা রাজগৃহের প্রাচীন প্রাকার ভিত্তির উপরে নির্মিত। আনওয়ার সামন্ত রাজাদের আদিপুরুষ একটি ক্ষুদ্র অধিত্যকায় প্রাচীরের বহির্ভাগে পোস্তা রক্ষীদের আবাস কক্ষকেই পারিবারিক দুর্গে

পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের বাসস্থানের নীচে পাকদণ্ডীপথ ও একটি ঝরণা দেখা যায়। ঝরণাটি শিলাময় সোপানপথের পাদদেশে পরিখা রচনা করেছে। আধুনিক কালের রেল কোম্পানী যাকে দুর্গের লুপ লাইন (Loop of the fort) বা ফাঁসপথ বলে অভিহিত করবে, সেই প্রশস্ত আঁকাবাঁকা সোপান শ্রেণী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বার্ষিক দর্শনাভিযানের লক্ষ্যস্থল রাজগীরের মন্দির ও উষ্ণপ্রস্রবণ সমূহ সুরক্ষিত করে রেখেছে। এই এলাকা অতিক্রম করে উন্মুক্ত সমতল ক্ষেত্রে, মনে হয় একটু দূরে, অথচ রাস্তা ধরে গেলে প্রায় মাইল খানেক দূরত্ব হবে, অবস্থান করছে আধুনিক রাজগীর গ্রাম, প্রাচীন রাজগৃহ, রাজন্যদের বাসগৃহ অথবা নগর।

ইতিমধ্যেই গ্রামবাসিগণ আমাদের প্রতি বন্ধুত্বসূচক মনোযোগ দিতে শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে যে গৃহ ভৃত্যটি এসেছে তার জন্মস্থান এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। তার পরিবারের মেয়েরা অতিথি সেবার আগ্রহ নিয়ে আমাদের প্রথম আহার্য আনতে শুরু করেছে। যাতে এরা আমাদের যথোচিত পরিচর্যা করতে পারে সেজন্য কৃষক-চৌকিদার বাড়ির বাইরের দিকের ঘরগুলিতে এদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আর নিকট অঞ্চলের একটি ছোট ছেলে দাবী জানাচ্ছে, তাকে যেন গৃহভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রাচীন নিনেভের (Nineveh) সেমিরামিসদের (Semiramis) অতিথি হোয়ে এসেছি, যেন আমাদের তাঁবু পড়েছে ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস চলছে প্রাচীন অধিবাসীর বংশধরদের সঙ্গে।

আমাদের সম্মুখে প্রসারিত পল্লীদেশটি কী সুন্দর! সর্পিল পথটির যেখানে আরম্ভ তা অতিক্রম করলে যে বিস্তৃত স্থানটি দেখা যাবে, সেটি বড়দিন বা তার কাছাকাছি সময়ে সবুজ ধান অথবা অন্যান্য শস্যে ঢেকে যাবে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে পূর্ণ প্রস্ফুটিত

শুভ্র কুসুমসহ অহিফেন ক্ষেত। কিন্তু এখন অক্টোবর মাসে ঋতু পরিবর্তনের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি বিচিত্রবর্ণের টুকরো টুকরো ক্ষেত—কোনটা রক্ত, কোনটা বাদামী, কোনটা বা পাটল বর্ণের। মনে পড়ছে বুদ্ধের একটি কথা। একদা বুদ্ধ বহু তালি দেওয়া পরিচ্ছদযুক্ত এক শিষ্যকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, তাকে দেখে তাঁর (বুদ্ধের) রাজগৃহের বিচিত্র বর্ণের শস্যক্ষেত্রের কথা মনে পড়ছে—একথা বলবার সময় নিশ্চিত বুদ্ধের মুখে এক টুকরো হাসি ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল প্রীতি-স্নিগ্ধ স্মৃতিতে কোমল হোয়ে আসা কণ্ঠস্বর।

আমাদের এখান থেকে এক-চতুর্থাংশ মাইল পশ্চাতে পর্বতমালা বেষ্টিত একটি বৃত্তাকার স্থানে প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত —প্রত্যেকটি অংশ সুস্পষ্ট ও সুপরিস্ফুট। এমনকি, বাজার কোথায় ছিল তাও খুঁজে বার করা যায়, এবং প্রায় সত্য কথাই বলা হবে যে, পথঘাটগুলি যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রায় একই অবস্থায় রয়েছে। অথচ বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে আমার জানা নেই। যে পথঘাট ধরে প্রতিদিন শত শত গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ স্থান (বর্তমানে গোচারণ ভূমি) থেকে যাতায়াত করে, অন্ততঃপক্ষে রাজগীরের সেই পথগুলি অস্পষ্ট অতীতকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত একই রকম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এখান থেকে নগরীর মাঝখান দিয়ে যে রাজপথটি চলে গেছে, এক সময় সে পথটি যে প্রাসাদ-প্রাকারের কেন্দ্রস্থল দুর্গবহিঃস্থ উচ্চশীর্ষ গম্বুজ-শ্রেণী ও সিংহ দরজা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তার বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাসাদ অতিক্রম করে রাজপুরীর প্রমোদ-উদ্যানের পরিলেখ এবং তন্মধ্যে অবস্থিত অপূর্ব শোভাময় জলাশয়গুলি আজও অটুট রয়েছে। এই ছোট্ট পার্বত্য রঙ্গভূমি এবং সেইদিকে প্রসারিত যে গিরিপথটি, তার মধ্যে সত্যসত্যই পয়ঃপ্রণালীর উদ্ভাবন ব্যাপারের

আশ্চর্য রকম উন্নতির পরিচয় দেখা যায়। মনে হয় এই প্রকৃতি নির্মিত দুর্গের কোলে রাজন্যবর্গের বসবাস স্থাপনের আদি কারণ ছিল উষ্ণজলপ্রপাত সমূহের খ্যাতি; এবং পরবর্তীকালে কৃত্রিম উপায়ে ঐ প্রপাতের জলধারাগুলির উন্নতি সাধন বংশানুক্রমে রাজপরিবারের প্রধান কর্ম হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও আমাদের এই প্রাচীর-বেষ্টিত ও পরিখা-পরিবৃত জমিদারগৃহের নীচে একটি শূন্য জলাশয় পড়ে আছে, দু'হাজার বৎসর পূর্বে সেটি ছিল উদ্যান মধ্যস্থ পদ্মফুলের আধার। এখনও এই উপত্যকা-দেশের মধ্য দিয়ে যে ক্ষীণকায়া নদীটি প্রবাহিত, তা প্রকৃতিদ্বারাই দ্বিধারায় বা ত্রিধারায় বিভক্ত হোয়ে একটি জাল রচনা করেছে, যা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে জলসেচ সমস্যার প্রতি কতখানি মনোযোগ অর্পণ করা হোত। আর তারই ফলে এক উচ্চ স্তরের পূর্ত-বিজ্ঞান জন্ম নিতে পেরেছিল। সুদূর মধ্যপ্রদেশে প্রাচীন রাজগীরের দু'শ বৎসর পরবর্তী কালের একটি সুবিশাল রাজপ্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়, তার কারুকার্যময় কৃত্রিম ঝরণাগুলি পূর্তবিদ্যায় অনুরূপ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যখন পূর্ব ও উত্তর য়ূরোপের অধিবাসিগণ নিজেদের নীলবর্ণে চিত্রিত করে রাখত, সেইযুগে এইরূপ কারুকার্যময় অপূর্ব শ্রীর মধ্যে যে সকল পূর্বপুরুষ বাস করে গেছেন তাঁদের জন্য ভারতবাসী নিশ্চয় গৌরব অনুভব করতে পারেন।

রাজগীরের মতো এক প্রাচীন শহর যার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেক কথা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় ও অনুমান করা যায় এরকম স্থান অতি অল্পই আছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টজন্মের ৫৯০ বৎসর পূর্বে সেই পৃথিবীতে যখন সকল ঘটনার মধ্যে ব্যাবিলন, ফোনেশিয়া, মিশর ও শিবা (Sheba) প্রভৃতি দেশগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ —সেই সুদূর খৃষ্টজন্মের ৫৯০ বৎসর পূর্বে অদূরে উপত্যকার ঐ পথ ধরে এসেছিলেন সেই মহামানব, অনুভূতির দীপ্তিতে, চিন্তার

ভাস্বরতায় যাঁর তনু ছিল জ্যোতির্ময়, যা তাঁকে সাধারণ জাগতিক স্তরের উর্ধ্বে সেই চেতনায় উন্নীত করেছিল, যে চেতনা চিরকাল ইতিহাস সৃষ্টি করে থাকে। তিনি যখন এসেছিলেন তখন হয়তো প্রভাতকাল, কারণ পুঁথিপত্র থেকে জানা যায় যে, সে সময় রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে বলিদানের জন্য বিপুল ছাগবাহিনী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বলিদানের সময় হয়তো নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল দ্বিপ্রহরে। অথবা হয়তো তখন ছিল গোধূলিকাল, অনুষ্ঠানটির প্রাক্‌সন্ধ্যা ; এবং ছাগপালগণ প্রাসাদের বহির্দেশে রাত্রির জন্য ছাগবাহিনীর অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। যাই হোক, তিনি এসেছিলেন, কেউ কেউ বলে তিনি স্কন্ধে একটি ছাগ শিশুকে বহন করছিলেন, আর তাঁকে অনুসরণ করে উঠেছিল হাজার হাজার ছোট ছোট ক্ষুরের ধ্বনি। অধিকন্তু তিনি এসেছিলেন প্রবল করুণা নিয়ে—মানুষেরই মতো যারা সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর জালে আবদ্ধ, মোহে ও দুঃখে বিভ্রান্ত অথচ মানুষের মতো বাক্‌শক্তির অভাবে নিজেদের উদ্বেগ ও মুক্তির বাসনাকে প্রকাশ করতে অক্ষম,—মানুষের সেই অসহায় 'ক্ষুদ্র ভ্রাতৃবর্গের' জন্য সহানুভূতির প্রবল আলোড়ন তাঁর হৃদয় মথিত করেছিল। নিশ্চয়ই সেই শান্ত, চতুষ্পদ চলমান জীবগুলি তাঁকে ঘিরে ধরেছিল এবং তাঁর গায়ে গা ঘসে করুণা প্রার্থনা করেছিল! কারণ ইতর প্রাণিগণ নীরব ভালবাসার প্রতিদানে আশ্চর্যভাবে সাড়া দেয়, যদি সে ভালবাসায় তাদের জীবন বা মুক্তির বিরোধী কোন অভিসন্ধি না থাকে। সারা পৃথিবীর উপকথা আমাদের বলে যে, তারা অনুভব করতে পেরেছিল খৃষ্ট আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যার প্রশান্তি, সক্ষম হয়েছিল শিশু ধ্রুবের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে, এবং রাজগৃহের প্রাসাদ অভিমুখে প্রসারিত পথের উপর দণ্ডায়মান ভগবান বুদ্ধের আঁখিদুটিতে তাদের রক্ষা করবার জন্য যে সীমাহীন ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছিল তাও তারা বুঝতে পেরেছিল।

ঐ স্থানে উপনীত হবার কিছুকাল পরে আমরা লক্ষ্য করলাম

যে, আমাদের নীচে নদীর মধ্যে অবস্থিত একটি বিশেষ ক্ষুদ্র দ্বীপে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই গ্রামের চিতার আগুন জ্বলতে দেখা যায়। জনপদভূমির সীমানার বাইরে নদীতীরবর্তী স্থানে মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থা ভারতের অতি প্রাচীন প্রথা। কিন্তু গ্রাম থেকে এই বালুকাময় স্থানটি বহুদূরে অবস্থিত। এর চেয়ে অধিক দূরধিগম্য স্থান নির্বাচন আর সম্ভব ছিলনা। ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এর একটা ব্যাখ্যা আছে ; পঞ্চম বা প্রথম খৃষ্টাব্দ কিংবা তার চেয়েও শত শত বৎসর পূর্বে পূর্বপুরুষগণ মৃতের সংকারের জন্য যে স্থান নির্বাচন করেছিলেন, এই বিংশ শতাব্দীর কৃষি-নির্ভর অধিবাসীদের শ্মশান-ঘাটকে ঠিক সেখানেই অবস্থান করতে হবে—এর অর্থ, হয়তো তখন এ স্থানটি পুরাতন রাজগৃহের সীমানার ঠিক বাইরেই ছিল। একে এক অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ, হয়তো বা নিষ্ক্রিয় মনোভাব বলা যায় যে, পূর্বে কল্পনাও করা যায়নি এমন স্থানে বৃক্ষশ্রেণীকে অরণ্যে পর্যবসিত হোতে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শ্মশানের দূরতমপ্রান্তে যাবার পথ ধরে ঠিক কতদিন সন্ধ্যায় হাঁটবার পব আমাদের একজন গ্রন্থিল তেঁতুল ও বটগাছের মধ্যে রাজগীরের প্রাচীন ঘাটের ভগ্ন সোপানাবলী আবিষ্কার করলেন তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তেমনি কতদিন পরে বলতে পারি না, আমাদের একজনের মনে অন্তর্দৃষ্টির আলো ফুটে উঠল, যার ফলে পবিশেষে আমরা নিকটস্থ ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে প্রাচীন নগরীর প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম। শহরের এই প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়েই বুদ্ধ স্বয়ং সেই ছাগবাহিনীসহ এসেছিলেন ; কয়েক ফুট দূরে ধূলায় লুণ্ঠিত প্রাচীন স্তূপের গম্বুজাকার শীর্ষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হোল।

এই নগর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে রঙ্গমঞ্চের মতো দেখতে উপত্যকাভূমির উন্মুক্ত বক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পেলাম, নগরের মধ্য দিয়ে একটি ধারায় প্রবাহিত হোলেও নদীটি দুই দিক দিয়ে পর্বত-মেখলা ও প্রাচীর আবেষ্টনীঘেরা রাজগৃহ নগরটিকে পরিখার

মতো বেষ্টন করে আছে। দুটি পৃথক ধারা এখানে পুনর্মিলিত হয়েছে। যাঁকে ভারতের মেরী ম্যাজডোলেন বলা যায়, সেই অম্বপালীর উদ্যানের বামদিক দিয়ে এবং বুদ্ধের জীবনকাহিনীতে যে সব চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় তাদের আবাস স্থল ছাড়িয়ে যে ধারাটি প্রবাহিত হোয়ে চলেছে, তাকে ছেড়ে ডানদিকে প্রবাহিত ধারাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়।

এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক আবিষ্কারের জগৎ। এদিকের পথটি নদীর কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে এবং ধাপে ধাপে পা ফেলে জলটুকু পার হওয়া যায়। বোঝা যায় যে, এই সোপান-শ্রেণী এক প্রাচীন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ। স্পষ্টতঃ আজকের মতোই পঁচিশ শতাব্দী পূর্বেও ভারতীয় সভ্যতায় স্নান এবং স্নানের ঘাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। তারপর ডানদিকে পর্বত-মালার গা ঘেসে নদীর কিনারা থেকে কম বেশী পঞ্চাশগজ দূরত্ব রেখে পথটি চলে গেছে। নগরীর মধ্যে এই পথটির মধ্যস্থলে পর্বতের সম্মুখে একটি বিরাট গুহা দৃষ্ট হয়। এখনও গ্রামাঞ্চলের কৃষককুলের নিকট গুহাটি 'সোনভাণ্ডার' অথবা স্বর্ণময় কোষাগার নামে পরিচিত। গুহার অভ্যন্তর বেশ মসৃণ, অসমান নয়, মধ্যস্থলে একটি স্তূপ আছে,—এ পর্যন্ত যত স্তূপ দেখেছি তার মধ্যে প্রাচীন-তম। মনে হয়, কোন দস্যুদল স্তূপটিকে লুণ্ঠন করতে এসে মধ্যপথে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। গুহাটির বহির্দেশ লতাগুল্মে অর্ধ আচ্ছাদিত। যেখানে কাষ্ঠনির্মিত, অলঙ্কৃত কপাট ছিল এখনও সেখানে আটকাবার খাঁজগুলি বর্তমান। এই প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি, দূরে নগরের মধ্যস্থলে ৪০৪ খৃষ্টাব্দে ফাহিয়ান কর্তৃক অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট ক্ষুদ্র স্তূপের গম্বুজ অথবা প্রাসাদের পূর্বদিক-সংলগ্ন কূপটি আজও তেমন রয়েছে।

সুতরাং এই গুহাটি ছিল প্রাচীন রাজগৃহের মুখ্য ধর্ম মন্দির। এখানে নিশ্চয়ই বুদ্ধ বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, ধ্যান করতেন, হয়তো

বা ধর্মশিক্ষা দিতেন। আমাদের মধ্যে একজন ইঙ্গিত করলেন যে, এখান থেকে একটি সোজা পথ দিয়ে নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদের সংযোগ ছিল। এই সূত্র ধরে আমরা বন্য গাছপালা সরিয়ে যোগাযোগ রাস্তাটির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। গুহার বহির্দেশে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত একপ্রকার আলকাতরা ঢালাই করা সমতল মেঝে দেখলাম—যেন একরকম ভেনিশীয় প্লাজা দ্য সাঁ মার্কো (Plaza de San Marco)। স্পষ্টই বোঝা যায়, এটি ছিল শহরের চত্বর। এক প্রাচীন চৈনিক সূত্ত (Sutta) গ্রন্থে রাজগৃহের একটি স্থানের উল্লেখ আছে, যেখানে ময়ূরদের খাদ্য দেওয়া হোত। 'যেখানে ময়ূরদের খাদ্য দেওয়া হোত'—প্রথম এই কথাগুলি পড়বার পর আমাদের মন ঐগুলির উপরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন উল্লিখিত সেই স্থানটির উপরেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কারণ সন্দেহ নেই, যেমন সেণ্টপল গির্জার বহির্দেশে পায়রাদের আহার দেওয়া হয়, তেমন এই প্রাচ্য দেশীয় নগরীর প্রধান ধর্ম মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট আলকাতরা ঢালাই করা চত্বরে ময়ূরের দলকে শস্যদানা দেওয়া রাজকীয় মর্যাদা ও বদান্যতা প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই পীচ ঢালা পথটি নদী পর্যন্ত, এমন কি নদী পার হোয়েও বিস্তৃত। আজও প্রাচীন সেতুর তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, যদিও সেতুর খানিকটা বসে গেছে, তথাপি এর উপরে আজও আমরা হেঁটে বেড়াতে পারি। এই পথ ধরে সহজেই আমরা চলে যেতে পারি রাজপ্রাসাদে। প্রাসাদটির ভিত্তিভূমির চারিদিকে বুরুজ ও গম্বুজশ্রেণী আজও তার সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করছে। কিন্তু পুনরায় যদি আমরা সেতুটির দিকে মুখ করে দাঁড়াই, দেখতে পাব, যে দিক দিয়ে এসেছি, নদীর তীরভূমির উপর দিয়ে সেই আলকাতরার ঢালাই বরাবর চলে গেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে এত সব কখনও আমাদের চোখে পড়ত না, যদি না চাপ চাপ আলকাতরার ঢালাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এই কী সেই প্রাসাদের বিপরীতমুখী নদীতীর, যা পশ্চাদ্‌বর্তী খাড়া পাহাড়গুলি দিয়ে সুরক্ষিত? এবং এরই পাশ দিয়ে শহর-চত্বর থেকে স্নানের ঘাট পার হোয়ে আরও দূরে শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত যে পথটি বিস্তৃত হয়েছে—সেটিই কী প্রাচীন নগরীর রাজপথ? যখন প্রায়ই আমরা দিনের পর দিন চিন্তামগ্ন হোয়ে এই পথটুকু অতিক্রম করি, তখন অধিকাংশ সময় পূর্বে-না-দেখা কোন গাঁথনির কাজ কিংবা রাজমিস্ত্রীর হস্তক্ষেপের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উভয় পার্শ্বে অট্টালিকার দুটি ধ্বংসাবশেষ এমন ভাবে পড়ে আছে যে, মনে হয় নদীর ধারে প্রাচীরের উপর একটি বসবার আসন তৈরী হয়েছে। আবার সোপান চিহ্ন বা কোন অলঙ্কৃত দেওয়ালের ভগ্নাবশেষও পড়ে আছে। নদীর অপরতীরে এক স্থানে মাটির স্তূপ ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে ডুবে আছে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ যা একেবারে নদীগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত; যদি এর তলদেশে সিমেণ্ট বা আলকাতরার প্রলেপ না থাকত, তাহলে পম্পিআই (Pompeii) ও হারকুলেনিয়ামের (Herculaneum) জন্মের পূর্ববর্তী কালের রাজপথ বলে মনে হোত, বর্তমানে যাকে কেবল একটি গিরিখাত বলে মনে হচ্ছে।

কেমন ছিল এই সব পায়ে-চলা-পথের সংলগ্ন বাড়িগুলি? সেই গৃহগুলির অভ্যন্তরে যে জীবন যাপিত হোত তাই বা কী ধরনের? কতকাল ধরে এই স্থানটি নগরের রূপ ধারণ করেছিল এবং কত-দিনই বা তার অস্তিত্ব ছিল? আজ যা শ্রীহীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, রাজন্যবর্গের বাসস্থানের চরম গৌরবের দিনে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ ছিল? এইরূপ শত সহস্র প্রশ্ন আমাদের মনে এককালে উদিত হয়,—তার মধ্যে কতগুলি প্রশ্নেরই বা আমরা উত্তর দিতে পারব? গিরিগাত্রে অবস্থিত উদ্যান, যা একদা ছিল পর্বতশ্রেণীর আবরণস্বরূপ এবং প্রাসাদ থেকে তোরণদ্বার ও তাকে অতিক্রম করে গিরিপথ ধরে সমতলভূমি পর্যন্ত সমগ্র দৃশ্যকে অপূর্ব

মনোরম করে তুলত, সেই উদ্যানের মৃত্তিকা গত পঁচিশ শতাব্দী-ব্যাপী ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকালীন প্রবল বর্ষণে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত যে সব বন্ধুর শিলারাশি, তার মধ্যে মধ্যে লালপাথরের জালিকাটা যে কৃত্রিম চত্বর তা আজও মসৃণ ও সমান রয়েছে। আজও কোন পর্যটক এমন কোন স্থানে এসে দাঁড়াতে পারেন, যেখান থেকে মহারাজ বিম্বিসার তাঁর পিতৃপিতামহের রাজ্যের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। অথবা দু-একটি স্থানে কিঞ্চিৎ অসুবিধার সম্মুখীন হোলেও প্রাচীন প্রমোদ কানন থেকে যে পথ দিয়ে রাজশিকারীর দল বনপথের দিকে যাত্রা করত, তার চিহ্ন খুঁজে পেতে পাবেন। সত্য, সেই রাজতন্ত্র যুগের গিরিশীর্ষ এবং গিরিগাত্র আবৃত করে বিপুল বনভূমির ঐশ্বর্য আজ আর নেই। সেদিন যেন স্থানটি ছিল স্বর্গপুরী! রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করে ছিল এক রাজোদ্যান। আজ সেই সব উন্নত শীর্ষ বৃক্ষরাজির স্থান অধিকার করে আছে বন্যগাছপালা, গভীর ঝোপঝাড়, আর এখানে সেখানে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে বহির্গত এক আধটা বাঁকা তালগাছ। তথাপি আজও ধ্বংসস্তূপে পরিণত নগরীর পশ্চাতে দক্ষিণপূর্ব গিরিপথ থেকে একে বেষ্টন ও রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে চওড়া দুটি প্রাকার।

যে পর্বতটির অভ্যন্তরে 'সোনভাণ্ডার' নামক গুহাটি অবস্থিত তারই গায়ে চৌকো খাঁজকাটা গর্তগুলি আমাদের কল্পনায় প্রাচীন নগরটিকে পুনর্গঠিত করে নেবার সুযোগ দেয়। এই খাঁজগুলি গুহার সম্মুখভাগে কারুকার্য করা কাঠের কপাট লাগাবার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভারতের পশ্চিম ভূখণ্ডে কার্লে পর্বতে আর একটি গুহা আছে, যদিও উহা অনেক পরবর্তীকালের, তথাপি একই ধরনের এবং একই যুগের অন্তর্গত, এবং সেখানে অলঙ্কৃত কাষ্ঠ নির্মিত সম্মুখভাগ আজও অক্ষত। তাছাডা এর উপরে ফার্গুসন বর্ণিত একটি প্রাচীন

রাজপথের দৃশ্য খোদাই করা আছে, তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকার তিনতলার সম্মুখভাগ কাঠের অলিন্দ, দেউড়ি, কুলঙ্গী প্রভৃতি এবং আরও সুন্দর সুন্দর অসমান ও খাঁজকাটা কোণ সৃষ্টি করে অলঙ্কৃত করা হোত। কিন্তু কেবল বাড়িগুলির সৌন্দর্যের জন্য তাদের উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা নয়, কারণ প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচীর প্রবেশপথে গুহা চিত্রের মধ্যেও ঐ সকল অলঙ্করণ খোদিত দেখা যায়। এর থেকে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে, মহারাজ বিম্বিসারের প্রাসাদ এবং তাঁর প্রজাবর্গের ঘর বাড়ি কি ধরনের ছিল। রাজপ্রাসাদের দ্বিতল ছিল বিশালাকার, উপর ও অভ্যন্তরভাগ ঢালু। পলায়নের সুবিধার জন্য বিশেষ ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর গাত্রের চার দিকে চারটি গোলাকার বুরুজ (tower) চারটি স্তম্ভের মতো প্রাসাদটিকে ধারণ করে রেখেছিল। দ্বিতলটি কেবল প্রস্তরদ্বারা নির্মিত ও চারিদিকে যুদ্ধপ্রাকার পরিবেষ্টিত। এই দুর্গ শীর্ষের চত্বরের উপর নির্মিত হয়েছিল পারিবারিক বাসস্থানের জন্য কাষ্ঠ নির্মিত ও অলঙ্কৃত কক্ষগুলি। উজ্জয়িনী শহরে মাটির নীচে চাপা পড়া যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, পাণ্ডারা তাকে বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ বলে অভিহিত করে। কিন্তু দেখে মনে হয়, ঐগুলি অশোকের রাজত্বকালের দুর্গ এবং যুদ্ধকালে নারীগণকে উপরের দুর্গ থেকে নিম্নতলে নামিয়ে আনা হোত। বহুকালের ব্যবধানে প্রায় কালো দেখতে, কিন্তু আসলে ছাই রঙ-এর শক্ত পাথরে নির্মিত প্রাসাদের ভিতর দিকের একটা কোণ এবং প্রাঙ্গনের অংশ এখানে পড়ে রয়েছে। এ ধরনের বাড়ি সাঁচীর স্থাপত্যরীতি অনুসারে রাজা অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আবাসস্থল বলে ধারণা করতে প্রবৃত্ত করে। বহির্দেশে প্রায় নীরেট প্রাচীর এবং ভিতরের দিকে মৌচাকের মতো অসংখ্য স্তম্ভবহুল একটানা কক্ষশ্রেণী ও অলিন্দ ; একটি কক্ষের মেঝে যথেষ্ট

উচ্চ, যা হোল ভারতীয় ধরনে একই সঙ্গে শয়নকক্ষ ও শয্যাধার। শান্তির সময় এগুলি সশস্ত্র বাহিনীর পরিবারবর্গের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হোত বলে মনে করতে পারা যায়। প্রাসাদটি এত বিশাল যে প্রাকৃতিক শিলাস্তূপের মতো দেখায়। যে কয়েকটি স্তম্ভ আজও অক্ষতভাবে বর্তমান, তাদেব মধ্যে পর পর বিভিন্ন সময়েব রাজগণ কর্তৃক নানা রীতিতে অলঙ্কৃত। তা সত্ত্বেও এগুলি সাদাসিধে। সাঁচীর বিষয় যাঁরা জানেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এই ধরনের সাদাসিধে অলঙ্করণ অশোক অথবা তার পূর্ববর্তী যুগের।

আমরা ধরে নিতে পারি যে, আকারে ক্ষুদ্রায়তন এবং তুলনায় অপরিসর হোলেও রাজগৃহের রাজপ্রাসাদ এই ধরনেরই ছিল। বিভিন্ন পথের সংলগ্ন সাধারণ নগরবাসীর ঘরবাড়িগুলিও আকারে আরও ছোট এবং একসঙ্গে পরস্পর ঘন সংবদ্ধ হোয়ে থাকলেও ধরন একই বলে মনে হয়। সত্যই ঐ বাড়িগুলির নিম্নতল আধুনিক রাজগীরের তীর্থযাত্রীদের বাসের জন্য নির্মিত কুটিরগুলির মতোই অভিজাত প্রস্তরের পরিবর্তে খোয়া বা কাদামাটি দিয়ে তৈরী হোত। কাদামাটি, খোয়া প্রভৃতি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অবশেষে ঢিপি বা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই সব ভগ্নস্তূপ থেকে নদীতীর পর্যন্ত সমগ্র স্থানটিতে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত মাটির পাত্র যে কেউ কুড়িয়ে পাবে। কিন্তু দোকান ও বাসগৃহগুলির সম্মুখ এবং ঊর্ধ্বভাগ নিঃসন্দেহে খোদাই করা কাঠ দিয়ে তৈরী ছিল। এ বিষয়ে প্রধান ধর্ম মন্দিরের সম্মুখভাগে শহরের জীবনরীতির একটি সত্যকার চিত্র প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে সেই প্রথম যৌবনের প্রাক্‌কালে বালকমাত্র (a lad in his first youth) শাক্যমুনি এই রকম পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর প্রাসাদশীর্ষ থেকে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন রাজা বিম্বিসার। বিম্বিসার প্রদত্ত কোন সম্মানই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। কারণ দারিদ্র্যেই

ছিল তাঁর আনন্দ। 'এই গার্হস্থ্য জীবন বেদনাময়, যিনি উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করেন, তিনিই কেবল মুক্ত (This life of the household is pain, free only is he who lives in the open air)'—এই চিন্তার বশবর্তী হোয়েই তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন।

রাজগৃহ থেকে বহু দূরে, রাজপুতানার উত্তরে, অম্বর ও জয়পুর নামক দুটি শহর অবস্থিত। বহিরাগত যে কোন পর্যটক ভারত ভ্রমণে এলে এই দুটি শহর দেখবার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে অম্বর পাহাড়ের উচ্চভূমির উপর এবং জয়পুর সমতল ভূমিতে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে অম্বর অধিকতর প্রাচীন। ভারতের সুপ্রাচীন বিধি হোল, কোন জনপদ হাজার বছরের অধিক এক নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে না। ধরে নেওয়া হয়, মহামারী প্রভৃতি অশুভের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় হোল পুরাতন স্থান পরিত্যাগ করে নূতন স্থান অধিকার করা। এই অনুশাসন অনুযায়ী নূতন জয়পুর নগরীর পত্তন। সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোলে মহারাজা তাঁর প্রজাবর্গসহ নূতন নগরীতে প্রবেশ করেন।

ভারতে অম্বর ও জয়পুরের ইতিহাস আধুনিক এবং রাজপুত জাতির স্মৃতিতে তা অদ্যাপি উজ্জ্বল; এই ইতিহাস প্রাচীন রাজগীরের ইতিবৃত্ত উদ্ধারের ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শকের কাজ করে। কারণ বুদ্ধের জীবনকালে বিম্বিসারের পুত্র সেই হতভাগ্য রাজা অজাতশত্রু, যাঁর জীবন পিতৃহত্যার রক্তে কলঙ্কিত, তিনি অনুভব করলেন, রাজধানী স্থানান্তরিত করার সময় উপস্থিত এবং তদনুসারে উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে পূর্বের অনুরূপ প্রাকার ও তোরণদ্বারবিশিষ্ট এক নূতন নগরীর পত্তন করেন। আজও দেখা যাবে—উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে বর্তমান রাজগীর গ্রামখানির পশ্চিমে তৃণাচ্ছাদিত ধ্বংসাবশেষ, নূতন রাজগীরের স্মৃতিসৌধস্বরূপ পুরাতন নগরীর সমাধিস্থান।

বুদ্ধের সেই পরম ত্যাগের (Great Renunciation) দিনে বিম্বিসার ছিলেন মগধের রাজা। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর রাজা হলেন অজাতশত্রু। পুরাতন পার্বত্যভূমির উপর অবস্থিত দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র নূতন দুর্গ নির্মাণের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের সময়ের পাঁচ শতাব্দী পূর্ব থেকে প্রাচীন রাজগৃহের স্থলে এক শহর অবস্থিত ছিল।

এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, রাজগীরে কেবল রাজপ্রাসাদ এবং প্রাসাদ সংলগ্ন কক্ষগুলিসহ নূতন নগর গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গ্রামের পূর্বপুরুষদের নূতন জনপদ-রূপেই নগরটি গড়ে ওঠে। তাব প্রমাণ দুইশত বৎসর পরে দেখতে পাওয়া যায়, যখন মহামতি অশোক যে বুদ্ধকে সম্মান করে আনন্দ অনুভব করতেন, তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রধান নগর তোরণেব বাঁদিকে ঐ উত্তর পশ্চিম কোণটি নির্বাচন করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি স্তূপ ও অনুশাসন খোদিত একটি অশোক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভের উপর অশোক যে সব অনুশাসন খোদাই করতেন,. সেগুলি যেন ঘোষণা স্বরূপ। সেক্ষেত্রে ঐ পর্বত ও স্তম্ভগুলি আধুনিক কালের সাময়িক পত্রিকার স্থান গ্রহণ করত, যেহেতু রাজাজ্ঞা জ্ঞাপনের উপায় হিসাবেই তারা গৃহীত হোত। এর থেকে বোঝা যায় যে, জনপদভূমি থেকে বহুদূরে ঐ শিলালিপিগুলির স্থান নির্বাচন করবার কোন কারণ ছিল না। সাবনাথের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ বৌদ্ধ বিহারভূমির দরজায় বা প্রাঙ্গনে অবস্থিত দেখা যায়। অনুরূপভাবে পাটলিপুত্রে শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভগুলির যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, ঐগুলি রাজ নির্দেশে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের উদ্দেশ্যে যে প্রাচীন বন্দীশালা ছিল সেই স্থানে অথবা বন্দীশালার অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল।

অতএব ধরে নেওয়া যায়, বিম্বিসারের উত্তরাধিকারীর সময়ে

প্রাচীন রাজগৃহ পরিত্যক্ত হয়, যদিও পরবর্তীকালে বর্তমান অম্বরের মতো কখন কখন রাজ আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হোয়ে থাকতে পারে। বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের মধ্য দিয়ে বার বার যাতায়াত করতেন এবং সকলের দ্বারা মহাসম্মানিত অতিথিরূপে স্বীকৃত হতেন তখনি নগরটি যথেষ্ট সুপ্রাচীন। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, ধ্বংস-প্রাপ্ত পথঘাটগুলি অতিক্রম করে 'সোনভাণ্ডারে'র গুহায় আজও বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বরের শাশ্বত প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

কেন তিনি এপথে আদৌ এলেন? রাজধানীকে কেন্দ্র করে যে সুধী সমাবেশ ঘটে থাকে তার জন্যই কী? পরবর্তীকালের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কী তখনি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যেখানে এলে সে যুগের সমগ্র জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যেত? যাই হোক মনে হয়, যখন তিনি এ স্থান অতিক্রম করেন তখনি অন্তরের মহা ঐশ্বর্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে, প্রয়োজন ছিল দীর্ঘদিন ধরে প্রগাঢ় ধ্যানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ। এখানে আগমনের পূর্বেই তিনি সত্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন; সেজন্যই জ্যা-মুক্ত তীরের মতো সোজা গিয়েছিলেন নির্জন বেলবৃক্ষ বনে, নদীতীরবর্তী গুহায়, সেই শস্যক্ষেত্র ও পুষ্করিণীর মধ্যবর্তী বিরাট বৃক্ষতলে—যেখানে আজ বর্তমান বুদ্ধ-গয়ার ক্ষুদ্র গ্রামটি অবস্থিত।

প্রাথমিক শিক্ষা—
অগ্রগামী শিক্ষক-সৈনিকদের প্রতি আহ্বান

আমাদের সকলেরই ভাল করে জানা আছে যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর। শিল্প ও বাণিজ্য যে কম দরকারী তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সকল বিষয়ে উন্নতি করা সম্ভব, অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট যেন সব পথ রুদ্ধ। আমরা একথাও জানি যে, শিক্ষাকে যথার্থ কার্যকরী করতে হোলে নিম্নতম ও সাধারণ ক্ষেত্র থেকে উচ্চতম ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রসারিত করতে হবে। Technical Education বা কারিগরী শিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন Higher Research বা গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ Higher Research অর্থাৎ উচ্চ গবেষণাকে লক্ষ্যগোচর না রেখে কেবল কারিগরী শিক্ষা বৃক্ষকাণ্ডবিহীন পল্লবিত শাখা অথবা মাটির নীচে প্রাণরসবাহী মূল শিকড় ব্যতীত অঙ্কুরিত পত্রপুষ্পের মতোই অবাস্তব। পুরুষের শিক্ষার যেমন আবশ্যক, নারীর শিক্ষারও অনুরূপ প্রয়োজন আছে। লৌকিক শিক্ষা বা অপরা বিদ্যার (Secular Education) ন্যায় ধর্মশিক্ষারও একান্ত আবশ্যক। এবং এই সকল শিক্ষার যে কোনটি অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হোল 'জনশিক্ষা', আর এই শিক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই স্ব-নির্ভর হোতে হবে।

আমাদের সভ্যতা কোনদিনই একজন নাগরিককে তার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে পরাঙ্মুখ হয়নি। এ দেশে নিতান্ত দীন দরিদ্রও নিরন্নকে অন্ন দিতে কাতর হয়েছে দেখা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, অন্নদান অপেক্ষা জ্ঞানদানের প্রয়োজন অধিকতর। দেশের সংহতিকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলতে অন্য কোন পথ নেই।

বাস্তবিক, যদি জাতির একটি শ্রেণী বিশেষ কোন ভাবসমষ্টি থেকে সর্বপ্রকার মানসিক পুষ্টি সঞ্চয় করে এবং অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশটি অন্য ভাবধারায় পুষ্ট হয়, তবে তার অন্তর্লোকে যে ঐক্য নিত্য বিরাজিত, তাকে বাইরের জীবনে কোথাও কার্যকরী করা যায় না। কিন্তু দেশের সকলেই যদি একই ভাষায় কথা বলে, একভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে শেখে, সমান ভাবাদর্শেই তাদের অনুভূতি প্রেরণা পায়, যদি সমগ্র জাতি যে কোন আদর্শে সমভাবে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত ও অভ্যস্ত হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ হোয়ে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই আমরা জাতীয় সংহতি এবং তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মশক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব। সর্বজনীন শিক্ষার এই ধারা অবলম্বনেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং কেহই তখন আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না।

এই উদ্দেশ্যসাধনে আমাদের স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে বলে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা বলতে প্রথমতঃ লিখন পঠন ও গণিতবিদ্যা বোঝায়। যতদিন আমরা নিজেরাই এই ভার বহনে সমর্থ, ভাষার ভৌগলিক সীমা বা প্রভেদ আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে ব্যবধানের সৃষ্টি না করলে এতদিন উড়িষ্যা, বাংলা এবং বিহার এক ভাষাতেই কথা বলত, একই বর্ণমালা ব্যবহার করত এবং একই মহান্ সুসংবদ্ধ সাহিত্য প্রামাণিক হিসাবে উদ্ধৃত হোত। ভাষাসমস্যাকে সরল করবার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু করতে হবে, এবং সেজন্য কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত কোন প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা নিজেদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা অনেক গুণ বেশী কার্যকরী ও অনন্তগুণে শ্রেয়ঃ হবে।

নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা বহন করবার অন্যতম সুবিধা এই যে, এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা সম্ভব। এতে বাইরের কোন

শক্তিশালী প্রভাবের উপর নির্ভর করতে হয় না। কেন্দ্রশক্তির যতই অদল-বদল ও পরিবর্তনাদি হোক, যে উদ্যম জাতির ধমনীতে এইভাবে প্রবাহিত থাকে, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা কোথাও ব্যাহত হোতে পায় না।

জনসাধারণকে শিক্ষাদান আমাদের একটি পবিত্র কর্তব্য বা ধর্ম—এই ভাবটি সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জাতির মনে গেঁথে দিতে হবে। ভিক্ষাদানের আদর্শ আমাদের পূর্ব থেকেই রয়েছে। শিক্ষাদান সেই আদর্শের প্রসার মাত্র।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একটি নিয়ম আছে। শিক্ষা সমাপ্ত হোলে প্রত্যেক যুবককে তিন, চার বা পাঁচ বছর ধরে সামরিক বিভাগে কাজ করতে হয়, তাকে রীতিমত Barrack বা সেনানিবাসে গিয়ে সৈনিক তালিকাভুক্ত হোয়ে খাঁটী সৈনিকের মতোই পরিপূর্ণ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সে স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হয়। নির্দিষ্ট কার্যকাল উত্তীর্ণ হোলে সে যখন সেনাবিভাগ থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে একজন সুশিক্ষিত সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী জীবনে সে সর্বদাই স্বদেশরক্ষার্থে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

অনুরূপভাবে আমাদের একটি শিক্ষাসৈনিকদল গঠন করতে হবে। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর প্রত্যেক ছাত্রকে তার স্বদেশবাসীর জন্য তিন বৎসর সময় উৎসর্গ করতে আহ্বান জানানো হবে। এমন একটি প্রস্তাব অসম্ভব মনে করবার কারণ নেই। অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশে যেমন সামরিক বিভাগ বিধবার একমাত্র পুত্রকে সামরিক দায়িত্বপালন থেকে অব্যাহতি দেয়, তেমনি এখানেও যার উপার্জন সমগ্র পরিবারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, তাকে এই শিক্ষাসংক্রান্ত সেবাকার্য থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। অপরপক্ষে যে ছাত্রটি শিক্ষাব্রতী হোয়ে গ্রামে বাস করবে, গ্রামবাসীরা অনায়াসে

তার ভরণপোষণের ভার বহন করতে পারবে। এইভাবে উক্ত শিক্ষাব্রতীর তিনবছর কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার পর সে তার পুরাতন বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে আর একজনকে আনিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিয়ে যাবে। কে জানে, এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অনাড়ম্বর সরল পল্লীজীবনকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় দরিদ্র শিক্ষকের জীবন বরণ করে আমরণ গ্রামেই কাটিয়ে যাবে! অধিকাংশই অবশ্য তিন বৎসরের ব্রত পালনান্তে শহরে প্রত্যাবর্তন করে অধিকতর জটিল নাগরিক জীবনে ফিরে যাবে। একদিকে শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য, অপরপক্ষে শিক্ষকের ভরণপোষণের দায়িত্ব —এইভাবে শিক্ষক ও যারা শিক্ষালাভ করবে উভয়ের সম্মিলনে একটি সুন্দর সামাজিক আত্মীয়তা বা ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে। এইভাবে উপরি উক্ত আদর্শকে যদি একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপূর্ণ-ভাবে কার্যে রূপায়িত করা যায়, তাহলেও সমগ্র জনসাধারণকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ত্রিশ বৎসর লাগবে। কিন্তু এই সঙ্গে প্রাচ্য পদ্ধতিকে আমরা কদাচ উপেক্ষা করব না, যার বৈশিষ্ট্য হোল সামান্যতম সমাজসেবাকেও আত্মনির্ভর ও আত্ম-প্রচারশীল করে তোলা। যে বীজ অঙ্কুরিত হোয়ে সুপরিপক্কতা লাভ করেছে, তাকে পুনরায় চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে ভারতবর্ষ কখনো ভোলে না। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর শিক্ষাদানের স্পৃহা জাগ্রত করবার প্রয়াসও চলবে। 'শিক্ষককে অন্নদান' এবং 'জনসাধারণকে জ্ঞানদান' একই আদর্শের দুই পিঠ এবং একসঙ্গে সমানভাবে তা শেখাতে হবে।

কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই এইরূপ একটি পরিকল্পনার ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে পারবে না। জনসাধারণের ও ছাত্রদের সম্মিলিত আবেগই কেবল এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়। একথা সত্য যে, মৌলিক চিন্তার বা ভাবের প্রথম স্ফুরণ ঘটে শহরে, কিন্তু সেই ভাব প্রসারিত

হোলে তার সফলতা নির্ভর করে এই আদর্শের বেদীমূলে কতগুলি জীবন বলি দেওয়া যেতে পারে তার উপর। শেষ পর্যন্ত সব নির্ভর করবে কতগুলি মহৎ প্রাণ এই উদ্দেশ্যসাধনে উৎসর্গীকৃত হবে তার উপরে। জীবনদান ব্যতীত মানসক্ষেত্রে ছড়ানো আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কতজন তাঁদের আরাম, আবাস, সুযোগ-সুবিধা এমন কি, সমগ্র জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছেন ?

ভারত-রমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা

এখানে—ভারতে, ভবিষ্যৎ রমণীর চিন্তা আমাদের হৃদয় অধিকার করে আছে। তাঁর সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। তাঁর কণ্ঠস্বর সতত আমাদের আহ্বান করছে। যতদিন না আমরা তাঁর জন্য উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করছি, জীবনের সকল রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে অগ্রসর হোয়ে হাত ধরে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করছি, ততদিন এই মাতৃভূমি বিশ্বের দরবারে অপার সহিষ্ণুতার সঙ্গে অবনতদৃষ্টিতে, নিষ্ক্রিয় ও অবগুণ্ঠিতা হোয়ে অবস্থান করবেন। সেই মহা দেশমাতৃকার আনন্দোজ্জ্বল রূপ পুনরুদ্ভাসিত করতে হোলে, প্রথমেই তাঁর কন্যাগণের—সেই উত্তরকালের ভারত-কন্যাগণের, তাঁকে কেন্দ্র করে দলে দলে সমবেত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যখন এই কন্যাগণ তাঁদের গর্বোন্নত মস্তক দ্বারা দেশমাতৃকার চরণ স্পর্শ করে সঙ্কল্প গ্রহণ করবেন স্বামি-পুত্রের সঙ্গে নিজ জীবন উৎসর্গের, তখনই কেবল ভারত-জননী বিজয়-মুকুটে ভূষিতা হোয়ে সমুন্নত শিরে বিশ্বসভায় দণ্ডায়মান হবেন। আজ তাঁর দেবালয় তমসাচ্ছন্ন। যেদিন ভারত-রমণীগণ জাতীয়তার মহারতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন, সেদিন আবার এই দেবালয় আলোকে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠবে। আব অচিরেই দেখা দেবে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক।

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই এই সঙ্কটকালে স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত। নারীজাতির সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত বর্তমান যুগের কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে সাধিত হোতে পারে না। বর্তমানের সমস্যা-সমূহ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই। যদি আমাদের প্রত্যেকের জীবন দেউলে সেই বিশ্বজননীকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তবে আমাদের হৃদয় তাঁকে দান করেছি এ কথা বলা কি অসার দম্ভ নয়!

কোন নূতন ধরনের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবাসীর সঙ্কোচের কারণ তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশয়। এ বিষয়ে জনমন বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছে। অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁদের প্রাচীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁদের নম্রতা ও ধর্মভাব, তাঁদের সহিষ্ণুতা এবং শিশুসুলভ সরল ভালবাসা ও করুণার গভীরতা বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্যের বিবিধ তথ্যসংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের আগ্রহ—যা পাশ্চাত্য শিক্ষার অমার্জিত ফল—তাই গ্রহণ করতে ব্যগ্র হব? এ বিষয়ে ভারতের উত্তর অতি স্পষ্ট। ভারতের মতে বর্তমানে নারীগণের অধিকতর আয়াসলব্ধ মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে নিলেও, প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে চরিত্র গঠন করতে অকৃতকার্য হওয়া অপেক্ষা ঐ জাতীয় বিদ্যার্জন করতে অক্ষম হওয়াই শ্রেয়ঃ। যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে, তা প্রকৃত শিক্ষা হোতে পারে না। মধ্য ও বর্তমান যুগে এই গুণগুলির প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন ধরনের হোতে পারে, কিন্তু উভয়যুগেই তাদের প্রয়োজন আছে। যে কোন গ্রহণযোগ্য শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দৃঢ় চরিত্র সংগঠন। বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন হবে তার গৌণ উদ্দেশ্য।

অতএব, ভারতীয় নারী সম্পর্কে যে প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে তা হোল এমন একটি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি পরস্পরের সহযোগিতায় পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। একবার সাফল্যের সঙ্গে ঐরূপ একটি শিক্ষাধারার পরিকল্পনা ও তার কার্যকারিতা যথাযথভাবে প্রদর্শিত হোলে, আমরা অনায়াসে দেখতে পাব যে, আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার এক নূতন যুগ উপস্থিত। প্রত্যেকটি সফল প্রচেষ্টা নব নব উদ্যমের সূচনা করবে। ইতিমধ্যে বিদেশে নারীজাতির কল্যাণের

জন্য প্রভূত উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন শুধু পথের নির্দেশ।

শিক্ষার প্রণালী উদ্ভাবন সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার পূর্বে আবশ্যক শিক্ষার লক্ষ্য বা আদর্শ নির্ণয়। শিশুদের উন্নতিকল্পে আমাদের চেষ্টার পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্যই কার্যকরী হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কোন্ আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হবে তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অধিকতর প্রয়োজন। অন্ততঃ এই আদর্শ নির্বাচনে বোধহয়, জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারবর্ষের সৌভাগ্য অধিক। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য যে দিকে দৃষ্টিপাত কর না কেন, সর্বত্র তাঁদের মহিমময় মূর্তি উদ্ভাসিত। ভারত তাঁদের মাতৃস্নেহে পুষ্ট করেছে, মর্যাদা দান করেছে, অনন্তকাল ধরে তাঁদের স্মৃতি পবিত্র করে রেখেছে।

কোন্ জাতীয় নারী চরিত্রকে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করব? নারী কি শক্তিশালিনী, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না, সঙ্কটকালে অবিচলিতা হবেন? তাহলে চিতোরের পদ্মিনী, চাঁদবিবি, ঝাঁসির রাণী কি নেই? নারী কি সাধিকা, কবি এবং দিব্যানুভূতিসম্পন্না হবেন? তাহলে আমাদের মীরাবাঈ আছেন। নারীকে কি আমরা মহিমময়ী, শাসনকুশলা, সম্রাজ্ঞীরূপে দেখতে চাই? তাহলে রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ এবং মৈমনসিংহের জাহ্নবী আর কোথায় আছেন? পাতিব্রত্যেই কি নারী চরিত্র অধিক উজ্জ্বল? তাহলে আছেন সতী, সাবিত্রী ও চির-মহিমময়ী সীতা। কৌমার্যে যদি নারীর অধিক বিকাশ, তবে রয়েছেন উমা। আর জগতের সমগ্র নারীজাতির মধ্যে গান্ধারীর ন্যায় অপূর্ব চরিত্র কি আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে?

অধিকন্তু এইগুলি গঠনমূলক। অর্থাৎ ভারতবর্ষের শিশুকে উল্লিখিত মহীয়সী নারীগণের যশ ও খ্যাতির সম্বন্ধে চিন্তা করবার

শিক্ষা না দিয়ে বরং তাঁদের পবিত্রতা, সরলতা, অকৃত্রিমতা—এক কথায় মূল চরিত্র অনুধ্যান করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ স্বকীয় এবং বিজাতীয় আদর্শের মধ্যে এই হোল প্রভেদ। প্রথমটির দ্বারা আকৃষ্ট হোয়ে আমরা অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, দ্বিতীয়টির সমাদর করে আমরা তার ফলগুলি পেতে চেষ্টা করি। ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীত্বের যে জাতীয় আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চ স্থান প্রদান না করে, তা কখনই ভারতীয় নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হোতে পারেনা।

কিন্তু নারীকে নিঃসন্দেহে সকল কার্যে নিপুণা হোতে হবে। মহীয়সী নারী ছিলেন বলেই সীতা ও সাবিত্রীর পত্নীত্বে উচ্চাসন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কাজ তাঁরা পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। উভয়েই সমাজের প্রত্যেকটি দাবী পূরণ করেছেন। একাধারে তাঁরা সম্রাজ্ঞী ও গৃহিণী, সাধিকা ও নাগবিক, অনুগতা পত্নী ও নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিনী, আবার বীরাঙ্গনা—তদানীন্তন জীবন নাট্যের প্রতিটি ভূমিকায় তাঁরা সমান নিপুণতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। পত্নীরূপে তাঁরা পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু যদি তাঁরা পরিণীতা না হতেন—কন্যা, ভগিনী এবং শিষ্যারূপেও অনুরূপ পূর্ণতা লাভ করতেন। এইভাবে জীবনের সকল অবস্থায় সমান দক্ষতা লাভ, পত্নীত্বের পূর্বে নারীত্ব এবং নারীত্বের পূর্বে মানবত্বে আরূঢ় হবার বৈশিষ্ট্য অর্জন—প্রত্যেক যুগে নারীশিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু বর্তমান ভারতের নীতিবোধ (moral ideal) জাতীয় ও পৌর চেতনার মধ্য দিয়ে এক নূতন পথে পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও নারীকে তার নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। আর ঐ ভাবগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগ্রামের মধ্য

দিয়েই সে শিক্ষিত হোয়ে উঠবে। প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত আছে, এবং সেই যুগের আদর্শ লাভ করবার পূর্বে প্রথমেই আবশ্যক ঐ সিদ্ধান্তের উপলব্ধি। স্বধর্মপরায়ণা হিন্দুনারীর পক্ষে আত্মোন্নতির চরমে উপনীত হবার যে অসংখ্য বিশিষ্ট মানসিক চিন্তাধারা রয়েছে, পাশ্চাত্য মনের নিকট তা সত্যই গোলক ধাঁধাঁর ন্যায় প্রতীয়মান হবে। সুতরাং সাধারণতঃ যেরূপ মনে করা হয়, প্রকৃত অশিক্ষিতা হওয়া দূরে থাক, রক্ষণশীলা হিন্দুনারী এমন শিক্ষালাভ করেছে, যা তার নিজস্বভাবে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেবল আধুনিক ব্যক্তিদ্বারা এই জাতীয় শিক্ষা মূল্যবান বলে স্বীকৃত নয়। অনুরূপভাবে, বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজন অনুসারে যোগ্যতার আদর্শ অর্জন করতে হোলে, এক বিশিষ্ট সমন্বয়পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে হবে। এখন আর অতীত কালের পৌরাণিক সমাজের সংস্কৃতি অনুশীলনের ন্যায় শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের কেবল আধ্যাত্মিক অথবা ভাবপ্রবণতার দিকটি উল্লেখ করলে চলবেনা। শিক্ষার্থী এখন কোন বিবৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমজাতীয় ভাবধারার সঙ্গে তার সম্পর্ক, এবং কোন্ উপায় অবলম্বনে জাতি এই বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে। বর্তমান সমন্বয় বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমন্বয়। আর যেহেতু সত্যের কোন লিঙ্গভেদ নেই, অতএব এই তিনপ্রকার জ্ঞানলাভের প্রণালী নারী ও পুরুষ উভয়েরই আয়ত্ত করা উচিত।

আধুনিক যুগের মন বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলবিদ্যা এই তিন পরিধির মধ্যে বিচরণ করে এবং এদের মাধ্যমেই সকল প্রকার চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। বর্তমান ভারতের কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হোচ্ছে। এই জাতীয়তাবোধকে আমাদের বিভিন্ন প্রথা, জাতি, ভাষা ও অন্যান্য উপাদানে গঠিত স্বজাতির ইতিহাস অধ্যয়নের ফল বলে মনে করতে

হবে। আমাদের নগরগুলির অবস্থিতি ও যুগে যুগে তাদের পরিবর্তনের কাহিনী পাঠ করে সেইভাবে আমাদের পৌর চেতনাও জাগ্রত করা আবশ্যক।

আবার কোন একটি জাতিকে কেবল তার নিজস্ব অতীত ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই চলবে না, অন্যান্য জাতির সঙ্গেও তাকে তুলনা করতে হবে। যথার্থ আধুনিক নারীর গৌরব ও মর্যাদার বৃহত্তর অংশ এই বোধের মধ্যে নিহিত যে, তাঁর গৃহ যেন নক্ষত্রের আলোকে উজ্জ্বল বিশ্বের পটভূমিকায় একরাত্রির জন্য প্রোথিত তাঁবুস্বরূপ, যেন প্রতিটি গতিশীল মুহূর্ত অনন্ত কাল-স্রোতের একটি বিন্দুমাত্র—তাঁর হাত থেকে বয়ে চলেছে যে ভাবে তাঁর ইচ্ছা, আশীর্বাদ অথবা অভিসম্পাতরূপে—তারপর আবার অবাধে প্রবাহিত হোয়ে দূরে চলে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে রয়েছে কঠিন মানসিক অনুশীলন। এমন কি, ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলি যে অনুপাতে দেশ ও কালের সঙ্গে সম্বন্ধ, আধুনিক ভাবের সঙ্গে তা যথোপযুক্ত নয়। উপরন্তু, আধুনিক মনের দাবী হোল, তথ্য এবং তার সঙ্গে সত্য ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি তা শেখা চাই। অন্যান্য যুগে প্রচলিত সত্যের ধারণা থেকে এই বিশেষ সত্যের রূপটি সম্ভবতঃ অধিক অভ্রান্ত নয়। কিন্তু এই হোল প্রতি যুগের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমানে বিশ্বসংগ্রামে যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন এ সত্য তাঁদের উপলব্ধি করা চাই। তথাপি নির্ধারিত এবং বহু ঈপ্সিত সত্য অনন্ত বিস্তৃত ভাবধারার অংশবিশেষমাত্র—যার মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোলের ভূমিকা গ্রহণ করবে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও শ্রেণীবিভাগ।

প্রকৃতি, পৃথিবী ও কাল এই তিনটি প্রতীকের সাহায্যে আধুনিক মন নিজেকে আয়ত্ত করে। শিক্ষার কাজে এদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার পন্থা মানুষ এখনও আবিষ্কার বা উদ্ভব করতে পারেনি। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তাই এই তিনটির অধিকতর উপলব্ধির

সংগ্রামক্ষেত্র। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় কক্ষে সেই একই প্রচেষ্টাকে মতবাদে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস নিহিত। যাঁরা ভারতীয় নারীর নিকট আধুনিক ভাবধারা বহন করবেন, তাঁদের শুরু করতে হবে সেখান থেকে—যেখানে তারা শিখতে পারে কি করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐ ভাবধারা ভালভাবে গ্রহণ করা যায়। পরিশেষে ভাবটি একবার গৃহীত হোলে ভারতীয় নারীই অন্য ভারতীয় নারীকে শিক্ষা দিতে পারে। ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য সকল উপায়ই অবলম্বন করা উচিত। ভ্রাম্যমাণ ভাগবতপাঠক অথবা কথকগণ ম্যাজিক লণ্ঠন সহায়ে বিভিন্ন তীর্থস্থানের দৃশ্যপট দেখিয়ে ভূগোলবিদ্যাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। মহাভারত ও রামায়ণের বহির্ভূত ঐতিহাসিক ঘটনাও ঐভাবে পরিচিত করা চলে। এই ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকগণ সমবেত জনতা ও পর্দার অন্তরালে অবস্থিত মহিলাগণের নিকট শরীর রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধান এবং চারিপাশের জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সম্বন্ধে সরল বক্তৃতাই বা কেন দিতে পারবেন না? চিত্র—কেবল চিত্রই, ভাব ও মাতৃভাষাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার যন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। দেশকে যদি ভালবাসতে শেখাতে হয়, তবে প্রথমে সেই দেশকে চেনাতে হবে। যা তারা কল্পনা করতে পারে না তার সম্বন্ধে নারী-সমাজ কীভাবে উৎসাহ বোধ করবে?

কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হোলে ছোট বড়, গৃহের মধ্যে ও গৃহের বাহিরে, প্রাথমিক ও উন্নত সব রকম বিদ্যালয় একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলি অবশ্যই ভারতীয় জীবনের পরিপোষক হওয়া চাই, পরিপন্থী না হয়। বিদ্যালয় ও গৃহ—দুইটি বিরুদ্ধ জগতের মধ্যে সংস্থাপিত করলে মনের বিনাশ অনিবার্য। বিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য হবে গৃহে যে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয় নীতিগতভাবে তার সমর্থন, এবং বিদ্যালয়ে অধীত বিষয়কে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হবে গৃহের একান্ত কর্তব্য। এই বিশেষ

নীতি বিচ্যুত হওয়া অপেক্ষা গভীরতম অজ্ঞতাও নারীসমাজের পক্ষে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

বালকদের ন্যায় বালিকাদের জীবনেও বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অপরিহার্য করে তুলবার মধ্যে আমরা এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি যা কখনই নষ্ট হবে না। প্রত্যেক যুগকে তার উত্তরকালের শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট দায়িত্ব বহন করতে হয়। এ হোল মানব-সমাজের একটি চিরন্তন ও স্বাভাবিক কার্যের অন্যতম। কিন্তু বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা সমস্যার অধিকাংশই নির্ভর করছে সময়ের অসুবিধার উপর। প্রচণ্ড পবিবর্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। একবার আধুনিক যুগ চেতনার মূল বিষয়টি আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেলে সকল সমস্যার অবসান ঘটবে। কারণ বিদ্যালয় বা শিক্ষকদের অপেক্ষা আমরা মাতৃভাষা থেকে অনেক বেশী শিখতে পারব। সেই গৌববময় দিনটিকে আনবার জন্য মহামাতৃকা স্বয়ং বিরাট আধ্যাত্মিক বীরগণেব শপথ ও সেবা আহ্বান করছেন। নারী-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়ে শিক্ষাকে সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে শত শত যুবকের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সম্ভবতঃ অধিকাংশ ছাত্রই ছুটির সময়ে গৃহে অথবা গ্রামে বৎসরে বারটি পাঠ দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোতে পারেন। এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে কোনক্রমেই সর্বোচ্চ বলা চলে না, অথচ এর দ্বারা কত পরিমাণ কাজ হোতে পারে!

অন্যরা মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। যে সকল অজ্ঞাত স্থানে শিক্ষকের পদচিহ্ন কখনও পড়েনি, সেখানে পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা যাতে প্রবেশাধিকার লাভ করে তার চেষ্টা করতে পারেন। পাঠাগার অথবা পুস্তকের আলমারীকে বলা যায় মূক বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধ বা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বা আকবর সম্বন্ধে জানতে গেলে যদি প্রথমেই বিদেশী ভাষা শিখতে

হয়, তবে নারীগণের পক্ষে কি করে ভারতের ইতিহাস বোঝা সম্ভব? নিজেদের বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা গোপন রেখে যাঁরা নারী ও জনগণের নিকট তাদের ভাষায় আধুনিক জ্ঞানের বার্তা বহন করবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভবিষ্যতে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন।

নারীসমাজের পক্ষ থেকে প্রথম যুগে পুরুষদেরই এই কার্যে অগ্রগামী হোতে হবে বলে অনেকে হয়তো তাঁদের এই মহানুভবতা ও নিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উপহাস করবেন। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণকে যাঁরা গভীর ভাবে জেনেছেন তাঁরা এই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন সমর্থন করতে পারেন না। ভারতের সামাজিক জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ়। ভারতের সভ্যতা সাংগঠনিক, আধ্যাত্মিক ও পরার্থপর। সতীদাহ প্রথা যখন নিবারিত হয়, তখন জনৈক ভারতীয় রামমোহন রায়ই ছিলেন তার প্রথম প্রবর্তক। আবার যখন বিবাহের আদর্শ হিসাবে একবিবাহের উপর জোর দেওয়া হয়, তখন বাংলাদেশের বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই প্রথম উৎসাহ এসেছিল। প্রাচ্যদেশে অন্তরের কোন স্বার্থপ্রসূত আন্দোলনের দ্বারা মহৎ সংস্কার ও সুখ সুবিধার প্রসার সাধিত হয় না। অপরপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হোয়ে অধিকার দান করে থাকে। অথবা যখন কোন নারী কোন তীব্র প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করে কোন অন্যায়ের প্রতীকার দাবী করেন তখন তিনি কি নরনারী উভয়েরই মাতৃস্থানীয়া হন না? পুত্রকে যে ব্রতে তিনি নিয়োজিত করতে চান, সেই বিষয়ে শৈশবেই কি তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন না? এইভাবে তাঁর দুর্বল হস্ত যে অস্ত্র চালনা করতে সক্ষম তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী অস্ত্র কি তিনি শাণিত করতে পারেন না? বিদ্যাসাগরের জননী এই শ্রেণীরই নারী ছিলেন এবং এই জাতীয় উৎসাহই তাঁর পুত্রকে নারীসমাজের পৃষ্ঠপোষক করেছিল।

যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তার ভার বর্তমান

শতাব্দী যে সব বিদ্যার নবীন পূজারীর হাতে অর্পণ করতে চান তাঁদের প্রতি একটি সতর্ক নির্দেশবাণী আছে। সমালোচনা ও নিরুৎসাহ দ্বারা কখন শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হয় না। যিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে মহান্ বস্তুর সন্ধান পান একমাত্র তিনিই শিক্ষক হোতে পারেন। কেবল ভারতীয় জীবনের মহত্ত্বের দ্বারাই আমরা ভারত বহির্ভূত জগতের মহত্ত্বের আভাস দিতে পারি। স্বদেশ-বাসীকে ভালবেসেই কেবল আমরা মানবপ্রেম শিখতে পারি। ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর আস্থাই আমাদের সেই যুগের অভ্যুদয়ের যোগ্য করে তুলবে। যে নারী স্বীয় জীবনে সমগ্র ভারতের অতীত গৌরব হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁরই কল্পনার আশাপথে নবীন বিদ্যার প্রচারককে উৎসর্গ করা হোক। সেই প্রচারক যেন আশা করেন ও একান্তভাবে প্রার্থনা করেন যে, আমাদের এই যুগেই সমস্ত গ্রামে গ্রামে গান্ধারীর মতো মহীয়সী, সাবিত্রীর মতো বিশ্বস্তা ও সাহসিকা, সীতার মতো বিশুদ্ধমতি ও কোমলপ্রাণা রমণী আমরা দেখতে পাব। ভবিষ্যতের পদতলে অতীত যেন পক্ষস্বরূপ হোয়ে বিরাজ করে। অতীতের সাফল্য অনাগতে যে বিপুল সাফল্যের সম্ভাবনা—তার ধাপস্বরূপ হোক। প্রত্যেক ভারতীয় নারীই যেন আমাদের নিকট মহামায়ার সত্তা নিয়ে এবং মূর্তিমতী জন্মভূমির কৃষ্টি ও স্বদেশ রক্ষয়িত্রী রূপে আবির্ভূতা হন। ভূম্যা দেবী! গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! বন্দে মাতরম্।

রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় পরিকল্পনা

যেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে আধুনিক জগতের অন্যতম দেশ বলে ঘোষণা করল, সেদিনই মাত্র যে সব পরিবর্তন হিন্দু শিক্ষা ধারাকে একটি পাশ্চাত্য সমস্যা করে তুলেছে সেগুলি পূর্ণতা লাভ করে।

সুদূর প্রাচীন যুগ থেকে তখন পর্যন্ত এই উপদ্বীপটির ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের ফলে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখানে একটি বিশিষ্ট সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক সৌধের উপযোগী ব্যক্তিগত শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হয়েছে।

পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সকল শ্রেণীর কর্মক্ষেত্রের অবকাশ এখানে ছিল। সাচ্ছন্দ্যের পরিমিত মান ছিল সকলের আয়ত্তাধীন, এবং তার সংজ্ঞাও ছিল সাধারণের গ্রহণযোগ্য। যে শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীকে তার জীবনীশক্তি নিজের ও সমাজেদেহের মধ্যে পরিমিত ভাবে বিতরণ করতে সমর্থ করত তা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

আজ এসবের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ এই সর্তে নব কলেবর প্রাপ্ত হয় যে, স্বদেশের (ইংলণ্ডের) বিরুদ্ধে কোম্পানীকে ব্যবসা বা পণ্য উৎপন্ন করা থেকে বিরত হোতে হবে, অর্থাৎ স্বদেশের বিরুদ্ধে ভারতের শিল্প এবং রপ্তানির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতি সাধন করতে পারবে না, তখন থেকে ভারত বিশ্ববাণিজ্যের পূর্ণস্রোতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন প্রাচীন গুপ্তধন যেমন বায়ুর সংস্পর্শ সহ্য করতে পারে না, সেইরকম ভারতের নিজস্ব শিল্পকলা ও ঐশ্বর্য আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সেই স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তার রহস্যময় সৌন্দর্যমণ্ডিত সূতীবস্ত্র এখনও পর্যন্ত ভেনিস ও জেনোয়া শহরে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে

ঐগুলি পুরাতন—অতি পুরাতন। সামান্য পাথর কাটা, রঙীন মর্মর প্রস্তর, কাচের টুকরার কারুকার্য—এই সব দেশীয় শিল্প বিষয়ে কি করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করবাব মতো প্রতিভা ও কাজে কবে দেখবার মতো উদারতা শাহজেহান নামে একজন মাত্র বৈদেশিকের ছিল। কিন্তু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই। অ্যাজিলাইন রঙগুলি সেইভাবেই প্রাচ্যের উজ্জ্বল বর্ণ বৈচিত্র্যের স্থান অধিকার করেছে, যে ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য সংস্কৃত, হিন্দী এবং দ্রাবিড় ভাষায় রচিত জাতীয় সম্পদকে স্থানচ্যুত করে যাচ্ছে—সকলেব পরিণাম এক প্রকার।

পরিবর্তন অনিবার্য, এমন কি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পরিবর্তনের অর্থ ধ্বংস নয়। একথা সহজেই বোঝা যায় যে, ভাবতবর্ষ এখনও আধুনিক আকস্মিক বিপর্যয়েব প্রথম আঘাত কাটিয়ে ওঠেনি, তার সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা দূরে থাকুক, নূতন সমস্যার উপাদানগুলি সে আজ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম কবতে পারেনি। একথাও সুস্পষ্ট যে, জাতীয় জীবনের এই বর্তমান বিরতিকে যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে পুনরুদ্ধার ও উন্নতিব ভূমিকায় পরিণত কবতে হয়, তাহলে এমন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন কবতে হবে, যা এ দেশবাসীকে তার অর্জিত সমস্ত কিছু রক্ষা করতে এবং সেই সঙ্গে তাদের নূতন যুগের চাহিদা মিটিয়ে চলবার উপযোগী করে তুলবে।

যখন তাঁতের উপর দিয়ে মাকু চলাচল করে তখন তাঁতীর মস্তিষ্ক নিশ্চেষ্ট থাকে না। যে সমাজে সে বাস করে তার প্রত্যেক অঙ্গের সহযোগিতা ব্যতীত তাকে এই কার্যে নিয়োজিত করা যেতে পারে না। সুতরাং যেখানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরাজি বর্তমান, সেখানেই দর্শন ও বিশ্বতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা, জাতীয় মহাকাব্য, গূঢ় বা দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত সঙ্ঘসমূহ এবং উন্নত ব্যক্তিত্বের অন্যান্য নিদর্শন থাকবেই। ভারতের পক্ষেও

প্রধানতঃ তাই ঘটেছে। এখানে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের দান প্রাচীনকালে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ছিল এবং সম্ভবতঃ পুনরায় ঐরূপই হবে। অতএব যে কোন শিক্ষা যা কার্যকরীভাবে ভারতকে তার নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজনের দাবী মেটাবে তা অপরাপর ফললাভের মধ্যে—অন্ততঃ উচ্চবর্ণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আত্মচেতনা, যৌবনোচিত দায়িত্ববোধ ও উদ্যমশীলতা এবং জগতের অপর জাতি সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার দৃষ্টিভঙ্গী উৎপাদন করবে। প্রাচ্য ভাবে উদ্বুদ্ধ একজন প্রাচ্য-দেশীয়কে গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে প্রতীচ্যের মানবতাবোধ, দেশ ও সমগ্র জাতি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের ধারণা, তার উদ্যম ও সংগঠনশক্তি, তার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা—এই জাতীয় আদর্শের দ্বারাই আমাদের প্রাচ্যের কর্মপ্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। [লক্ষ্য করতে হবে যে, এই 'জাতীয় কীর্তিকলাপ রক্ষণাবেক্ষণের' অর্থ কোনক্রমে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু অথবা বিদ্যাভিমানীর মার্জিত স্বার্থপরতার সঙ্গে প্রাচীন সৌন্দর্য রক্ষার মনোভাব নয়।]

এই উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক অবলম্বিত পন্থাসমূহ—যেখানে প্রকৃতপক্ষে ভ্রমের দ্বারা চালিত হয়নি—প্রাথমিক প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু সবগুলিকেই দেশবাসী সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে। শিক্ষাব্রতী মিশনরীর নিকট ঋণ ভারতবাসী কখনও বিস্মৃত হবে না। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই দলের প্রধান প্রধান সভ্যগণকে,—তাঁরা প্রটেষ্টাণ্ট অথবা রোমান ক্যাথলিক, যাই হোন না কেন—সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আজ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হিন্দু ছাত্র স্বদেশবাসীর প্রথা অনুসারে তীর্থ দর্শনের মতো ডেভিড হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রে যাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। স্কটল্যাণ্ডবাসী এই মনীষী শতবৎসর পূর্বে যে বিদ্যালয়

স্থাপন করেছিলেন ক্রমশঃ তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। কলেরা আক্রান্ত এক ছাত্রের সেবা করতে গিয়ে তিনি স্বয়ং ঐ রোগে আক্রান্ত হোয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্য খৃষ্টান সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে তাঁর ছাত্রগণ মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায় এবং বর্তমান কলেজ স্কোয়ারের এক স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাহিত করে।

হিন্দুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁর নিকট এই শেষকৃত্যের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ। যতই ক্লেশকর ও ব্যয়সাপেক্ষ হোক না কেন, অতিথিকে তার নিজের প্রথানুসারে আপ্যায়িত করাই ভারতীয় রীতি। মৃতদেহ দাহ না করে সমাহিত করা হিন্দুর পক্ষে একান্ত রুচি-বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও ডেভিড হেয়ারের ভাগ্যে তাঁর যথোচিত শেষকৃত্যের ব্যতিক্রম হয়নি—এই ঘটনার মাধ্যমে সূক্ষ্ম সম্মান প্রদর্শন উজ্জ্বল হোয়ে আছে। তা ছাড়া মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটিয়াদের নিযুক্ত করা হয়নি। উচ্চবর্ণের যুবকগণ অনেকখানি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিজেরাই বহন করেছিলেন। যে কোন স্নেহপ্রসূত কার্যের বিশ্লেষণ মানবোচিত নয়, কিন্তু বাহ্য ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবনের জন্য তার পশ্চাতে কী চিন্তাধারা বর্তমান তা জানা আমাদের প্রয়োজন। অধিকন্তু, সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সংরক্ষিত দ্রব্যাদির উপর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অতিমাত্রায় ইস্‌লাম ধর্মের প্রথা হওয়ায়, বর্তমান কালে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিমন্দির দর্শনের অভ্যাস, যা এই ঐহিক শিক্ষার প্রচারক কর্তৃক নাগরিক মনের উপর গভীর রেখাপাতেরই পরিচায়ক—তাকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না।

নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যের অত্যুত্তম গ্রন্থরাজিদ্বারা প্রভাবিত হবে, এই প্রাথমিক বিতর্কের বহুকাল

পূর্বে ডেভিড হেয়ার এবং অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর দিন অতীত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষার অনুকূলে শিক্ষাবিদ্‌গণ কর্তৃক এই সমস্যা নির্ধারণ করা যেতে পারত। অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস উডের পরিকল্পনা গ্রহণ করে লর্ড ডালহৌসী তার সমাধান করেন, যার দ্বারা বর্তমান দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হোল এবং পরিদর্শনপূর্বক তাদের সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করা হোল। অপর পক্ষে প্রথমতঃ মাতৃভাষা ও দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বলে স্থিরীকৃত হয়। সেই সময় মনে হয়েছিল, সমস্যাটির আশ্চর্যজনক সমাধান হোল। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আমাদের সকলের কাছেই এ তত্ত্বটি প্রতিভাত হয়েছে যে, শিক্ষা কেবল শব্দসমষ্টি বা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপার নয়। এবং এই ব্যবস্থার ফলাফলের বাস্তব অভিজ্ঞতা, যে ভাবে শিক্ষাদান চলছে তার প্রতি অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারীকে সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট করেছে।

তথাপি কোন্ দিকে পরিবর্তন করতে হবে তাও স্পষ্ট ছিল না। বাংলা দেশে শিক্ষার ব্যয় প্রতি বৎসরে মাথা পিছু ঊনত্রিশ সেণ্টে (অথবা এক শিলিং, আড়াই পেনী) কঠোর ভাবে নামিয়ে রাখা হোল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয়-সমূহের জন্য অর্থ ব্যয়ের কোন উল্লেখ ছিল না! অপর পক্ষে ত্রিশ কোটি সমন্বিত এক বিরাট জনগণের জন্য যে পদ্ধতি একবার গ্রহণ করা হয়েছে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যায় না। যদিও তাকে অন্য দিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং যতই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, ফলাফল ও গুণাগুণের দিক দিয়ে তা মানিয়ে নিতে হবে। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার যেমন নির্দেশ করেছিলেন, অর্ধপেনী মূল্যের পোষ্টকার্ড, সুলভ রেল ভ্রমণ এবং ইংরেজি শিক্ষার জনপ্রিয়তার দ্বারা ভারতের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা ফলবতী হবে— এই একত্রীকরণ তখন একেবারে অচিন্তনীয় ছিল। সহজেই

বুঝতে পারা যায় যে, কেবল পুস্তকলব্ধ সুলভ ও নিস্তেজ য়ুরোপীয় ভাবাপন্নতার দ্বারা আনীত এইরূপ একত্রীকরণ স্বভাবতই শাসক ও শাসিত—এই উভয় সম্প্রদায়েরই সর্বোচ্চ স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে সবই বালক বালিকা উভয়ের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। যখন পরবর্তীদের কথা পৃথক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করি, তখন আমাদের নূতন বিবেচনার সম্মুখীন হোতে হয়।

প্রাচ্যদেশীয় নারীগণ পুরুষদের অপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে অধিকতর রক্ষণশীল। অপরাপর দেশের প্রাচীন যুগের নারীগণের ন্যায়—বিকল্প ব্যবস্থা চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা ছাড়া—তাদের সকলেরই অল্পবয়সে বিবাহের প্রয়োজন হয়। আজকাল আর্থনীতিক কারণে এই পবিত্র বিবাহবন্ধনের সাধারণ বয়স দ্বাদশ বৎসরে নির্ধারিত করা হয়েছে। এই বিবাহ উৎসব এবং চতুর্দশ বৎসর বয়সে শ্বশ্রূগৃহে প্রবেশ—এই কালটুকু যেন বালিকা বধূর পক্ষে তার নূতন ও পুরাতন গৃহে গমনাগমনের জন্য ভাগ করা থাকে।

এই সময়ের মধ্যে যদি স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তাহলে বালিকা তার স্বামীর সঙ্গে বাস করলে যেমন হোত, অনুরূপভাবেই সে বিধবা বলে গণ্য হয় এবং সামাজিক মর্যাদা বশতঃ তার পুনর্বিবাহ অসম্ভব হোয়ে ওঠে। এই জাতীয় ঘটনা থেকে 'বালবিধবা' বলে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি। এবপর তারা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করে। আশা করা হয়, তাদের জীবন বিশেষভাবে তপস্যা ও ভক্তির উচ্চ আদর্শের নিদর্শন হবে। পরিবর্তে তারা সকলের নিকট সম্মান ও সমাদর লাভ করে। সাধারণতঃ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ যেমন মনে করা হয় যে, তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা পেয়ে থাকে তা নয়। সমস্তই যদি ভালভাবে চলে যায় তাহলে দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বধূ চতুর্দশ বৎসরে পত্নীত্বে উপনীত হয়, এবং স্বামীর

জননীর গৃহে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার তার উপর অর্পিত হয়। এ পর্যন্ত সে অতি মাত্রায় স্নেহ ও আদর লাভ করে থাকে। [হিন্দু পরিবারের বালিকারা এত শীঘ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করে যায় বলে তাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বিদ্যালয়ে বিশেষ অসুবিধার কারণ হোয়ে ওঠে।] ঠিক ঠিক বলতে গেলে যাকে আমরা যথার্থ শিক্ষা বলি এ সময়ে সে শিক্ষা আরম্ভ হয়। শ্বশ্রূমাতা যে কত সযত্নে শিক্ষা দান করেন, হিন্দুরমণীর বিস্ময়কর মর্যাদাবোধ ও অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তারই প্রমাণ।

প্রাচীন ফিউড্যাল (বিলাতের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা) যুগের মহিলাদের অন্তঃপুরকে গভীর সরলতা ও দারিদ্র্যমণ্ডিত করলে যেরূপ দেখা যাবে, আধুনিক যুগের হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুর যেন তার অনুরূপ। বস্তুতঃ নানাবিধ কারুকার্য ও শিল্পকার্য নিয়েই আমাদের কুমারীগণ নিযুক্ত থাকে না, বরং গৃহাদি পরিষ্কার করা, রন্ধন, পরিবারের গাভী দোহন, শিশু পালন ইত্যাদি সাংসারিক কাজও তারা করে। পরিবারের মধ্যে তাদের সহোদর ভ্রাতা ও অন্যান্য ভ্রাতাদের পত্নী—তাদেরই সমবয়স্কা বালিকারাও অনেক সময়ে অবস্থান করে। সংসারের প্রধান কর্তার মাতা অথবা সহধর্মিণীরূপে অধিষ্ঠিতা প্রধানা গৃহিণীর প্রতি তারা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, পরিবারের অন্যান্য প্রাচীনাদেরও তারা সেইরূপ শ্রদ্ধা করে থাকে। অন্তঃপুরের মধ্যে ভারতীয় মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে অধীত হোয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন শৌর্যের যুগে সুন্দরীগণ কোন পুরাতন কাব্য অথবা উপন্যাস তার চেয়ে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন না। এমন কি ভ্রাম্যমাণ চারণদল যারা দুর্গপ্রকোষ্ঠে গান গেয়ে অভিনয় করত তাদের অনুরূপ দল এখনও বর্তমান। অনেক সময় বসন্ত সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের আয়োজন করা হয় এবং আঙ্গিনার বারান্দায় পর্দার অন্তরালে মহিলাগণ উপবিষ্ট

থাকেন। বাইরে থেকে কেউ তাঁদের দেখতে পায় না, কিন্তু তাঁরা নিজেরা দেখতে পান এবং এইভাবে তাঁরা সীতারামের চির পুরাতন ও চিরনূতন বনবাসের কাহিনী শুনে থাকেন। এই জাতীয় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ কমে আসছে, কারণ ঐ সব উপভোগ করবার মতো পর্যাপ্ত আয় প্রতি বৎসরই হ্রাস পাচ্ছে। ভারতীয় উচ্চ সম্প্রদায়ের পুরুষগণ ইংরেজদের সুলভ কেরানী জাতিতে পরিণত হচ্ছেন, ফলে ক্রমেই তাঁরা বহুসংখ্যক আশ্রিত প্রতিপালনে অক্ষম হোয়ে পড়ছেন। যদি এর পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তাদের উদ্যমের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে নূতন কর্মধারার প্রবর্তন করতে হবে। এইরূপ এক পুনর্গঠনের যুগে সামাজিক প্রেরণার উৎস রূপে নারীসমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নারীদের বর্তমান শিক্ষায় বিকাশ অপেক্ষা নিয়মানুবর্তিতাই অধিক। তথাপি এই শিক্ষার ফলে মহীয়সী নারীর আবির্ভাব সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হয়নি। অন্যান্য অনেকের মধ্যে ঝান্সীর বিধবা রাণী তার সাক্ষী। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে তিনি আদেশ ঘোষণা করেন, নূতন মুদ্রা প্রচলন করেন, কামান পরিচালনা করেন এবং সর্বশেষে নিজ সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান করে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন।

এইসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমূহ বলা বাহুল্য একটি জাতির শিক্ষা পদ্ধতির সঠিকতা অপেক্ষা তাব পৌরুষেরই পরিচায়ক। এ কথা অনস্বীকার্য যদি আমরা ভারতীয় নারীর জীবনে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অধিকতর সামাজিক সম্ভাবনীয়তা এবং বর্তমান ব্যবস্থার মুখ্য বা গৌণ ভাবে প্রতিকূল সমালোচনা না করে আর্থ-নীতিক দুঃখমোচনের কিছু ক্ষমতা এনে দিতে পারতাম, তাহলে অবশ্য কিছু প্রয়োজনীয় কার্য সাধন করা যেত।

এখন খৃষ্টান মিশনরী এবং অপর সকলকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তাঁদের চেষ্টার ফলেই প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের 'থ্রি আর' (লিখন, পঠন ও গণিত) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—এই দুই জাতীয় শিক্ষা কয়েকজনের আয়ত্তাধীন। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের কন্যাদের বিবাহের পর বহির্জীবন থেকে পৃথক করে অন্তঃপুরে রাখেন। অতএব তাদের বিদ্যালয়ের বিদ্যা আহরণ দশম বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই শেষ হোয়ে যায়। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ও পার্শী মহিলারাই সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এই ঘটনাগুলি এবং এই জাতীয় অন্যান্য উদাহরণ বিবেচনা করে দেখা যায়, বাংলা দেশের শিক্ষিতা বালিকার সংখ্যা সর্বসমেত শতকরা সাড়ে ছ'জনমাত্র এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী বলা হোয়ে থাকে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে আলোচনার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এর উত্তর কি ধরনের হবে, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি একমত। এখন প্রশ্ন এই যে, কোথায় এবং কি ভাবে ভারতীয় নারীর বাস্তব জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী বিকাশমূলক শিক্ষার উদ্বোধন করা যায়।

এই জাতীয় সমস্যাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন ও বিবেচনা করে রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যদি অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে আমরা সফল হই, তাহলে আমাদের ইচ্ছা কলকাতার সন্নিকটে গঙ্গা তীরে একটি বাড়ি ও একখণ্ড জমি ক্রয় করে, কুড়ি জন বিধবা ও কুড়িজন অনাথা বালিকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া। সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী' নামক পুস্তকে যাঁকে বিশ্বের নিকট উপস্থাপিত করেছেন, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সেই সারদা দেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

অধিকন্তু তার সঙ্গে বিদ্যালয়োপযোগী আর একটি প্রতিষ্ঠান

যুক্ত করবার প্রস্তাব হয়েছে, যেখানে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প-শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি হবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তি; ইংরেজি ও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, প্রাথমিক গণিত ও বিজ্ঞান পাঠের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঐ সকল বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হবে। ঐ সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। শেষোক্ত বিষয়ের বর্তমান সার্থকতা হবে এই যে, প্রত্যেক ছাত্রী গৃহে অবস্থান করেই এমন একটি পন্থায় জীবিকা অর্জন করতে পারবে যা সর্বতোভাবে মর্যাদাকর।

কিন্তু বিদ্যালয়ের আরও একটি কার্যক্রম থাকবে। আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়সের বিধবাগণ কেবল যে প্রকৃত হিন্দু পরিবেশ এবং আদর্শ পারিবারিক জীবন দেখাতে পারবেন, তা নয়, কিন্তু তাঁদের সাহায্যে আমরা দুই তিনটি শিল্পব্যবসা সংগঠন করবারও আশা রাখি। এর দ্বারা ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সৃষ্টি করা যেতে পারে। দেশীয় আচার, কাসুন্দী ও চাট্‌নী এই সকলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ধরা যাক, আমাদের প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে; সর্বোপরি, কোন প্রকারেই জাতীয়তার পরিপন্থী নয় বলে হিন্দু-সমাজ তার অনুমোদন করেছেন। তাহলে সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যেক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করতে পারব, সে বিবাহিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, অথবা জাতীয় কার্যে জীবন উৎসর্গ করতে চায়। যারা প্রথমটি মনোনয়ন করবে তাদের সম্পূর্ণ সম্মানজনক ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো বলে আশা করি। আর যারা স্বদেশ ও নারীজাতির উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে চায়, বিস্তারিত শিক্ষালাভের পর তাদের দ্বারা

বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাগণের কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য স্থানে নূতন নূতন রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারবে।

পরিশেষে নিবেদন, আমার বিশ্বাস, আমি কারও উদ্যম অথবা প্রতিভাকে নিকটবর্তী কর্তব্য পরিহার করে দূরবর্তী কর্তব্যের দিকে পরিচালিত করতে চাইছি না। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও আর্থিক পরিস্থিতির দিনে আমরা নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করছি যে, বিশ্বসেবাই প্রকৃত স্বদেশ সেবা। মনে হচ্ছে, আমরা ইতিপূর্বেই ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'সকল জাতি কি সম্মিলিত হচ্ছে? সমগ্র বিশ্বের একাত্মবোধ কি জাগ্রত হচ্ছে?'—এই মহৎ প্রশ্নের সম্মতি-সূচক উত্তর দিয়েছি।

ভারতে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে কারিগরী শিক্ষা

যদি আমাদের ভারতীয় বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য হাতে-কলমে শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর ন্যায় কোন কিছু প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে আদর্শ শিক্ষাক্রমকে যে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায় তার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য হোল, আমরা প্রাথমিক বা মাতৃভাষা শিক্ষাকে অথবা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই একটি আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করব। এই শিক্ষা আট বৎসর বয়স পর্যন্ত অথবা খুব বেশী করে ধরলে যে কোন উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় বালকের ক্ষেত্রে দশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হোতে পারে। এই সময়ে একমাত্র যে ভাষায় কাজ চলতে পারে, তা হোল মাতৃভাষা। জ্ঞানদানের পদ্ধতি তথ্য পরিবেশন অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে চিন্তা করতে, আবিষ্কার করতে ও নিজের জন্য সৃষ্টি করতে শিখতে হবে। দেহ ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তার মূল্য নিয়মানুবর্তিতার মূল্যকে বহুদূর অতিক্রম করে যায়। যদি কোন একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে শিক্ষার মূলকেন্দ্র অথবা পদ্ধতি হিসাবে ধরতে হয় তাহলে নিশ্চিতই তা হবে 'কিণ্ডার-গার্টেন পদ্ধতি' বা শিশুশিক্ষা। এরপর মধ্যশিক্ষা বলতে একটি বালকের আট থেকে বারো বৎসর অথবা দশ থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যবর্তী বৎসরগুলিকে বা তার নিকটবর্তী কালকে ধরা যায়। এই কয় বৎসরে সম্ভবতঃ বালক ইংরেজি অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করে এবং ইতিপূর্বে সে যে স্বল্প শিক্ষাটুকু নিজের ভাষায় আয়ত্ত করেছে, ইংরেজি ভাষায় তারই পুনরাবৃত্তি করে। যাই হোক, আশা করা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির অখণ্ডতা ও সুস্পষ্টতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই বয়সের বালকের পক্ষে যে ভাষা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য

হওয়া সম্ভব, তার অধিকাংশ শিক্ষা সেই মাতৃভাষার মাধ্যমেই চলবে।

ক্ষেত্রবিশেষে বারো অথবা চৌদ্দ বৎসর বয়সে বালক বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে বর্তমানে এই উচ্চশিক্ষার প্রায় সবই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে চলে। এ বিষয়ে আমরা আক্ষেপ করলেও সম্ভবতঃ এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কারণ কোন ভারতীয় ভাষাই সমগ্র দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে সমর্থ নয়; এবং যদিও হিন্দুস্থানী অথবা উর্দু বহুলাংশে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে, ইংরেজি ভাষার সুবিধা এদের অপেক্ষা অধিক, কারণ ইংরেজি ভাষার প্রচলন শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে। উপরন্তু এটি আধুনিক ভাষা যার দ্বারা সঠিকভাবে চিন্তা করা যায় এবং যা বর্তমান যুগের নানা ভাষার ও প্রায় সকল সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। উচ্চবিদ্যালয়ের স্তরেই পরবর্তীকালের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নির্দিষ্ট প্রস্তুতি চলে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই সময়েই নিরূপণ করা হোয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও আমাদের বালক তখনও পরিণত বয়স্ক হোয়ে ওঠেনি। তখনও তার শিক্ষা চলছে। তার ভুলভ্রান্তি-গুলি তখনও অপরাধ বলে গণ্য হয়না। তার বেড়ে ওঠা শরীরের জন্য প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য, সবল ব্যায়াম, আলো বাতাস এবং অপর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জলের দাবী অন্যান্য প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রগণ্য; যদিও এগুলি ক্রমবর্ধমান আত্মকর্তৃত্ব ও বৌদ্ধিক বৃত্তিকে জয় করবার তীব্র আনন্দ থেকে অবিচ্ছেদ্য।

সর্বশেষ আসে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার কাল, ষোল বা আঠারো বৎসর বয়সে এই অধ্যয়নের সূচনা এবং বিশ বা বাইশ বৎসরে পরিসমাপ্তি। এখানে বোধ হয় বলে রাখা ভাল যে, শিক্ষা ব্যাপারে, সময়ের কোন মাপকাঠি নেই। এ ধারণা ভুল যে, বিশ বৎসর বয়সে যে শিক্ষার শেষ, বাইশ বৎসরে সমাপ্ত শিক্ষার চেয়ে তা

অনেক সুবিধাজনক। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত দেখা যায়। সংস্কৃতি মূলতঃ ক্রমোন্নতির প্রশ্ন, শরীর ও মস্তিষ্ক উভয়ের বিকাশ সাপেক্ষ। আমরা যেমন স্বেচ্ছাকৃত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট শারীরিক বিবর্তন চক্রের মধ্য দিয়ে কোন মানুষকে দৌড় করাতে পারি না, তেমনি মানসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কাজ করা চলে না। সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত যে ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, তিনি নয় বৎসর বয়সে গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ডে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয়। সময় সম্পর্কে আমরা যতই উদার হোতে পারি, শিক্ষার দিক থেকে ততই ফললাভের সম্ভাবনা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেচনা করবার সুযোগও ততই পাওয়া যায়।

যাই হোক, হাতে কলমে শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত হিসাবে স্বীকার করে নিলে সমগ্রভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাকে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, অথবা তার মূল্যও হ্রাস করা হয় না। যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই শিক্ষার যে রূপ দেওয়া হয় এবং যেভাবে সম্পূর্ণতার সঙ্গে তার অনুশীলন করা হয়, তাতে শিক্ষা সর্বদাই কম বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হোয়ে পড়ে। এইভাবে শিক্ষার সময়কেও বাড়িয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে একটি হাতে কলমে শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক, অর্থাৎ সপ্তাহে বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা অঙ্কন ও অন্যান্য হাতে-কলমে শিক্ষাকার্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে। নানাবিধ অঙ্কন বিদ্যা এবং কোন কোন স্থলে ভাস্কর্য বিদ্যা ও কাষ্ঠে খোদাই করা কার্যের জন্য এই বারো থেকে পনেরো ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার বেশী সময় নির্দিষ্ট নেই। অনুরূপ সময় দেওয়া হয় কাঠের কাজ শিখবার জন্য, যেমন ছুতারের কাজ (carpentry) এবং বাকী ঐ পরিমাণ সময় ধাতুর কাজ যথা ছাঁচে ঢালাই যন্ত্রপাতি তৈয়ার, কামারের কাজ, টিনকাটার কাজ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকে। সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত,

হাতে কলমে শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে, কাঠ ও ধাতুর কাজের সংযুক্ত কার্যক্রম সপ্তাহে আট ঘণ্টার বেশী কখনই চলতে দেওয়া হয় না। তবে এক্ষেত্রে হস্তাঙ্কন, যান্ত্রিক অঙ্কন এবং স্থাপত্য বিদ্যার প্রযুক্ত অঙ্কন—এই তিনটিকে একত্র নিয়ে একটি ভিন্ন বিষয় ধরা হয় এবং এর জন্য আরও চার পাঁচ ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করা আছে।

এ ধারণা করা উচিত নয় যে, বিদ্যালয়ের বালকদের কোন শিল্প বা ব্যবসায়কে জীবিকারূপে গ্রহণ করবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষাক্রমকে সাধারণ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যদি কেউ বিদ্যালয় ত্যাগ করবার পর নিজেকে কোনরূপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করতে চায়, তাহলে ঐ কাজ আরম্ভ করা তার পক্ষে সহজসাধ্য হবে। কারণ ইতিমধ্যেই সে ঐ সম্পর্কীয় সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং সেগুলির সমাধান করবার চেষ্টায় নিজের বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে একত্র করতে অভ্যস্ত হয়েছে। এই রকমই দেখা যায়। তবে, হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যে সব যুক্তি আছে সেগুলি এই ধরনের মন্তব্যের ওপর নির্ভর করছে না। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর প্রকৃতি এবং মস্তিষ্কের কোষগুলির সঙ্গে তার দৈহিক অভিব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিকোন্ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করলে হাতে কলমে শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য আবেদন করার অধিকার আমাদের আছে। যদি কেবল কলকারখানা ও মালগুদামের জন্য সুযোগ্য সংগঠক ও অধিকর্তা সরবরাহ করবার কথাই ভাবা হোত, তাহলে সমাজ সীমিত পরিমাণে এইরূপ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির দায়িত্ব নিশ্চিতই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দিত। কিন্তু অভিজ্ঞতা যাঁদের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার দিয়েছে, তাঁরা সকল ক্ষেত্রে এই অভিমতই পোষণ করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান থাকলে,

যে বালক হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেছে সে সব সময়েই যে ঐ শিক্ষালাভ করেনি তার অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধিমান। সে পর্যবেক্ষণ করতে জানে এবং নিজের জন্য চিন্তা করতে অভ্যস্ত—এই কারণে তার চিন্তাধারা সতেজ ও বলিষ্ঠ। তার লক্ষ্য মৌলিক ও অসম সাহসিকতাপূর্ণ। সর্বোপরি, তার চরিত্র স্বপ্নকে বাস্তবে, পরিকল্পনাকে কার্যে এবং সিদ্ধান্তকে প্রমাণে রূপায়িত করার ভিত্তিতে গঠিত।

আমেরিকান শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বারংবার হাতে কলমে শিক্ষার শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সেণ্টলুই-এর বিশেষজ্ঞগণ বলেন—'যদি শিক্ষালাভই লক্ষ্য হয়, তাহলে পারদর্শী শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্যতীত কোন কর্তব্য নেই…একটি কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রের হিতার্থেই সকল ব্যবস্থা। এখানে তার মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। বাজারে সে-ই একমাত্র পণ্য। এমন কি, হাতে কলমে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানসিক বৃত্তির ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন। হাতে কলমের কাজে দক্ষতা এক প্রকার মানসিক ক্ষমতারই পরিচায়ক। কর্মময় জীবনের সকল কর্তব্যপালনে উপযুক্ত মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে স্থিরবুদ্ধি ও নৈসর্গিক শক্তি আয়ত্ত করার ক্ষমতা, তার মূলে নিঃসন্দেহে রয়েছে এই মানসিক ক্ষমতা এবং হাতের কাজের উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান ও ঐ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সুতরাং মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির সুস্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অর্জন করাই এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।' এমন কি, হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করলে একজন আইনজীবীরও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

পৌর আদর্শ

সকল নাগরিক নিয়ে যেমন কোন জাতি গঠিত হয়, তেমন নগর হোল জাতীয়তার শিক্ষালয় স্বরূপ। ক্ষুদ্রের সেবার মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহত্তর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হয়। পৌর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্ভীক ও নির্মল-চরিত্র ব্যক্তিগণের যোদ্ধৃত্বই জাতির উন্নতি বিধানে নেতৃত্ব প্রদান করে। যে কোন জাতির ইতিহাসে তার বিকাশকালের কোনও পর্যায়ে একটিও আদর্শভ্রষ্ট জীবনের জন্য সময় নষ্ট করা যায় না। এমন জীবন তৎক্ষণাৎ মানবজাতির (Humanity) পক্ষে পরগাছা হোয়ে দাঁড়ায় এবং তার শক্তির উপর আরও নানা রকম যে দাবী আছে তাকে খর্ব করে। আধুনিক যুগে প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকই এ-কথা স্বীকার করতে অক্ষম। ফলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির নিকট কোন সুষ্ঠু পৌর-জীবন যে দাবী করতে পারে, অথবা তার শক্তির কাছে যে সব সমস্যার সমাধান দাবী করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। বস্তুতঃ সমগ্র দেশের প্রত্যেক নরনারীর ও শিশুর যথাসম্ভব ও সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশের দ্বারাই এই আদর্শ প্রকাশ লাভ করতে পারে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশে তা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় রাজকুমার অলসভাবে মোটরে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন; অথবা যে সমাজ-জীবন তিনি বা তাঁর পরিজনবর্গ প্রচলন করেননি, নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম, তারই ফ্যাশন অনুকরণে রত; মার্কিন কোটিপতি দেশের বাইরে গিয়ে সঞ্চিত সম্পদ শুভ্র-শ্রমিক সংগঠনের সাহায্যে ব্যয় করছেন; এবং য়ুরোপীয় অভিজাত শ্রেণী সকল দেশের ও সমাজের সব সুবিধা নিজের স্বার্থে কবলিত করছেন; এ-সব আমাদের একবারও সন্ধিগ্ধ করে না যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা ভিন্ন মানুষের উপরে মানবতার

আর উচ্চতর কোন দাবী আছে। অথচ জগতে সকল সময়েই এত অশুভ দূর করার আছে, এত দুঃখ নিবারণ করার আছে, অসম্পূর্ণ রাখা চলে না এরূপ এত কাজ রয়েছে যে, যদি আমরা প্রত্যেকে জাতির দাবী অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণেও সাড়া দিই, তাহলেও জাতীয় উন্নতির গতি শ্লথ হবে। এমনকি, অনন্তকালের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্যে পাপাচার, দুর্বলতা ও অলসতার অবকাশ নেই; সমগ্র জাতির মধ্যে একজনকেও পরগাছা হোতে দেওয়া চলে না।

বর্তমান কালে ভারতবর্ষে আমরা যত ধীরে ধীরেই হোক, সেই সব নূতন নিয়মের অর্থ উদ্ধার করতে পারছি, যা আমাদের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং এক মহান্ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। অতীতের কাছে যা পেয়েছি তাকে রক্ষা করা এতদিন জাতি (Community) হিসাবে দায় ছিল। অকস্মাৎ আমাদের সে কাজ শেষ হয়েছে। আজ আমরা নূতনকে রূপ দেবার যুগে এসে পৌঁছেছি। অগাস্ত কোঁতে (Auguste Comte) বলেছেন, 'অতীতের সহায়ে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছতে হবে।' এর অর্থ হোল, অতীতকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করে যে শক্তি বর্তমানে আমাদের মধ্যে সংহত, তার সুযোগ নিয়ে আমরা নিজেদের এমন সব কাজে নিয়োগ করব—যার ফলে সকলের জন্য এক মহত্তম ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা যায়। অনাগত ভবিষ্যৎ এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মতো, আমাদের কাজ তাকে অধিকার করা। যে যুগ কিছু নূতন আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়, তার সূচনাতেই মৃত্যু ঘটে। যে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞাত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে তা হোল—অজ্ঞতার দর্শন। যেহেতু আজ আমাদের দেশে মহৎ চিন্তা জন্ম নিচ্ছে, নূতন দায়িত্ব দেখা দিচ্ছে, যেহেতু প্রাচীন সংস্কৃতির নূতন ও অভাবিত প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেইহেতু আসন্ন শতাব্দীগুলি আমাদেরই জন্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। যদি এ অবস্থায়

ভারতীয় চিত্ত প্রত্যহ নব নব ক্ষেত্র জয়ের আশ্বাস না দেয়, যদি প্রতি মুহূর্তে এক নূতন বিস্তৃতির দিকে আকর্ষণ অনুভব না করে, তাহলে আমাদের আশা করবার কিছু থাকে না। কিন্তু সে যথাযথভাবে এ-সব করে যাচ্ছে। আমাদের সভ্যতার চেতনা আর একবার জাগ্রত। আমরা জানি, দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় বিকাশ এখানে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। আমাদের সামনে উপস্থিত কর্তব্য হোল পৌর ও জাতীয় জীবনের মহান্ আদর্শগুলিকে কাজে পরিণত করা; তার দ্বারাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্ত ধর্মীয় কীর্তিসমূহ সংরক্ষণ ও কালজয়ী করতে সমর্থ হব। আজ যেন আমাদের জীবনের অনধিকৃত জমি দখল করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে স্বয়ং সংস্থা ও পরস্পরের সাহায্যে সেই সমুন্নত দুর্গ ও স্তম্ভ শ্রেণী, যার সহায়তায় আধুনিক জগতের সঙ্গে ও তার আক্রমণাত্মক সকল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জন করব। এ কাজের জন্য যথেষ্ট মাল-মশলা বর্তমান। আমাদের ইতিহাস, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহের মধ্যে প্রচুর উপাদান রয়েছে, যার দ্বারা নিজেদের এক শক্তিশালী ও সুসংহত জাতিরূপে গড়তে পারি। প্রয়োজন কেবল নিজেদের লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। স্থপতি যেমন নক্সা সামনে রেখে একটি গৃহ নির্মাণ করেন, তেমন স্বকীয় স্বপ্ন অনুযায়ী একটি জাতি গড়ে ওঠে। যে একথা জানে, সে তার স্বপ্নকে প্রয়োগ করতেও জানে। 'ইচ্ছার উপরে জীবনের সব নির্ভর করে'—এই তত্ত্বই আমাদের শিক্ষা দেবে কী করে তা সম্পন্ন করা যাবে। এ তত্ত্বের অপরিহার্য ফলশ্রুতি হোল যে, তাদের দ্বারাই জগতের পরিবর্তন সাধিত হয়, যারা জানে কী ইচ্ছা করা উচিত এবং কী ভাবে। এমন কি, শেষ পর্যন্ত হয়তো আকাশে গড়ে তোলা কাল্পনিক দুর্গই হবে জগতের দৃঢ়তম দুর্গ।

কিন্তু জাতীয়তার (nationality) উপাদান হোল পৌরজীবন

এবং ঐ জীবনের উপাদান হিসাবে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও স্থায়ীভাবে তার (পৌরজীবনের) সঙ্গে যুক্ত। যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশুর গোচারণভূমি দখল করবার জন্য একটি আঙ্গুল তুলেও গ্রামকে সাহায্য করে না, সে কখনও দেশের জন্য রক্তপাত ও মৃত্যু বরণ করবার মানুষ নয়। যে ব্যক্তি জাতির কল্যাণের জন্য সামান্য বিপদের ঝুঁকি বা অসুবিধা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তার হাতে বিশ্বাস করে সৈনিকদলের পতাকা অর্পণ করা চলে না। পৌর কর্তব্যের মাধ্যমেই জাতীয় দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। ছোটখাট কর্তব্য পালনের ক্ষেত্র প্রসারিত করেই আমরা বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করি। অবশ্য এ কথা বলা চলে, বর্তমানে পৌর জীবন বা পৌর আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের অতি সামান্য ধারণাই আছে। এ কথা সত্য ; তথাপি কথাগুলির প্রতি যথাসম্ভব গভীর মনোযোগ অর্পণ করতে হবে এবং নিঃসন্দেহে সেদিন আসবে—যেদিন দেশের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের জন্য আমরা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকব।

আমাদের দুটি মহাকাব্যের মধ্যে বলা যেতে পারে, মহাভারতে বীরত্ব ও জাতীয়তার আদর্শ পরিব্যাপ্ত এবং রামায়ণে আছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ও পৌর আদর্শ। সম্ভবতঃ বাল্মীকির কাব্য-প্রয়াস ইচ্ছাপূর্বক প্রিয় অযোধ্যা নগরীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য ; এই উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রাচীন রাজন্যবর্গের পৌরাণিক উপাখ্যান চিত্রিত করতে হয়েছে। অযোধ্যা নগরী ও তার যা কিছু, কবিকে দিয়েছে আনন্দ। বড় বড় উৎসবের সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি তাঁর বহু শক্তি নিয়োগ করেছেন। এর প্রাসাদ, তোরণ ও স্তম্ভরাশির কল্পনায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু অযোধ্যা তাঁর মধ্যে যে পৌরচেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, তার সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায় লঙ্কানগরী বর্ণনাকালে। যে দৃশ্যে হনূমানের সঙ্গে গভীর অন্ধকারে দ্বার প্রহরিণী চাপা গলায় বলছে—'আমিই লঙ্কা

নগরী'—আধুনিক মনের কাছে, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তার অপেক্ষা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছুই নেই।

পৌরচেতনার মৌলিক প্রয়োজনকে আমরা এখানেই পাই—এবং তা হোল আমাদের নগরকে পবিত্র, সৌন্দর্যমণ্ডিত, প্রিয় এক সত্তা বা ব্যক্তি বলে মনে করতে হবে। রাম এবং তাঁর প্রজাদের কাছে অযোধ্যা ঐরূপই ছিল। রাবণ ও তার পরিজনের কাছে লঙ্কা নগরীরও ঐ স্থান ছিল। তাঁর মহান্ যুগের অপর সকলের মতোই বাল্মীকিরও অভ্যাস ছিল রামচন্দ্রের গৃহ, সাম্রাজ্য ও প্রজা-বর্গের সঙ্গে সহজে নিজেকে যুক্ত করা।

যে সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, য়ুরোপের সকল ভাষাতেও ঐসব বিষয়ের বর্ণনা শক্তি বিকাশ লাভ করেনি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শব্দার্থ অনুযায়ী মানব জীবনের সঙ্গে তুলনীয় নগরের যে যৌথ জীবন স্বীয় স্বার্থে, স্বনির্বাচিত স্থানে, স্বীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে, সেই পৌর গোষ্ঠীকে (Civic Community) এক কথায় বোঝাতে পারে এমন কোন শব্দ ইংরেজি ভাষায় নেই। আমরা যা বোঝাতে চাই, ফরাসী কম্যুন (commune) শব্দটি তার দ্যোতক, কিন্তু কারও কারও কাছে ঐ শব্দটি বড় বেশী রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে হোতে পারে। কে জানে হয়তো ভারতীয় কোন ভাষাতেই, সর্বপ্রথম, পৌর-সংস্থানের কোনও স্পষ্ট প্রতীক শব্দ গড়ে উঠবে, যার ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধভাবে তার মানবিক ও সামাজিক দিকগুলি প্রকাশ পাবে। একথা নিশ্চিত যে, কোন বস্তু উপলব্ধিগোচর হোলেই তার ভাষাও সৃষ্টি হবে। বড় বড় আন্দোলন তার নিজ নিজ ব্যক্তিদের গড়ে তোলে, তেমনি নূতন ভাব তার নিজের ভাষা সৃষ্টি করে নেয়।

যে কোন নগর সমগ্রভাবে স্বীয় অন্তরালবর্তী জীবনধারার দৃশ্যমান প্রতীক, এবং এর দ্বারা বর্তমান জীবনধারাকেই কেবল বোঝায় না, পরন্তু এটি অতীত ও বর্তমান সকল স্রষ্টার সমবেত

শক্তির দ্বারা সংগঠিত। এক অর্থে এমন আদর্শ নগরও আছে যেখানে তার ভবিষ্যৎ স্রষ্টাদের শ্রমের কথাও বিবেচনায় আনতে হয়। কেন কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ-এর, বেনারস থেকে বোম্বাই-এর এবং আমেদাবাদ থেকে দিল্লীর প্রকৃতি বিভিন্ন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোলে শেষ পর্যন্ত আমরা কী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না যে, দৃষ্টবস্তু অদৃশ্যের ইঙ্গিত ও প্রতীক মাত্র, জড় হোল চেতনার আবরণ মাত্র এবং সকল বস্তুই চিন্তার পরিণতি? প্যারিস বা রোম অমৃতসর থেকে এত পৃথক কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে বিভিন্ন যুগ ও মহাদেশের ইতিহাসের মধ্যে। মানুষের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যমান প্রতীক হোল পূজার বেদী। আর আমাদের একতার সর্বাধিক দৃশ্যমান প্রতীক নিঃসন্দেহে একটি নগর।

যে সব ঘরবাড়ি নিয়ে একটি নগর গঠিত হয়, নগরটি তদতিরিক্ত আরও কিছু। বাড়িগুলি এক অলিখিত আইনের নির্দেশ অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। বাড়িঘর ও বাগান যদি ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকত, তাহলে যে মাটির উপর সেগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তার এক ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যতেরই কেবল প্রতিশ্রুতি দিতে পারত। নানা স্তরের পৌর উন্নয়ন, সরকারী (public) বাড়িগুলির জাঁকজমক বা অনুরূপ ব্যাপারে জাতিগুলির মধ্যে বিরাট মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একটি রাস্তা বা গলির শৃঙ্খলাযুক্ত বিকাশের মধ্যে আমরা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী এক আত্মিক সত্তার অব্যক্ত স্বীকৃতি দেখতে পাই এবং প্রার্থনা করলে ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদ লাভের আশ্বাসও পাওয়া যায়। এর উপরে আছে নগর স্থাপত্যের সৌন্দর্য। প্যারিসের প্রায় প্রত্যেক প্রশস্ত রাজপথ আলোক ও উদ্যান শোভিত বিরাট চত্বরে এসে শেষ হয়েছে, যে স্থানটি একটি তারকাব কেন্দ্রস্থলের মতো; এবং প্রায় প্রত্যেক তরুবীথিকা এক একটি উজ্জ্বল দৃশ্য রচনা করে কোন না কোন

প্রখ্যাত প্রাসাদ অথবা স্মৃতিসৌধের অভিমুখে চলে গিয়েছে। আমরা যখন প্লা-ত্ত-লা-কনকর্ডে (Place de la Concorde) দাঁড়িয়ে সাঁ এলিসিস (Champs Elysees) এর প্রশস্ত পথের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই নেপোলিয়নের বিজয়স্তম্ভ, যার স্বল্প উচ্চতা দূর থেকে মুকুটের মতো দেখায়; অথবা যখন জোয়ান অব আর্কের মূর্তির নিকট থেকে প্লা-ত্ত-লা কন্‌কর্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তার সু-উচ্চ গম্বুজ ও মূর্তিগুলি ও চারিদিকে ঘিরে থাকা শহরগুলি দেখতে পাই। পণ্ডিতেরা বলেন, একমাত্র শিকারী জাতি, যারা নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয়স্থান থেকে শিকারের সন্ধানে বিভিন্ন বনপথগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে অভ্যস্ত, তারাই নিজেদের তারকার মতো (Stellate design) নক্সার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম। নিশ্চয়ই ভারতীয় শহর জয়পুরে আয়তাকার ধানক্ষেত-গুলি চলবার পথগুলি দিয়েই বিভক্ত হয়েছে।

সে যাই হোক, এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেমন একটি শহর, ব্যক্তি-বিশেষের ঘরবাড়ির সমষ্টি অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু, তেমনি কম্যুন (commune)·বা একটি জনগোষ্ঠী বৈচিত্র্য ও গুরুত্বের দিক দিয়ে পরিবারের অতিরিক্ত আরও কিছু। একটি পরিবারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার বৃত্তি ও জাতির (caste) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু জনগোষ্ঠী (commune) সকল জাতিকে (caste) অন্তর্ভুক্ত করে, আবার সকলকে অতিক্রম করে যায়। সকলের মধ্যেই সে তার সন্তান, প্রেমিক ও সেবকের সন্ধান করে। জন্ম বা কর্মসূত্রদ্বারা কেউ নিয়ন্ত্রিত হয়না। যে ঝাড়ুদার পরিচ্ছন্নতার পৌর আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে, আত্মকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সে উত্তম নাগরিক। নাগরিক জীবনে শুধু জাতিভেদ নয়, ধর্ম-মতের পার্থক্যও ভুলতে হবে। এ ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান একই স্থানে অবস্থিত। শুধু ধর্মবৈষম্যই নয়, বংশগত জাতি (race), ভাষা, বয়স এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদ এ সবই নাগরিকতার (citizenship)

ঐক্যের কাছে গৌণ। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদান সৌভ্রাত্রের আনন্দ-অগ্নিতে অর্পিত ইন্ধনের মতো। স্কট রচিত 'এ্যানি অফ্ গিয়ার্সটান (Anne of Geirstein)' পুস্তক পাঠের পর পাঠক অনুভব করবেন, য়ুরোপের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত আর কোথাও জাতীয়তার আদর্শ এত দৃঢ়ভাবে নেই। তবুও এই ছোট্ট দেশটি তিনটি ভাষা ও দুটি ধর্মে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যের শহরগুলিতে পারিয়া (অস্পৃশ্যজাতি) পল্লীগুলি মন্দির সংলগ্ন ব্রাহ্মণ গৃহগুলির মতোই সমভাবে মূল্যবান। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিশুদের ক্রীড়াভূমি,সবই বয়োপ্রাপ্তদের পৌরসভার মতোই অতি প্রয়োজনীয়। বাস্তুভূমির অধিষ্ঠাত্রী ভূম্যাদেবীর নিকট মুসলমান কৃষক হিন্দু শ্রমজীবির মতোই সমান প্রিয়। মানবহৃদয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজন আছে (All Humanity is necessary to the heart of Humanity)। প্রত্যেকটি ব্যক্তি সত্তার কাছে সামগ্রিক সত্তার প্রয়োজন। যারা এ কথা ভালভাবে জানতে সমর্থ, তারাই জটিল পৌর একতার শ্রেষ্ঠ উপাদান। জাতীয় মনোভাব (public spirit) বলতে আমরা যা বুঝি তা হোল কোন ব্যক্তিমনে এই পৌর চেতনার অভিব্যক্তি। অর্থাৎ জাতীয় মনোবৃত্তি (public spirit) হোল সেই চারিত্রিক বিকাশ যার দ্বারা পারিবারিক ক্ষেত্রে যেমন ঘটে, তেমন জটিলতর প্রতিষ্ঠানের অধীনে অহংকে দমন করে রাখা। এইভাবে নূতন কর্তব্য, নূতন দায়িত্বের উদ্ভব ঘটে এবং দলীয়, সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত হীন প্রাপ্তিসমূহ অতিক্রম করে পৌরসংহতির আদর্শ সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে রাখা হয়।

কী সেই বন্ধনসূত্র যা এই সব বিচিত্র, বহু উপাদান একত্র করে একটি নির্দিষ্ট পৌর সত্তা সৃজন করে? সকলের সাধারণ আবাসস্থলের সঙ্গে সমান সম্পর্কের মধ্যেই কী তা নিহিত নেই? স্বগৃহের প্রতি আসক্তির মতো আর একটি সর্বজনীন মনোবৃত্তি জীবনে কদাচিৎ দেখা যায়। যে স্থানটির উপর নগর অবস্থিত তা সত্যই

মানবিক ভালবাসার কেন্দ্র, এবং তা হোল আধ্যাত্মিকতার পবিত্র পীঠস্থান। কঠিন পর্বতদ্বারা সুরক্ষিত সমুদ্র অভিমুখী ঢালু স্থানের উপর এথেন্স অবস্থিত। সাতটি পর্বত দিয়ে ঘেরা একটি পেয়ালার মতো স্থানে রোম নগরী অবস্থিত। দীপপুঞ্জের সাদর আশ্রয়ে সীন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে প্যারিস। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই কত না স্বপ্ন, কাব্য, প্রার্থনা, ভালবাসা ও বিজয়বাহিনীর কেন্দ্র হয়েছে। দেবতারাও এমনভাবে চিত্রিত, যেন তাঁরা নির্বাচিত ভূমির জন্য সংগ্রামরত। পাল্লা এথিনি (Pallas Athene) এথেন্সকে রক্ষা করতেন। রোম নিজেকে অনন্তকালের নগরী বলে চিন্তা করে এসেছে। আর প্যারিসে মাত্র সেদিন পুভি দ্য স্যাভনের (Puvis de Chavannes) হাত সেণ্ট জেনেভিয়েভের (St. Genevieve) অপরূপ রূপকথা অঙ্কিত করেছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, যে শহর মনেপ্রাণে অতি আধুনিক সেও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, ঊর্ধ্বে স্বর্গধামে ঋষিদের (saints) মধ্যে একজন কেউ আছেন, যিনি সর্বদা তার পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন।

বাসস্থানকে আদর্শমণ্ডিত করে তোলার দৃষ্টান্তের জন্য অতদূরে যাবারই বা কী প্রয়োজন? বারাণসীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্—যে বারাণসী একদা গড়ে উঠেছিল বৈদিক হোমস্থলীকে ঘিরে, আজ সে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণময় পুরী। এলাহাবাদ কী—যার গঙ্গা যমুনার পবিত্র জলে প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী স্নান করে? যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী কাংগ্ড়ার রাণী—দেবী কালিকার মন্দির সহ চিতোরই বা কী? আর কলকাতার কথাই বা কী— যেখানে মহাকালীর ঘাট-রক্ষক নকুলেশ্বরদেব আবির্ভূত? এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, সেখানেই আমরা দেখবো, মানুষ তার বাসস্থানকে নিজের ও অপরের চোখে আশ্চর্য পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছে এবং প্রতি গৃহে প্রতিদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তার সঙ্গে এক হোয়ে মিশেছে ঈশ্বরীয় দিব্য দীপ্তি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

নবীন ভারত, য়ুরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপে মুগ্ধ—কেবল মুগ্ধ কেন, সম্মোহিতও বলা যায়। তার ধারণা বিভিন্ন দলের হট্টগোলের স্থানরূপে পরিণত হোতে না পারলে পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার অন্তর্গত শক্তি ও উদ্যমের পরিচয় দেওয়া হবে না। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে পরস্পরকে অভিযুক্ত ও আক্রমণ করবার যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে এর স্বপক্ষে এটাই তার একমাত্র যুক্তি। একই দেশের অধিবাসিগণের আবাসভূমিতে, বিভিন্ন স্থানে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই-এর অর্থ সময় ও যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করা। বস্তুতঃ আজকের ভারত এখনও উপলব্ধি করেনি যে, তার আন্দোলন কোনও দলীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টা মাত্র নয়, পরন্তু এক জাতীয় আন্দোলন অর্থাৎ এক ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতি। জাতির সমস্যা সম্বন্ধে যারা প্রকৃত খাঁটি লোক তাদের মধ্যে মতভেদের অবকাশ নেই। বিধান পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানদের এক সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে কি উভয়ে এক মতাবলম্বী বলে গণ্য হবে না? ব্রাহ্মণ কোথায় আহার করেন বা নৈশ ভোজনে তিনি কোন্ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন এ বিষয়ে কারও কোনও কৌতূহল নেই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা বৈদ্য কিংবা ক্ষত্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভায় কি পরস্পর বিরোধী দাবী উপস্থিত করেন? পৌরসংস্থায় নাগরিক হিসাবে একজনের মঙ্গলের দ্বারা কি অপরেরও মঙ্গল বোঝাবে না? আশ্চর্যের বিষয়, সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা বিরোধী বোল্‌চাল দিয়ে মানুষের চোখে কতদিন ধূলা দেওয়া চলে? কাল্পনিক গন্ধের পিছনে কুকুরকে কতদূর ঘোরানো যায়? এটা কি অদ্ভুত নয়? দেশের মধ্যে বহুকার্য বিপথে পরিচালিত হচ্ছে; রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারাও অসংবদ্ধ। এর কারণ ভারতীয় রাজনীতি অনেকাংশে অনুকরণ প্রবণ এবং মন্দ জিনিস অনুকরণেই তার ঝোঁক বেশী।

কংগ্রেস সম্বন্ধে পূর্বের সমস্ত ধারণা পরিহার করে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, এমন একজন প্রথম দর্শকের কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার হোল চরম দক্ষিণপন্থী থেকে চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকল সদস্যগণের মধ্যে অসাধারণ মতৈক্য। একদিকে কোন প্রাচীন ব্যক্তি কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাবকে অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করবেন এবং ঐ বিষয়ে জোর করা হোলে তিনি পদত্যাগ করবেন। অপর দিকে কোন যুবক এই অতি সাবধানতার প্রতি অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করে উক্ত নীতিতে অনাস্থা প্রকাশের জন্য প্রবীন ব্যক্তিকে আহ্বান করে বসবেন। হয়তো যুবকটির কথাই ঠিক, অথবা তা নাও হোতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় মতান্তরের মধ্যেই নবীন ভারত এমন মেতে ওঠে যাতে সে নিজেকে সাংঘাতিক কলহ ও হতাশার মধ্যে জর্জরিত করে ফেলতে পারে। ইতিমধ্যে যে কোন বহিরাগত দর্শক সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবে যে, এদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদের চিহ্ন নেই, এবং এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতের জাতীয়-আন্দোলন-তরণী শিক্ষিত ও বলিষ্ঠ ভারতীয়গণের দ্বারা নির্ভুল ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।

কংগ্রেসের কাজ, রাজনৈতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়, কংগ্রেস হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক মাত্র—একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। উচ্চ মহলে এখানকার বিতর্কমূলক আলোচনা মর্যাদা পেল কিনা, সরকারী মহলে এর মতামত কতখানি গৃহীত হোল কি হোল না, তার উপরে এর সার্থকতা নির্ভর করতে পারে না। বরঞ্চ কি পরিমাণ কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতা সহকারে তার নিজস্ব কার্যাবলী সে পরিচালনা করতে সক্ষম, কি পরিমাণ লোকসংখ্যা সংহত করে রাজনৈতিক কর্মধারার যোগ্য করে তুলতে পারে এবং কি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাগুলি দেশময় প্রচার করতে সমর্থ হবে

তার দ্বারাই তার কৃতকার্যতা নির্ণীত হবে। এই মূল বিষয়গুলি যদি একবার সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তবে কংগ্রেসে কি ধবনের প্রস্তাব গৃহীত হোল, বা কোথায় কম বেশী ভদ্রতা প্রদর্শিত হোল, ও বাক্যগঠনে কতগুলি বিশেষণ প্রয়োগ কবা হোল, তাতে কিছু যায় আসে না। এটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, কংগ্রেসের যথার্থ কাজ হচ্ছে শিক্ষাসংস্থারূপে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ সঞ্চার করা। যাতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সেজন্য কংগ্রেসের সদস্যগণকে নূতনভাবে, নূতন চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে। দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কর্মতৎপরতায়, রাজ-নৈতিক বিশ্বস্ততায়, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে সতর্কতা রক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সর্বশেষে হিমালয় থেকে কন্যাকুমাবিকা, মণিপুব থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অধিবাসিগণের প্রত্যেকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ সমুজ্জ্বল করতে হবে।

যাই হোক্, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস বলতে আসল দলটিকে বোঝায় না—সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস বলতে একটি দিককেই বোঝায়—সেটি হোল অনিয়ন্ত্রিত, তুলনাহীন বিপুল জনসংখ্যার রাজনৈতিক দিক। এই দুই বিপরীতমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে অগ্রগতি ব্যাহত করবার মতো কোন অন্তরায় নেই। এইভাবে কংগ্রেসের অনুরূপ জাতীয় আন্দোলনের আর একটি অরাজনৈতিক অঙ্গ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক উপাদান অপেক্ষা অরাজনৈতিক উপাদানটির পক্ষে নিজস্ব কর্মাদর্শ স্থাপন অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার।

কোন সীমাবদ্ধ কর্মপদ্ধতি না হোলেও একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপক কর্মসূচী দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজন। জাতীয় আন্দোলনকে কোন্ কোন্ কর্তব্যের সম্মুখীন হোতে হবে এবং কর্তব্যগুলি কী ধরনের, তা অনুধাবনের বিষয়।

সকলেরই কর্তব্য এক—দেশের মাটি ও পরস্পরের মধ্যে একটা সাধারণ একতাবোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে সমস্ত জাতির শিক্ষাদান। তবে এ কথা চিন্তা করা ভুল যে, প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষিত হবে। লেখা ও পড়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার পথ সুগম হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্বদেশী-তপস্যার মাধ্যমে মেয়েরা আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এই স্বদেশী-তপস্যা তাদের একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে, উন্নত করেছে এবং এই অগ্রগতি কখনও ব্যাহত হবে না। মাতৃভূমির আহ্বান এক বিশেষ আবেদনের সঙ্গে মর্মস্পর্শ করে, কিন্তু সে আবেদন যখন ভাষাহীন, অশিক্ষিত, অসহায় জনতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তখন সেটি স্বদেশী ব্রতের আবশ্যিক অঙ্গস্বরূপ শিল্প সংগঠনের মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত। আগে কাজ, পরে তত্ত্ব। প্রথমতঃ প্রয়োজন পারস্পরিক ভালবাসা ও আনুগত্য,—দ্বিতীয়তঃ সেই সব ভাবধারা ও সেই সব উপদেশ আবশ্যক, যা নবজাগ্রত ভ্রাতৃত্ববোধের ভিতবে বৌদ্ধিক গভীরতা ও দৃঢ়তা এনে দিতে পারবে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের কর্তব্য হবে বর্তমানে জাতীয়তা সম্পর্কে মূক দুটি বৃহৎ নৈতিক শক্তির ক্ষেত্রকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মুখে ভাষা প্রদান করা। এ দুটি ক্ষেত্র হোল নারী ও কৃষক সমাজ।

আমরা যাকে ভালবাসি তার কথা চিন্তা করি, সেই বিষয়ে চিন্তা করি—যে বিষয়ে আমরা জানি। সুতরাং প্রথমে স্বদেশ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে হবে। তারপর স্বদেশের প্রতি ভালবাসা আপনা থেকেই আসবে। এইভাবে আমাদের বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই মহান্ ভাবধারা স্পন্দিত হবে—'অন্য কোনও দেশ নয়—এই দেশই আমাদের মাতৃভূমি। আমরা প্রত্যেকে ভারতবাসী।'

বর্তমানে আমাদের সামনে দেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার বিশেষ দায়িত্ব উপস্থিত—যে দায়িত্ব জাতি সংগঠক বিশাল দলের দ্বারা প্রতিপালিত হবে—যাতে প্রতি ছাত্রের ও নরনারীর জন্মগত অধিকার রয়েছে। এই দলের শেষ প্রান্তে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কাজ হোক জাতীয় গৌরবকে উন্নীত করা। এখানে রয়েছেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক কর্মে রত কর্মিবৃন্দ। তাঁদের প্রতিজ্ঞা হবে চরম উৎকর্ষ লাভের প্রতিযোগিতায় কোন পাশ্চাত্যবাসী তাঁদের অতিক্রম করতে না পারেন—তাঁদের ব্রত হবে হয় জ্ঞানলাভ, নয় মৃত্যুবরণ।

প্রথম দলের বিবেচনা অনুযায়ী কর্তব্যের স্বরূপ কি হবে সে প্রশ্নের সঙ্গে অনুরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী কর্মীদলের সমস্যার কোন মিল নেই। সাধুদের সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থের যে সম্পর্ক, জাতীয় চেতনার প্রবর্তক ও প্রচারকদের—যারা জাতিকে সংগঠন করবে তাদের অধিকাংশের সঙ্গে সেই সম্পর্ক। গৃহস্থগণ সাধুদের জীবন যাপন করতে পারে না, তবু তাদের (গৃহস্থদের) সহৃদয়তা ও নীরব সমর্থন সাধুর জীবনকে সম্ভব করে। সুতরাং এটি বিশেষ প্রয়োজন যে, এঁরা উপলব্ধি করবেন এ যুগের আদর্শ হোল—'পারস্পরিক সাহায্যদান, আত্মসংগঠন ও সহযোগিতা।'

গৃহস্থের পক্ষে কিছু পরিমাণে শহীদ জীবনের সাহস প্রয়োজন—যাতে সে কোন আত্মিক যুদ্ধে নয়, জাগতিক বিষয়ে সার্থকতা লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোতে পারে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্যদান, কৃষকদের সাহায্যদান সমিতি, সমবায় ঋণদান সমিতি পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু প্রথমে ও শেষে এবং সর্বোপরি তার উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, এই সব আন্দোলন, দায়িত্ব গ্রহণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৃতই চারদিকে বিস্তৃত হবে এবং ভারতীয় জাতীয়তার আন্দোলন ক্রমে ভারতবর্ষকে মহাজাতি রূপে পরিণত করবে।

এক আধ্যাত্মিক স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এবং স্বকার্য সাধনের প্রয়াস-মাধ্যমে ভারতের জাতীয়তার আদর্শ ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন এবং এই পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমেই আমরা একটি জাতি (nation) রূপে গড়ে উঠতে পারব। পবিবর্তন মাত্রেই ধ্বংসাত্মক নয়, কিন্তু যে পরিবর্তন উদ্দেশ্যহীন অথবা ভ্রান্ত লক্ষ্যের অভিমুখী, সেই পরিবর্তনই ধ্বংসাত্মক। নৈতিক নির্দেশনার প্রচণ্ড বেগ আছে এবং নৈতিক স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম এইরূপ এক জাতীয়তার আদর্শই আমাদের সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। আজকের সংগ্রাম-সমুদ্রেব যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, তার তরঙ্গের দোলায় আন্দোলিত সংগ্রামশীল যাত্রীদের মাথাব উপরে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল কবে প্রকাশ পেতে দেখি একটি মাত্র চিন্তা: 'আমরা যেন একটি জাতিতে (nation) পরিণত হোতে পাবি।'

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ভারতীয় নারীর সংস্কৃতি ও সমাজে তার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। এ ক্ষেত্রেও কি নূতনতর বিকাশ ঘটবে? যদি ঘটে তবে কোনদিকে? বর্তমান হতাশা ও ধ্বংসেব প্রক্রিয়া থেকে যে কোনও মূল্যে বাঁচবার আশু প্রয়োজনীয়তা এবং আত্মসচেতন, আত্মনির্দিষ্ট, আত্মনিয়ন্ত্রিত সুদৃঢ় ও সংহত এক সামগ্রিক সত্তায় পরিণত হবার—অর্থাৎ জাতীয়ত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে এবং পথ নির্দেশ দেয়। জগতে পরিবর্তন ঘটবেই। একমাত্র ভারতই কি চিরপ্রবহমান সৃষ্টির মধ্যে রূপান্তর পরিগ্রহ করতে অস্বীকৃত হবে? কিন্তু সে পরিবর্তনকে আমরা স্বাধীনভাবে, সঙ্কল্পপূর্বক স্বেচ্ছায় ও বিচার ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক আনব, সে পরিবর্তন হবে আমাদের স্বয়ং পরিকল্পিত ও স্বয়ং নির্বাচিত এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে। তাহলে

কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সীতা, সাবিত্রী বা রাণী অহল্যাবাঈ-এর আদর্শ অনুসরণ করে এসে আমাদের নারীগণ আজ অধঃপতনের স্তরে নেমে লাস্যময়ী ও বিবাহবিচ্ছেদকারিণীতে পরিণত হবে? ভারতীয় পদ্মিনী কি অবনমিত হোয়ে গ্রীসীয় হেলেনে পরিণত হবে? যা পরিবর্তিত হবেই, তার পরিবর্তন না ঘটালে ভারত অতীত কীর্তির ভারে ভরাডুবি লাভ করবে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় নারীর পুরাতন সৌম্য গাম্ভীর্য ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীনযুগের পুণ্যশীলতা নষ্ট না করে নূতনতর বিদ্যাকে যুক্ত করতে হবে। বৃহত্তর দায়িত্ব পবিত্রকে পবিত্রতর করে তুলবে। গভীরতর জ্ঞান নূতন ও অধিকতর মাধুর্যের উৎস হবে। জগজ্জননী ভবিষ্যতের নারীকে আরও সুন্দর, আরও মহিমময় করে তুলছেন—এ দেখবার আশা বর্তমান কালের মানুষ করতে পারে। আধুনিক যুগের সে মহিমময় সংপ্রাপ্তির তুলনায় প্রাচীন মহিমময় কল্পনার দীপশিখা মৃদু বলে মনে হয়।

যাই হোক, স্ত্রীশিক্ষা বহুবিধ সমস্যার অন্যতম মাত্র। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বাণিজ্য ও শিল্প সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা যে আজ নূতনতর অভ্যুদয়ের পথে চলেছি সে কথা বলাই বাহুল্য। সামাজিক ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের আশু পবিবর্তন বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা দীর্ঘকাল মত্ত ছিলাম। কিন্তু সত্য কথা হয়তো এই যে, এখনও এ সব ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্যতা আমরা অর্জন করিনি। হোতে পারে আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান নেই। একথাও এখানে স্পষ্ট বলা প্রয়োজন যে, এ ধরনের জ্ঞানলাভ এ জগতে বা এ জীবনে দুর্লভ ও কঠিন; এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দায়িত্ববোধ অর্জনও খুব সহজ ব্যাপার নয়। সর্বোপরি, বৈদেশিক সমালোচনা ও মন্ত্রণা লাভের অবকাশ আমাদের কম। অথচ যদি এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সত্য সত্যই নিজস্ব মত গঠন করতে হয়, তবে বিদেশী অভিমত একান্ত

প্রয়োজন। বস্তুতঃ জাতীয়তাবোধের বিকাশের জন্য আরও অনেক বিষয়ের মধ্যে আমাদের ভিতর একটি সার্বভৌম ধারণাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব প্রয়োজন। একটি জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন নিজেদের এক একক দেহসত্তায় অভিন্ন বলে অনুভব করে, যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়—এ হোল সেই জাতীয় একটি অনুভব। এরূপ ঐক্য ভাবনার সূত্রে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে সক্ষম আমরা যেন একটি জাতীয় পরিষদে (national commission) মিলিত হোয়ে নিজেদের সমাজ কল্যাণের পথ ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সক্ষম হই।

ভারতীয় শিল্প ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে এরূপ সার্বভৌম দৃষ্টির প্রয়োজন এত অধিক নয়। ধরে নেওয়া যাক যে, জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি ভারতীয় চিত্রশিল্পের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ব্যাপারে বিবেচনার মনোভাব গ্রহণ করেছে। তাহলে তাকে কোন্ বস্তু আবিষ্কার করতে হবে? কী স্থির করতে হবে?

একদিক দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রতীকতার একটি বিরাট শিক্ষালয় ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রত্যেক কৃষিজীবী, বাজারের প্রত্যেক দীনতম অধিবাসী চিত্রের মর্ম উপলব্ধি করে, চিত্র ভালবাসে—ভালবাসে অলঙ্কৃত পাত্র, মূর্তি অথবা যে কোনও ধরনের প্রতীক শিল্প।

শিল্পকে দেখবার দৃষ্টি ইতালীর মতোই এ দেশে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। মূর্তি পূজার প্রাচীন প্রথা নিছক দেখা থেকে চিত্রের মর্ম হৃদয়ে গ্রহণ করার পথকে সুগম ও সংক্ষিপ্ত করেছে। এই প্রতীক ধর্মের আবেদন বিশ্বজনীন। চিত্রটি যে ভাষাতেই ব্যাখ্যাত হোক, পাঠক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বা নিরক্ষর যাই হোন, চিত্রটি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে এবং তা নির্ভুলভাবেই করে থাকে। দরজার চৌকাঠে জেলে রাখা প্রদীপটি, উষাগমের পূর্বে যাতে নদী থেকে স্নান করে ফেরার পথে গৃহিণীর নিজ গৃহের দরজা চিনতে সুবিধা

হয়, কিংবা দরজার উপর কাঠের সঙ্গে মাটি দিয়ে আবদ্ধ এক গুচ্ছ ধান, তুলসীতলায় প্রজ্বলিত প্রদীপ, গোধূলি লগ্নে গাভী ও বৎসদের গ্রামে ফিরে আসা—এই ধরনের প্রত্যেক দৃশ্যই ভারতবাসীর হৃদয়ে একটি বাণীই বহন করে। এই কারণেই চারুকলা আমাদের একটি সাধারণ ভাষার সুযোগ প্রদান করে এবং মাতৃভূমির সংগঠন তথা পুনর্জাগরণের জন্য শিল্পের নবজন্ম আবশ্যক। ভারত বহু বৃহৎ (great) শিল্পযুগ প্রত্যক্ষ করেছে যার এখনও অবসান ঘটেনি। যে যুগে এলিফ্যানটার ভাস্কর্য রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে যুগ হিন্দুধর্মের সমন্বয় ভাবনার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। অজন্তার চিত্রাবলীর মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ তা আধুনিক বাস্তবানুগ শিল্পের মতোই প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ ও বর্ণনায় সমান মুক্ত ও জীবন্ত। যারা সাঁচী, অমরাবতী ও গান্ধার নির্মাণ ও খোদাই করেছে সে সব শিল্পের ক্ষেত্রে তারা এক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে—মাঝে মাঝে পর পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিপুল উদ্দীপনার ঢেউ ঐ যুগগুলিকে চিহ্নিত করেছে। এমনকি, মুসলমান রাজত্বের যুগ মুসলমান স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্র ব্যতীত চারুশিল্পের অপরাপর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে তা একান্তই বাহ্য। ভারতীয় সৃজনশীলতার বিন্যাসধারাকে তা কখন অবদমন করেনি; বাঁকীপুরের গ্রন্থাগারে (পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরী) রক্ষিত অলঙ্কৃত পুঁথিপত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

সুতরাং জাতীয়তার যুগ (age of nationality) পূর্ববর্তী বিভিন্ন যুগের সৃজন শক্তি অবশ্যই স্বহস্তে পুনর্বার গ্রহণ করবে। নব নব বিজয় অভিযানের পন্থা হোল পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্রকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা। যে ব্যক্তির কোন ঐতিহ্য নেই তার কোন ভবিষ্যতও নেই। আধুনিক শিল্পীর এ কথা জানা ও হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কারণ অকস্মাৎ সমগ্রভাবে বিশ্ব পর্যবেক্ষণের জন্য তাকে প্রস্তুত হোতে হচ্ছে বহু অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

পূর্বপুরুষদের মতো তার কল্পনা এখন আর কেবল স্বজাতির কীর্তির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নেই। সে যে অবস্থায় উপনীত, সেখান থেকে সে মিশরীয় শিল্পের সঙ্গে গ্রীসের, মধ্যযুগীয় ইতালী অথবা হল্যাণ্ডের সঙ্গে আধুনিক ফরাসী শিল্পকর্মের তুলনামূলক বিচার করতে সমর্থ। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন থাকলে তা তার মুক্তির কারণ হোয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠবার ক্ষমতালাভের পূর্বে চারাগাছের বেড়া ভেঙ্গে দিলে অরক্ষিত চারা গাছটির যে অবস্থা হয় তারও সেই অবস্থা হোয়ে দাঁড়াবে।

ভারত যে শিল্পের ব্যাপারে কেবল পুরাতন রীতিরই অনুসরণ করবে এবং নূতনকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তা হয় না। তথাপি ভারতীয় শিল্পরীতিতে ভারতীয় অনুষঙ্গের (association) মাধ্যমে ভারতবাসী উৎকর্ষ লাভ করতে শিখেছে, সেখানে ইতালীয় অথবা গ্রীসদেশীয় রীতি বা অনুষঙ্গের মাধ্যমে কিছু উপস্থাপিত করার প্রয়াস একান্তই নিষ্ফল। যদি কোন ভারতীয় চিত্রকে প্রকৃত ভারতীয় এবং মহৎ সৃষ্টি হোতে হয় তাহলে তাকে ভারতীয় রীতিতে ভারতবাসীর হৃদয়ে আবেদন করতে হবে, তাকে এমন ভাব বা ধারণার ব্যঞ্জনা দিতে হবে যা এদেশীয় সকলের পরিচিত কিংবা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধির যোগ্য। সত্যকারের অতি উচ্চস্তরের সৃষ্টি হোতে গেলে তাকে দর্শক মনে এমন দিব্যানুভূতি বহন করতে হবে যার ফলে সে নিজেকে উন্নততর বলে মনে করবে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, এই উদ্দেশ্যে শিল্পটিকে এমন সব উপাদান দিয়ে রচনা করা প্রয়োজন যা হবে জাতীয় রুচি সম্মত। যেমন কোন ভারতীয় যিনি উড়িষ্যা দেশের দরজায় পাথরের উপর খোদাই কাজ অথবা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের পেটানো রূপার কাজ উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন তিনি ইতিমধ্যেই সৌন্দর্যের মহান্ ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। সৌন্দর্যের সেই মহান্ ভাষায় তিনি যা উপস্থাপিত করবেন, যে কোন ভারতীয়

তৎক্ষণাৎ তা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন ; ভারতের বাহিরের কোন ব্যক্তিও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষিত বা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী হোয়ে থাকলে তিনিও তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। এখন এ ভাষায় তিনি (ভাবতবাসী) পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, যেহেতু এর প্রতিটি সরল ও বঙ্কিম বেখা তিনি নিজে আয়ত্ত কবেছেন। তবে যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি উড়িষ্যা দেশীয় গৃহের বহির্ভাগ অঙ্কন করবেন, সেই দক্ষতার সঙ্গে কি গথিক (Gothic) রীতিতে জানালা অঙ্কনে প্রকাশ করতে সমর্থ হবেন ? নিশ্চয়ই না। স্বক্ষেত্রে যিনি নিপুণ শিল্পী এবং অভিজ্ঞ শিক্ষানবীশরূপে পরিচিত, বিদেশী শিল্পব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে তিনি অনেক দোষক্রটি এমনকি অশ্লীলতা পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যাব ফলে 'গথিক' স্থাপত্যরীতিতে যাঁরা সুদক্ষ তাঁদের চোখে উক্ত শিল্পকর্মটি সম্পূর্ণ নষ্ট বলে মনে হবে। কাজটি খুব ভাল হোলেও বিদেশী শিল্পের একজন নকলনবীশ যা করবে তা বড়জোব 'গথিক' স্থাপত্য শিল্পের কাছাকাছি পৌঁছবে ; যেমন একজন ইংরেজ বা জার্মান বস্ত্র উৎপাদক কাপড়ের উপর ভারতীয় প্যাটার্ণের কাছাকাছি হয়তো কিছু করতে পারবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, চিত্রের উপাদান ভাষাবই মতো ; যেমন কোন সত্যকারের কবি তাঁর সকল কবিতা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে রচনার কথা ভাবেন না, তেমনি কোন শিল্পীও তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিকে এমন রীতিতে অঙ্কিত করেন না, যা জনসাধারণেব বোধগম্য নয়। যে কোন মহৎ অভিব্যক্তি—রচনা, অঙ্কন বা ভাস্কর্য বা ঐ জাতীয় যা কিছু, মানুষেব হৃদয়ের নিকট সহানুভূতি লাভেব জন্য আবেদনস্বরূপ এবং মানুষ কখন অজানা ভাষায় আবেদন করেন না।

কিন্তু নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিসমূহ নিজের দেশের বৈশিষ্ট্য বহন করছে বলে যে বিশ্বজনীন আবেদনের স্তরে উন্নীত হোতে পারে না তা নয়। কোন বিদেশীর পক্ষে উড়িষ্যা দেশীয় দরজা

অঙ্কন করা সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। যে কোন বস্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হোলে সব দেশের মানুষেব মর্ম স্পর্শ করে। আমরা কেউই প্রাচীন মিশরীয় মন্দির পুনরায় নির্মাণ করতে পারব না, কিন্তু ঐ মন্দির দেখে সকলেই মুগ্ধ হোতে পারি। উক্ত শিল্প নিদর্শনটি তাব নিজস্ব শিল্পধারার পরিণতি। বস্তুতঃ সেই শিল্পধারাই উক্ত শিল্প কর্ম অভিব্যক্ত কবেছে, এবং এর অন্তর্নিহিত মহত্তর ও সাধারণ গুণগুলির আবেদন বিশ্বজনীন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অনুরূপ একটি শিল্পকলা সৃষ্টি করতে হোলে যারা উক্ত শিল্পকে রূপ দিয়েছে, তাদেব অনুভূতি আমাদের লাভ করতে হবে, তাদের জীবনযাপন করা প্রয়োজন, তাদের আশা ও প্রার্থনা আমাদের মর্মে স্থাপন করা চাই; এক কথায় সর্বতোভাবে তাদের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। এই কাবণেই কোন এক যুগের শিল্পকে পরবর্তী যুগে অনুরূপভাবে হৃদয়ঙ্গম বা উপভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তির আবেগ প্রসূত মিথ্যা তত্ত্বসমূহ যাই বলুক না কেন, যে গৃহ আজও ব্যবহৃত তার চেয়ে কোন প্রাচীন ধ্বংস স্তূপ কখন অধিকতর সুন্দর হোতে পারে না। প্রতিদিনের পরিচিত জীবনের মতো আর কিছুই প্রিয় হোতে পারে না।

কোন অঙ্কিত চিত্রের অন্তর্লীন বিশ্বজনীন উপাদান কী ভাবে তার স্থানীয় গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় শিশুসহ ম্যাডোনার চিত্রটি হিন্দু দেবদেবীর মাঝখানে যে স্থান গ্রহণ কবেছে তার মধ্যে। উক্ত দৃশ্য না দেখে চিৎপুর রোড দিয়ে যাবার উপায় নেই। এরকম ক্ষেত্রে চিত্রটির গভীর মানবীয় দিক এবং সহজবোধ্য উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার যে কোন চিত্র মালিকের,—সে যতই নগণ্য হোক অন্তর ঠিক স্পর্শ করবে। বিষয়বস্তুব বৈদেশিকত্ব চিত্রটির প্রতি তার অন্তরের সহানুভূতি উদ্রেকের পথে অন্তরায়স্বরূপ। চিত্রে বর্ণিত চরিত্র দুটির

নাম সে জানে সত্য, কিন্তু তদতিরিক্ত সামান্যই জানে। সে উভয়ের সংযুক্ত দৈনন্দিন জীবন কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না। সেই দিব্য শৈশব কাহিনীর কিছুই তার জানা নয়। তথাপি শেষ পর্যন্ত চিত্রটি একজন জননী ও তার শিশু সন্তানের, এবং এই সম্পর্কের মর্ম সারা পৃথিবী গ্রহণ করতে সমর্থ। দৈনন্দিন জীবনের অনুরূপ সহস্র সাধারণ ঘটনা এই ছবিটির সঙ্গে মিলে যায়। সেজন্য পূর্বোক্ত মহান্ শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত মানবিকতা স্থানীয় প্রভাব অতিক্রম করে যায়। এখন অপর কোন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্যের কথা ধরা যাক—অনুরূপ সহজবোধ্য, প্রত্যক্ষ আবেদনমূলক, মহিমাব্যঞ্জক এবং মধুব সম্বন্ধদ্যোতক—অথচ তার বিষয়বস্তু হোল—'ভারতীয় জননী ও তাঁর শিশু'—অনুরাগী দর্শকের কাছে এই চিত্র অধিকতর অথবা কম আদরণীয় হবে ?

জয়পুর যাদুঘরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয় যেই নির্বাচন করে থাকুক সে ভারতীয় শিল্পকলার গৌববময় অতীত সম্যক অনুধাবন করেছে—ভবিষ্যতে তার বিরাট সম্ভাবনা কোন্‌দিকে প্রত্যাশিত, তাও সে হৃদয়ঙ্গম করেছে। . ঐ চিত্রগুলির মধ্যে একটির বিষয় কোন এক অলঙ্কৃত পুঁথি থেকে আহৃত। আসল চিত্রটি পুনরঙ্কিত করবার সময় চিত্রকর তাঁকে পঞ্চাশ বা একশত গুণ আয়তনে বর্ধিত করেছেন। এর বিষয়বস্তু হোল যুধিষ্ঠিবের পাশা খেলার বিরাট দৃশ্য। সমগ্র চিত্রটি লাল এবং সোনালী রঙ-এর ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত, বহু লোকের প্রতিকৃতিতে পূর্ণ, গতিবেগ প্রকাশের এবং সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। এ কথা সত্য, যে কোন আধুনিক শিল্পী চিত্রকলার আনুপাতিক জ্ঞান (perspective) সম্বন্ধে অচেতন থাকলে এ ধরনের চিত্র অঙ্কিত করতে পারতেন না। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে সকল চিত্রশিল্পী আধুনিক বলে আজ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা সেকালের পুরাণ কাহিনীর এই সব চিত্রকরের মতো অনুরূপ দৈর্ঘ্যের জীবন্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ

চিত্র অঙ্কন করতে কখন সক্ষম হবেন না। একথা সুনিশ্চিত যে, শিল্পের দৃষ্টি থেকে তুলনায় কম এরূপ কোন গুণ লাভ করার জন্য ভারত ঐ সব পূর্বপ্রাপ্ত মহৎ গুণ হারাতে চায় না।

যে কোন মহৎ রীতির একটি বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, নিজেকে অধঃপতিত না করেও কোন নূতন জ্ঞান সে আত্মসাৎ করতে পারে। ঐ পাশা খেলা দৃশ্যের স্রষ্টার যদি আরও একটু প্রয়োগবিদ্যা থাকত, তাহলে খুব ভাল করে বুঝতে পারতেন দৃশ্য হোতে অদৃশ্যে বিলীয়মান ক্ষেত্রগুলি এবং দৃশ্যটির কেন্দ্রস্থল সম্পর্কে আর কী কী করণীয়। এই ধরনের জ্ঞান তাঁর সকল শিল্পসৃষ্টির উপরেই গভীর ছাপ রাখতে পারত, কিন্তু কখনই রঙ-এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা এবং জাঁকজমক ও সৌখীনতার প্রতি শিল্পীর ভালবাসা, কিংবা সাদৃশ্য বা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার নৈপুণ্য অথবা চিত্রটিকে অধিকতর শোভাবর্ধক বস্তুতে পরিণত করবার ক্ষমতা থেকে তাঁকে চ্যুত কোরত না। শিল্পক্ষেত্রে নিজস্ব জাতীয় রীতি বলে একটা বস্তু আছে। ভারতের শুধু প্রয়োজন এই ভারতীয় ধারার সঙ্গে য়ুরোপীয় প্রয়োগবিদ্যার সংযোজন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় নির্ভুল আনুপাতিক জ্ঞান (perspective) যে একমাত্র পাশ্চাত্যের বিশেষত্ব তা নয়। কলকাতার চিত্রশালায় (Calcutta Art Gallary) সম্প্রতি 'রামসীতার অভিষেক' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র চিত্র আনীত হয়েছে। এই সুন্দর ক্ষুদ্র চিত্রটিতে রাজসিংহাসনের পশ্চাতে অযোধ্যার প্রাসাদ, তাব পশ্চাতে জাহাজসহ নদী, ধান্যক্ষেত্র, সৈন্যদল এবং আরও কত কি অঙ্কিত। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ বা তারই নিকটবর্তী কোন সময়ে অঙ্কিত এই চিত্রটিতে—সুবিধার জন্য যাকে লক্ষ্ণৌ অঙ্কনরীতির অনুরূপ (Lucknow School) বলা যেতে পারে—চিত্রাঙ্কনের আনুপাতিক জ্ঞান একেবারে নিখুঁত। অথচ রঙ-এর সামঞ্জস্য ও পরিকল্পনার সৌন্দর্যে এটি পূর্ববর্তী কালের শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত। কোন একজন অজ্ঞাতনামা

শিল্পীশ্রেষ্ঠ কর্তৃক এই চিত্রটিতে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় অঙ্কিত হয়েছে, তেমনটি মধ্যযুগীয় কোনও ওলন্দাজ চিত্রে দেখা যায় না। প্রাসাদটি শ্বেত মর্মরের এবং তার অনেকখানি আকাশতলে উন্মুক্ত ও একখানি ম্যাগনিফাইং (magnifying) কাচের সাহায্য নিলে দেখা যাবে তার পশ্চাতে বৎসকে দুগ্ধদানরত গো-মাতা, অশ্বশালায় সুসজ্জিত অশ্ব, উট, হাতী এবং স্ব স্ব স্থানে পতাকা বাহকগণ। সুপ্রশস্ত সভাগৃহ ও বাসগৃহগুলিকে দেখা যাবে দিগন্তে বিলীয়মান। মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখা অলকাপুরীর কোন রূপসী নগরী।

কিন্তু যদি ভারতীয় চিত্রকলার এতগুলি এবং এরূপ মহৎগুণ লাভ হোয়ে থাকে, তবে য়ুরোপীয় চিত্রকলার এমন কোন্ গুণ আছে যার শক্তি ভারতীয় চিত্র শিক্ষার্থীদের আজ এমনভাবে বিমুগ্ধ করেছে, যার ফলে তারা নিজেদের পথ থেকে চ্যুত এবং এমন সব প্রয়াসে রত, যা এ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়ণ কার্যকে ব্যর্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে? দশজনের মধ্যে নয়জন শিক্ষার্থীর উত্তর, প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততাই য়ুরোপীয় চিত্রকলার মুখ্য আকর্ষণ। এই উত্তর পশ্চিমী চিত্রকলার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হোতে পারে, কিন্তু যে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু জানে, যে তার ভিতরে গভীরতর কিছু দেখতে পায়, সে এই উত্তরে তার সম্মতি জানাতে পারবে না। এই যে প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা, যা নিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের এত অর্থহীন প্রলাপ, তা শুধু কর্কশ এক স্থূলতা মাত্র। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আত্মিক সৌন্দর্যের মতো আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক এবং রহস্যময়ী। গ্রীসীয় শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা সুন্দর নিদর্শন দেখেছিলাম, হাইনে যাকে—'আমাদের মিলোর প্রিয় রমণী (Our dear Lady of Milo)' বলে উল্লেখ করেছেন তার আলেখ্যে নয়, দেখেছিলাম মিস জেন হ্যারিসন কর্তৃক একটি ফুলদানী থেকে পুনরঙ্কিত হংসপৃষ্ঠে সমাসীন

এক কুমারীর চিত্রে। চিত্রে কুমারীর চুল বিনুনী করে আঁট সাঁট খোঁপা বাঁধা, ঠিক যেন টুপির মতো ; তার সুষমাপূর্ণ দেহ সৌষ্ঠবে প্রাচীন রীতি অপেক্ষা পিউরিটান (Puritan) রীতি সুপরিস্ফুট। ছবিটি যেন মিষ্টি এলেইন (Elaine) বা গ্রেসেইন (Gretchen) অথবা উষাবালার (Ushabala) মতো—হয়তো সেই রকম লোকেদের জন্য যারা সুন্দরকে, শুধু সুস্পষ্ট দৃশ্যমান মাংসপেশীর মধ্যে নয়, পরন্তু সর্বস্তরে সর্বরূপে উপলব্ধি করেছে। একই ভাবে বলা যেতে পারে যে, আমাদের আজকের চিত্রশিক্ষার্থিগণ যতই একথা বিশ্বাস করা শক্ত বলে মনে করুন, সত্যকথা এই যে, কোন হিন্দু বিধবার ম্লান মুখচ্ছবি, আত্মগোপন করা হাসি, এবং স্থায়ী গভীর দুঃখ—ধনসম্পদ, যৌবন বা গরিমার চেয়ে অনেকাংশে অঙ্কনের পক্ষে যোগ্যতর বিষয় এবং একে ফুটিয়ে তোলাও অনেক বেশী কঠিন কাজ। য়ুরোপীয় শিল্পরীতির যিনি অভিজ্ঞ সমালোচক তিনি 'সিস্টিন ম্যাডোনা'র (Sistine Madonna) চিত্রটির মধ্যে রোমদেশীয় সুন্দরী মহিলা অপেক্ষা শিল্পী র‍্যাফেলের (Raphael) মেজাজ এবং মন বেশী করে অনুসন্ধান করবেন। একটি অঙ্কিত চিত্র (painting) এবং আলোকচিত্র (photograph) এক জিনিস নয়। কলাবিদ্যা নিছক প্রযুক্তি বিদ্যা নয়। সৃষ্টি শুধু অনুকরণ নয়। লক্ষ্ণৌ এবং কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল দেখতে যতই সুন্দর হোক, খুব উঁচুদরের ভাস্কর্য নয়। প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততাই যদি উত্তম চিত্রশিল্পের মানদণ্ড হয়, তাহলে লক্ষ্ণৌ-এর চিত্রশালায় সংরক্ষিত অযোধ্যার নবাবদের প্রতিকৃতি চিত্রের কথাই বা বলা হবে না কেন? একথা সত্য যে, ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি থেকে বৃহৎ ক্যানভাসে এগুলি অঙ্কিত করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর প্রতিকৃতি চিত্র (portraits) কী আর দেখা গিয়েছে? দেশ-কালের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছেন অন্তহীন আশা নিয়ে—এমন একটি ভাব যাঁর মুখমণ্ডলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, দিল্লীশ্বরের

সেই প্রথম প্রতিনিধি থেকে শেষতম উত্তরাধিকারী পর্যন্ত, প্রত্যেকেরই আ.লখ্য যেন জীবন্ত। চিত্রগুলির মধ্যে নবাব হিসাবে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সেই 'সর্বজন প্রিয়' (Well Beloved) আসাউদোল্লার (Asa-ud-Daulah) আলেখ্যই সর্বাপেক্ষা কম আকর্ষণীয়। যিনি শেষ রাজত্ব করে গিয়েছেন তাঁর চিত্রের পূর্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে যাঁর চিত্র, তাঁর সৌন্দর্যের এতদূর খ্যাতি ছিল যে, আজও বাজারে এমন ব্যক্তি দেখা যায় যে ঐ অনন্য চিত্রখানি অতি মূল্যবান সম্পদরূপে পেতে উৎসুক।

অতএব প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা পশ্চিমী কলাবিদ্যার অনন্য-বৈশিষ্ট্য নয়, এর পরিচয় সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়। অবশ্য একথা সত্য যে, কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টি দেখার আনন্দই হোল আমরা তার মধ্যে প্রকৃতিকে চিত্রকর রূপে দেখতে পাই এবং আরও নূতনতর সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, যা হয়তো আমরা নিজেরা প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পাই না। গ্রিফিথের (Griffith's) অজন্তা সম্বন্ধীয় পুস্তকে একটি খণ্ডচিত্র সন্নিবিষ্ট আছে। চিত্রটির বিষয় : দেব-বিগ্রহের পদযুগল ধারণ করে আছেন এক নারী। চিত্রটি অজন্তা গুহার দেওয়াল চিত্র (Fresco) থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি এমন একজন চিত্রশিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত যাঁর মধ্যে দুটি বিভিন্ন গুণ আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত, সে গ্রীক দেশীয় দৃষ্টি দিয়ে নরদেহ দেখেছে—হৃষ্টপুষ্ট, দৃঢ়, সুগঠিত এবং প্রচণ্ড প্রাণবন্ত রূপে। আবার মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে মানবাত্মাকে প্রার্থনার আকুতির মধ্যে প্রকাশ পেতে। এরূপ সমন্বয় ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যেই ভারতীয় চিত্রকলার ভবিষ্যৎ নিহিত। কারণ এদেশ চিত্রকরদের দুটি সুযোগ দিয়েছে—মানুষের স্থূল আকৃতিকে জানবার আবার উচ্ছল ভাবাবেগ, বিশেষ করে পূজাকালীন ভাবাবেগের প্রকাশকে চিনবার।

তবে য়ুরোপীয় চিত্রকলার কোন্ গুণ ভারতীয় চিত্রকরদের অনুকরণে প্রলুব্ধ করছে? আমার মতে এই আকর্ষণের কারণ চিত্রকলা সম্বন্ধে য়ুরোপীয় ধ্যান-ধারণা শিল্পীকে ব্যক্তিগত সুযোগের যে আশ্বাস দেয় তার মধ্যেই নিহিত। পশ্চিমী চিত্রকলা কেবল শিল্পীর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা বৃত্তিমাত্র নয়। অন্ততঃপক্ষে আধুনিক কালে এই চিত্রবিদ্যা এমন এক ভাষায় পরিণত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে মহৎ শিল্পিগণ জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। বস্তুতঃ এ যেন একটি কবিতা, সকলকেই অনুপ্রাণিত করতে মুক্তহস্ত,—যেখানে এবং যেভাবেই শিল্প জন্মলাভ করে থাক। অন্যদিকে ভারতবর্ষে শিল্প (Art) সর্বদাই একটি কারুশিল্পরূপে (craft) পরিগণিত হয়েছে এবং কমবেশী একটি জাতির (caste) মধ্যে বৃত্তিমূলকভাবে এর অনুশীলন সীমাবদ্ধ।

এরূপ জাতিগত শিল্পশিক্ষার একটি সুবিধা এই যে, বংশানুক্রমে শিল্পকুশলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, স্বর্ণকারদের মধ্যে সহসা স্বশ্রেণীর বহির্ভূত কর্মীর আগমনের ফলে জ্ঞান ও রুচির ক্ষেত্রে দ্রুত অধঃপতন ঘটেছে। কলকাতায় রঞ্জন (dyeing) শিল্পের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে অনুরূপ অধঃপতন দেখতে পাওয়া যায়। কারণ নিঃসন্দেহে নূতন অপরীক্ষিত রঙ্ ব্যবহারের আগ্রহাতিশয্যের ফলেই যারা বংশানুক্রমে শিল্পী, তাদের রুচি ও বিচার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, যাদের এ ব্যাপারে আদৌ শিক্ষাদীক্ষা নেই তাদের অনুভূতিকেই প্রাধান্য দান করেছে। ফলে রঙ্-এর ঔজ্জ্বল্য ও দুঃসাহসিকতা সত্ত্বেও ভারতীয় রীতির পরিবর্তে এমন জিনিস এসে পড়েছে যাতে আনন্দের চেয়ে বেদনারই কারণ অধিক।

অপরপক্ষে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতির বৈচিত্র্যহীনতাই তার আকস্মিক ও সর্বতোভাবে বর্জনের হেতু হোয়ে দাঁড়ায়। কারণ যে শিল্প উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ

কোন গোষ্ঠীব মধ্যে সীমাবদ্ধ তা অসহনীয়রূপে বৈচিত্র্যহীন এবং কতকগুলি বি.শেষ ভঙ্গীর এমন কবলস্থ হয় যে, শেষপর্যন্ত গোষ্ঠী-মন বিদ্রোহী হোয়ে নূতন রীতি অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে এর সত্যতা প্রশ্নের অতীত। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-এর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি-শিল্প বংশানুক্রমে হস্তক্ষেপের ফলে ক্রমশঃ চিত্রকলার নিপুণ নিদর্শন হোতে পারত। কিন্তু তাদের ভিতর নূতন উপাদান কিছু নেই এবং প্রচলিত গণ্ডির মধ্যে নূতন উপাদান সৃষ্টি করার শক্তি ও সুযোগেব অভাব। উঁচু মানের কোন নূতন ভঙ্গী আবিষ্কাবেব আকাঙ্ক্ষা এই সব চিত্রশিল্পীদের মনে সুস্পষ্ট ছিল না। কারণ জাতিগত (caste) বিদ্যা অবশেষে পরিণত হয় অভ্যাসে এবং অভ্যাসে যদিও নিপুণতা বৃদ্ধি পায়, সীমিত হয় কল্পনা শক্তি।

সুতরাং একদল চিত্রশিল্পী যদি বৃত্তিমূলক বিশেষ কোন জাতির (single caste) প্রতিভূ না হোয়ে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ হন, তাহলে তাদের মধ্যে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আশা করবার অধিকার আমাদের আছে তা হোল কল্পনার বিশালতা ও স্বাধীনতা। তাঁরা বিষয় নির্বাচন বা অঙ্কনরীতির ব্যাপাবে কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ হবেন না। সত্যকথা, তাঁবাও তাঁদের পিতৃপুরুষের মতো শ্রমিকই হবেন। কাবণ সকল শিল্পীই প্রথমতঃ শ্রমিক ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কবি, স্বপ্নবিলাসী এবং ভবিষ্যতের মহান্ প্রচারক। সমাজের দিক থেকে দেখলে আমাদের সময় ভারতে শিল্পকলা এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ঠিক যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীর য়ুরোপে অনুরূপ এক পরিবর্তনের যুগে মহান্ চিত্রশিল্পী গিয়োটো (Giotto) সে যুগের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতিকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে ধরে রেখেছিলেন—যে ফ্লোরেন্স একদা অবস্থান করছিল দান্তের (Dante) ছায়ায়, তাকে দিয়েছিলেন লুব্‌কের (Lubke) সুন্দর ভাষায়, 'পাথরের খোদাই একটি দিব্যগীতি, (a Divina Commedia carved in stone)'—সেইরকম সর্বকালেই শিল্পী

তার সঙ্কীর্ণ জাতিগত পুরাতন রীতির কবলমুক্ত হন, যাতে যুগের হৃদয় মনের উপযোগী মহত্তর কোন রীতির তিনি অনুবর্তী হোতে পারেন। মহত্তম শিল্প সব সময়েই আধ্যাত্মিক গভীরতায়, বৌদ্ধিক এবং হৃদয়াবেগের স্ফূর্তিতে পূর্ণ। সুতরাং এর জন্য গভীরতম ও অতি নিপুণ শিক্ষার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি যুগের সমগ্র সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপ্রবেশ করেনি, তার পক্ষে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি দেওয়া কঠিন। যে ব্যক্তি তার স্ব-সমাজের সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ নয়, সে তার চারপাশের সকল মানুষের গোপন আশার অন্তর্নিহিত ভাষাকে কখন রূপ দিতে পারবে না।

সমাজ-জীবনে প্রত্যেক মহান্ যুগে একটি চিন্তাই সর্বশ্রেণীর মনে অনুস্যূত হয়। সর্বত্র বিরাজ করে এক মন, এক আত্মা। আদর্শের এই একতা, প্রবল তরঙ্গ প্রবাহ নিভৃতে ঘরের কোণে আপন সাধনায় মগ্ন নিঃসঙ্গ শিল্পীকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে, যতক্ষণ না তার মধ্য দিয়ে জাতীয় ভাবাবেগ ধ্বনিত হয়। এই সত্যই এলিফ্যান্টা গুহায় খোদিত এবং অজন্তার অঙ্কিত চিত্রগুলিকে মহৎ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

ভাষা নিজের জন্য উল্লেখযোগ্য হয় না, তার অন্তরালবর্তী শক্তির জন্যই হয়, যা শব্দের ভিতব দিয়ে প্রকাশ পায়। শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ভারতে শিল্পের নবজন্ম ঘটতে পারে যদি শিল্পকে সচেতনভাবে জাতীয়তার সুমহান্ স্বপ্ন উপলব্ধির সেবক ও কবি করে তোলা যায়। সেই কারণে 'আর্ট' পদবাচ্য হোতে পারে এমন কিছু আজকের ইংলণ্ডে নেই বললেই চলে। সাম্রাজ্যবাদী জাতির সংগ্রাম করার মতো কিছু নেই। কোন উচ্চতর আদর্শের জন্য সংগ্রাম ব্যতীত বড় প্রতিভা জন্ম নেয় না, মহান্ কাব্য রূপ পরিগ্রহ করে না। সেজন্য সাম্রাজ্য প্রসারের কালে জাতির শিল্প-কলার অধোগতি অনিবার্য। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনা বিপরীত। আজ আমাদের সকল ক্ষেত্রে সংগ্রাম প্রয়োজন—সংগ্রাম করতে হবে

আমাদের চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য। তাকে সর্বত্র বহন করে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য—যার ফলে আমরা এক নামে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারি, আবার যখন এই কাজ সুসম্পন্ন হবে, তখন পুনরায় সেই চিন্তাগুলিকে নিজেদের এবং অপরের নিকট বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

মা কালীর কাহিনী

খুকুমণি, তোমার ছেলেবেলাকার সবচেয়ে আগেকার কোন্ কথাটি মনে পড়ে ? মায়ের কোলে শুয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে, —সেই কথাটি নয় কি ?

তুমি কি মায়ের সঙ্গে কখনও লুকোচুবি খেলেছ ? মা চোখ বন্ধ করতেন, তুমি তাঁর চোখেব আড়ালে চলে যেতে। আবার যেই চোখ খুলতেন অমনি দেখতেন তাঁর খুকীকে ! তারপর তুমি চোখ ঢেকে রাখতে—'কোথায় মা ?' আবার চোখ চাইতে—'এই তো !'

মা যে সময় চোখ বন্ধ করতেন সেই সময় তুমি তাঁর চোখ হু'টি দেখতে পেতে না। তখনও কিন্তু তিনি তোমার কাছেই ছিলেন।

খুকু, কেউ কেউ ভাবেন ঈশ্বব ঠিক এই রকম। তাঁবা বলেন একজন মা আছেন, তিনি এতো বড় যে এই বিবাট ব্রহ্মাণ্ডটা তাঁর সন্তান। ঈশ্বর তাঁর চোখ বন্ধ বেখে সন্তানের সঙ্গে খেলা কবছেন। আর সমস্ত জীবন ধরে আমরা এই বিশ্ব-জননীকে চোখ মেলাবার চেষ্টা করছি। যদি কেউ তাঁর চাহনি শুধু একবার এক ঝলক দেখতে পায়, তবে জান কি হয় ? সে সেই মুহূর্তেই সমস্ত রহস্য বুঝে ফেলে। তার মন জ্ঞানে, শক্তিতে আর প্রেমে ভরে ওঠে। আর সেই মুহূর্তটুকু সে কখনও ভোলে না।

তুমি যখন খেলাতে এই ভাবে জিততে পারবে আর মাকে তাকিয়ে থাকতে দেখবে, তখন আবার আর এক রকম মজা হবে। তাঁর অন্য সন্তানরা তোমাব সঙ্গে খেলা স্থরু করে দেবে। ছোট্ট ছোট্ট পাখীরা, ভেড়ার বাচ্চারা, খরগোশরা, গরীব ছেলেমেয়েরা— সবাই তোমার কোল ঘেঁষে আসবে তোমার সঙ্গী হোতে। আমাদের এই বিশ্বের মা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন তাঁর অনাথ ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের। বোধ হয় বেচারীদের মা-বাবা, ঘর-বাড়ি কিচ্ছুই

নেই বলে। তারা তোমাকে বিশ্বাস করে—তোমার জন্যে তাদের কাছে জায়গা করে রাখে। আমরা সবাই মায়ের কোলে বসে আছি কিন্তু এরা মাকে আরও গভীর ভাবে পেয়েছে।

মায়ের চোখ যখন বন্ধ থাকে তখন আমরা তাঁকে কি বলে ডাকি, বল দেখি? তাঁকে আমরা মা কালী বলি।

তুমি কি কখনও অল্পক্ষণের জন্যেও অসুখী হওনি? তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না খুশী হয়েছ তোমার মা, মাসী কিংবা তোমার খুড়ী, জেঠী কিংবা আর কেউ কি তোমায় কোলে তুলে নিয়ে তোমাকে ভোলাননি, আদর করেননি?

ঈশ্বরও অনেক সময় এই রকম করেন। পাছে তিনি চোখ না খোলেন এই ভয়ে আমরা খেলতে চাই না। তিনি আমাদের দিকে না চাইলে আমরা যেন তাঁকে হারিয়ে ফেলি, যেন অনেক দূরে চলে যাই,—আমাদের বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়, সন্ধ্যা হোয়ে যায়, মা তবুও চোখ খোলেন না। আমরা ভয়ে কেঁদে উঠি। এক একবার মনে হয় আর খেলব না।

মা কিন্তু সত্যি সত্যি চোখ বন্ধ রাখেন না। চারদিক অন্ধকার থাকে বলেই আমাদের তাই মনে হয়। যে মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে—তাঁর সুন্দর করুণাভরা চোখ তিনি তোমার দিকে মেলবেন। সেই দেখে তুমি খেলা ফেলে 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বুকে তোমার ছোট্ট মুখখানি লুকোবে এবং তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাবে।

আচ্ছা খুকুরাণী, কালী-মা যে বিশ্বব্যাপী এ কথা কি তুমি মনে রাখবে না? তুমি তাঁর চাহনি দেখতে পাওনা বলে তিনি অনেক দূরে আছেন ভাবো। মা আমাদের কাছ থেকে চলে গেলে আর তাঁকে দেখতে পাইনে। কিন্তু কালী-মা সব সময় তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে তাঁর স্নেহ-সিক্ত হৃদয় নিয়ে উপস্থিত আছেন।

তুমি কি কখনও খেলা বন্ধ করে একটি বারের জন্যেও তাঁর কাছে জোড় হাত করে বলবে না, 'মা কালী, একবার আমার দিকে তাকাও।'

মহাজননী আর এক রকম লুকোচুরি খেলেন। এটা অনেকটা রূপকথার মতো। তিনি কখনও মানুষের ভেতর লুকিয়ে পড়েন। তিনি সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন। যে কোনও দিন তোমার নিজের মায়ের মধ্যে তুমি তাঁকে দেখতে পার। অথবা কোনও দিন হয়তো আহত পাখীর বাচ্চার ভেতর বা মুরগীর ছানার সঙ্গে খেলতে খেলতে তাদের ভেতরে তুমি মাকে দেখে ফেলবে। এই রকম কতো ভাবে তিনি লুকোচুরি খেলছেন।

যখন কারু কিছু করবার দরকার হয়, তখন মা কালী আমাদের খেলতে ডাকেন। তিনি একবার নিজের মুখে বলেছিলেন (তিনি একজন লোকের ভিতর লুকিয়েছিলেন এবং সেই লোকটি তাঁর হোয়ে বলেছিলেন), 'আমার প্রিয় খোকা-খুকুরা, যতটুকু তোমরা সামান্য দীনহীনের জন্য করেছ, সেটুকু তো আমারই জন্য তোমরা করেছ।' এটা কি রূপকথার মতো শোনাচ্ছে না ? কি সব অদ্ভুত জায়গাতেই মা লুকোতে পারেন! আর একবার তিনি বলেছিলেন 'পাথরটি তোল, সেখানে আমাকে পাবে। কাঠ কাট, তার মাঝেও আমি আছি।' তুমি কি কখনও পাথর তুলে বা কাঠ কেটে দেখতে চেষ্টা করেছ, তার মধ্যে কি আছে ? তুমি কি কখনও ভেবেছ যে সমস্ত জিনিষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন ? কি সুন্দর খেলা কালী খেলেন ! সবের মাঝেই তাঁকে পাওয়া যায়।

মা যখন লুকিয়ে থাকেন তখন কি তিনি তাঁর খুকুকে স্নেহ করেন না ? অবশ্য করেন। নইলে কেন তিনি লুকোবেন ? এমন কি যখন অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর চোখ ঢাকা থাকে তখনও কি তিনি খুকুমণিকে ভালবাসেন না ? নিশ্চয়…। ভালবাসেন। দেখো না তিনি যে সব সময় হাসেন।

কালী-মাও ঠিক এই রকম। তাঁর চোখ অনেকক্ষণ বন্ধ রাখলেও আমাদের ভয়ের কারণ নেই। তিনি সদা হাস্যময়ী। তাঁর সময় মতো তিনি এই খেলা সাঙ্গ করবেন, তখন আমরা তাঁর দিকে চাইবো এবং ইহজগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যাবো—অসীমের আর এক প্রান্তে।

তাই তো, ডাক পড়লেই আমরা ছুটে যাবো। মা তাঁকে খোঁজবার জন্য সদাই আমাদের ডাকছেন। কেউ তোমার কাছে সাহায্য চাইলে বুঝবে 'মা'-ই বলছেন—'টুকি টুক্'। অথবা তোমার কোনও স্নেহপ্রার্থীর ভেতর দেখবে কালী বলছেন, 'এই যে আমি।' আরও কত কি আছে। তুমি মা, বাবা, মাসীমা এ-কে ও-কে, নিশ্চয় ভালবাস। কারণ তাঁরা তোমাকে কত যত্ন করেন, কত আদর করেন।

কিন্তু বহু দূরে মায়ের একটি ভাই আছেন। তিনি অনেক বড়। তুমি তাঁকে পছন্দ কবো কি ? কেন করবে? তাঁকে তুমি কখনও দেখনি। তিনি কোনদিন তোমার সঙ্গে খেলতে আসেননি। তবে মা যে তাঁকে ভালবাসেন। আর তোমরা সকলে মাকে ভালবাস। তাই নয় কি ? সেইজন্যে কালী যাদের ভালবাসেন আমরাও তাদের ভালবাসি। তিনি শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন। ছোট ভেড়া, মস্ত গাছ, এইটুকু মাছ—এই সমস্তই তিনি ভালবাসেন। আর তাঁর প্রিয়—আকাশের তারাগুলি। আমরাও তাই। তিনি আমাদের মা, সেই জন্যে তাঁর প্রিয়দের আমরা ভাল না বেসে পারি না।

বুদ্ধ-যশোধরা

উত্তর ভারতের একপ্রান্তে কপিলাবস্তু নামক নগর ছিল। দেশের রাজা সেখানে বাস করিতেন। ২৫০০ বৎসরেরও আগে একদা নগর ও রাজপ্রাসাদ আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল—কারণ রাজকুমার গৌতম সেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যাহারা রাজার নিকট সুসংবাদ প্রথমে আনিল তাহাদিগকে রাজা প্রথানুযায়ী যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। রাজভৃত্য ও পরিচারকবৃন্দ সকলেই পুবস্কাবের ভাগ পাইল। দান-দক্ষিণার পালা শেষ করিয়া রাজা একটি নিভৃত কক্ষে ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে কয়েকজন পণ্ডিত খড়ি পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। উঁহারা গভীর মনোযোগের সহিত অঙ্ক কষিতেছিলেন এবং অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিতেছিলেন।

তোমরা হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেছ, এ আবার কি? পণ্ডিতেরা কি করিতেছিলেন? রাজকুমারের জন্মকালে আকাশের কোন্ গ্রহ কোথায় ছিল পণ্ডিতেরা তাহাই গুণিতেছিলেন। আর গ্রহগুলির অবস্থান হইতে তাঁহারা জাতকের ভবিষ্যৎ জীবনও গুণিয়া বাহির করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে ইহা একটি খুব প্রাচীন প্রথা। গ্রহসংস্থান বিচার করিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে কাগজ গণকঠাকুর লিখিয়া দেন তাহার নাম ঠিকুজি। এমন হিন্দু পরিবারের কথাও আমি জানি যেখানে ১৩০০ বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের নাম এবং ঠিকুজি সযত্নে রক্ষিত আছে।

রাজকুমাবের ঠিকুজি তৈয়ার করিতে পণ্ডিতেরা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগাইলেন। জাতকের ভবিষ্যৎ এরূপ অদ্ভুত ও অসাধারণ বলিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বারংবার গণনার নির্ভুলতা পরীক্ষা না করিয়া এবং নিজেদের মধ্যে একমত না হইয়া তাঁহারা রাজার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেছিলেন

না। অবশেষে যখন নিঃসন্দেহ ও একমত হইলেন তখন তাঁহারা রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জাতকের ফাঁড়া-টাড়া নাই তো?' জ্যোতিষীদের মধ্যে যিনি বর্ষীয়ান্ ছিলেন তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ, জাতক দীর্ঘজীবী হবে।'

রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'সুসংবাদ বটে!' শিশু বাঁচিবে কিনা এই বিষয়েই রাজার মনে বিশেষ শঙ্কা ছিল। ইহার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য বিষয় ধীরে সুস্থে শুনিলেও আপত্তি ছিল না। বৃদ্ধ পণ্ডিত আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করিযা নিজের কথা শেষ করিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন, 'জাতক দীর্ঘজীবী হবে; কিন্তু যদি আমাদের গণনা নির্ভুল হোয়ে থাকে, তবে অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে কুমারের জননী সম্রাজ্ঞী মায়াদেবী পরলোক গমন করবেন। হে রাজন্, যদি এরূপ ঘটে তবে আপনি জানবেন যে, এই কুমার হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হবেন, নতুবা মানবের দুঃখে দুঃখিত হোয়ে সংসারত্যাগপূর্বক নূতন ধর্ম প্রচাব করবেন।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত রাজার হাতে গণনার কাগজপত্র তুলিয়া দিলেন এবং সঙ্গীদের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

একলা ঘরে বসিয়া রাজা চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁহার কানে এই কথাগুলি বাজিতে লাগিল, 'রাণী পরলোক গমন করবেন, —সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি,—ধর্মসংস্থাপক।' সপ্তাহকাল পরে যে ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিবে, তাহা অতি নিদারুণ সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতিষীর শেষ কথাগুলি রাজার মনে যে চিত্র জাগাইয়া তুলিল তাহা ছিল আরও নিদারুণ। 'ধর্মপ্রচারক',—সে তো সন্ন্যাসী,—ফকীর!! ভাবিতেই রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। আচ্ছা দাঁড়াও! পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 'মানবের দুঃখে দুঃখিত হোয়ে সংসার ত্যাগ করবেন।' গৌতম যদি কখন মানবের দুঃখ না দেখেন

তবে হয়তো ভবিতব্যের খণ্ডন হইতে পারে। রাজা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কুমারকে কখন মানুষের দুঃখদুর্দশার সহিত পরিচিত হইতে দিবেন না। তাহা হইলে সন্ন্যাসী না হইয়া কুমার দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইবেন—রাজারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

পণ্ডিতগণের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করিয়া মায়াদেবীর আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সপ্তাহকাল ধরিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা, যত্ন ও চিকিৎসার জন্য মানুষের পক্ষে যাহা সাধ্য তাহা সমস্তই করা হইল; কিন্তু কোন ফল হইল না। সপ্তম দিবসে বোধ হইল যেন তিনি শিশুর ন্যায় নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছেন। সেই নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

একে রাণীর বিরহে রাজা কাতর, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে চাপিয়া বসিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমটুকু যখন ফলিয়াছে বাকীটুকুও ফলিবে। তাঁহার এখন শুধু এই এক ভাবনা—কিসে গৌতম সন্ন্যাসী না হইয়া রাজরাজেশ্বর হইতে পারেন। যখন দুই সম্ভাবনাই আছে তখন চেষ্টা করিয়া সন্ন্যাসের সম্ভাবনাকে দূর করিতেই হইবে।

* * * *

শশিকলার ন্যায় গৌতম বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার লালনপালন করিত তাহাদের সকলের মনেই এই ধারণা জন্মিল যে, ইনি কালে অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। শিশু গৌতমের মুখ সর্বদাই হাসি-ভরা ও প্রতিভায় উজ্জ্বল ছিল। কি লেখাপড়া, কি খেলাধূলা সকল বিষয় তিনি নিমেষে আয়ত্ত করিতেন। সর্বোপরি ছিল তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও অসীম কারুণ্য। তাঁহার দৃষ্টিতে যাদু ছিল; একবার তাঁহার চোখে চোখ পড়িলে আকৃষ্ট না হইয়া উপায় ছিল না। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; কেহ তাঁহার সহিত ঝগড়া বাধাইতে পারিত না। লোকে বলিত তাঁহার মধ্যে কেবলি প্রেম ও করুণা; রেষারেষি ও দ্বন্দ্বের স্থান নাই।

একটি ডানা-ভাঙ্গা পাখীকে তিনি অশেষ যত্নে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন। কপিলাবস্তুর অন্যান্য রাজকুমার ও অভিজাত বালকদের ন্যায় তিনি কখনও মূক পশুপক্ষীর উপর তীর ছুঁড়িতেন না। তিনি বলিতেন —এরাও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, এরা আমাদের ছোট ভাই, ইহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ উপভোগ করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। তীরের ঘায়ে যে ব্যথা হয় সেকথা গৌতম বালককালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু জগতের অন্য কোন দুঃখের সহিত তাঁহার তখনও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার বাড়ি ছিল একটি প্রাসাদ। উহার চারিদিকে ছিল অনেক মাইল ব্যাপিয়া মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের সীমা ছাড়াইয়া বালক গৌতম কখনও বাহিরে যান নাই। বাগানের ভিতরে তিনি খুশিমত ঘোড়ায় চড়িতেন কিংবা তীর-ছোঁড়া অভ্যাস করিতেন; কখন বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কত কি ভাবিতেন। বাগান-বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে কোনরূপ দুঃখ-দুর্দশার চিহ্ন ছিল না;—অন্ততঃ গৌতমের পক্ষে ছিল না, কারণ দুঃখ কাহাকে বলে তাহা তিনি তখনও জানিতেন না। সেই উদ্যান-বাটিকা ছিল শিশুর পক্ষে একটি রাজ্যবিশেষ; উহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা বালক গৌতমের মনে কখনও জাগে নাই। রাজার হুকুম ছিল গৌতমের কানের কাছে কেহ দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক-মৃত্যুর নামোল্লেখ করিতে পারিবে না। এসব ব্যাপার যে পৃথিবীতে আছে তাহা গৌতম একেবারেই জানিতেন না। 'মানবের দুঃখে দুঃখিত হোয়ে—'জ্যোতিষীর এই কথাগুলি রাজার কানে সর্বদাই বাজিত। তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল যাহাতে মানবের দুঃখের সহিত গৌতমের কখনও পরিচয় না ঘটে।

প্রাচীন ভারতে ইহাই নিয়ম ছিল যে, ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যুবকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবে। তার পর তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারে। অতএব ত্রিশ বছর বয়সে গৌতম যদি

ইচ্ছা করিতেন যে, তিনি বিদেশে যাইবেন তবে কেহই তাঁহাকে বাধ দিতে পারিত না। ত্রিশ বছর যাহার বয়স সে প্রাপ্তবয়স্ক;—রাজারও অধিকার ছিল না তাহাকে আটকাইয়া রাখেন। এই বয়সে কুমারকে কিরূপে সামলানো যায় তাহার জন্যও ফন্দি আঁটা হইল। কুমাবকে তো ব্যথা দেওয়া যায় না; অতএব যুক্তি স্থির হইল ফুলের বাঁধনে তাঁহাকে বাঁধিতে হইবে। গৌতমকে বলা হইল তাঁহার বিবাহ-যোগ্য বয়স হইয়াছে;—তাঁহার উচিত এখন বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করা। রাজা ভাবিলেন কোনরকম ভাবে আরও কিছুদিন গেলেই ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। একবার পত্নী ও পুত্রকন্যাব মায়াপাশে বাঁধা পড়িলে গৌতম সাংসারিক সুখভোগ ও উন্নতির দিকেই মন দিবেন, সংসারত্যাগের বাসনা আর তাঁহার চিত্তে স্থান পাইবে না। গৌতম তখন ধনসঞ্চয় ও রাজ্যবিস্তার কবিতেই ইচ্ছুক হইবেন। জ্যোতিষীর গণনানুযায়ী গৌতম তাহা হইলে সন্ন্যাসী না সাজিয়া দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইবেন।

বিবাহের প্রস্তাবে গৌতম রাজী হইলেন; কিন্তু একটা শর্ত করিলেন যে, পাত্রী তিনি নিজে মনোনীত করিবেন। অভিজাত-বংশীয় যুবকদের মধ্যে যাহাদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী ছিল তাহাদের ভগিনীগণসহ সকলকেই রাজপ্রাসাদে সপ্তাহ-কাল কাটাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। প্রাসাদে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে যুবকদের মল্লক্রীড়া; বিকালে অন্যান্য খেলা, ম্যাজিক ও সাপ-নাচানো প্রভৃতি। সকলে মিলিয়া সারাক্ষণ কেবলি আমোদ-প্রমোদের ধুম।

সমাগতা পাত্রীদের মধ্যে যশোধরা নাম্নী কুমারী ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের তুলনা ছিল না; বংশমর্যাদারও ত্রুটি ছিল না। রাজা, মন্ত্রিমণ্ডল ও পারিষদ্বর্গ সকলেরই মনে মনে ইচ্ছা—কুমার যেন যশোধরাকেই বধূত্বে বরণ করেন।

সপ্তাহান্তে বিদায়ের পালা আসিল। রাজকুমার দরজার কাছে

দাঁড়াইয়া অতিথিগণকে একে একে বিদায় দিতে লাগিলেন। কুমারীদিগকে ভাল ভাল উপহাব দেওয়া হইল—কাহাকেও হার, কাহাকেও চুড়ি, কাহাকেও মণিবত্ন ইত্যাদি। যশোধবা যখন বিদায় লইলেন তখন গৌতম তাঁহাকে কোন বহুমূল্য উপহার দিলেন না;—শুধু একটি ফুল নিজেব গলার মালা হইতে খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। এই বাহ্য অবহেলাতে দর্শকেরা ভাবিলেন গৌতম অন্য কাহাকেও পছন্দ করিয়াছেন; এবং মনে মনে তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কুমারী ভুল করিলেন না। তিনি ঠিক বুঝিলেন যে, এই ফুল হীবা, মানিক অপেক্ষা অনেক বেশি দামী। পরদিন প্রাতে যখন রাজা শুদ্ধোধন যশোধরার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন তখন যশোধরা মোটেই বিস্মিতা হইলেন না। তিনি বরং ইহা ভাবিয়াই বিস্মিতা হইলেন যে, ব্যাপাবটা এত সহজে নিষ্পন্ন হইয়া গেল! তিনি যে গৌতমের পূর্ব পূর্ব জন্মের সঙ্গিনী এইভাব হয়তো তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু যশোধরার পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। ক্ষত্রিয়ের আচার অনুযায়ী গৌতমের ইহা কর্তব্য ছিল যে, অন্যান্য প্রার্থীদের অপেক্ষা শৌর্যবীর্যে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এরূপ না কবিলে সম্মানের হানি হয়। যশোধরার পিতা রাজার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন; কিন্তু বলিলেন যে, গৌতমকে নিজ বীরত্বের ও গুণের যথাবিহিত পরিচয় দিয়া তৎপরে যশোধরার পাণি-গ্রহণ করিতে হইবে।

উত্তর শুনিয়া গৌতম খুব আহ্লাদিত হইলেন এবং অন্যান্য প্রার্থীদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মল্লক্রীড়ার দিনও ঠিক করিয়া দিলেন। গৌতমেব আত্মীয়-স্বজনেরা ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, 'হায়! কি প্রমাদ ঘটল! তুমি তো বাপু জন্মে একটা উড়ন্ত পাখী কিংবা একটা দৌড়ন্ত হরিণও

শিকার করনি; এখন ক্রীড়াভূমিতে কি করে ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় বেগবান্ বুনো শুয়ারকে বধ করবে? আর বড় বড় ধনুর্ধরের সঙ্গে তীর-ধনুর খেলাতেই বা তুমি কি এঁটে উঠতে পারবে?' এ সকল প্রশ্নের উত্তরে গৌতম কেবল মৃদু হাসিলেন। ভয় কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তখন তাঁহার মনে হইতেছিল যেন তাঁহার ভিতরে অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলিয়া গিয়াছে। যখন মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন সকলে বুঝিল যে, গৌতমের আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ সঙ্গত ছিল। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া গৌতম একে একে সবগুলি পুবস্কার হস্তগত করিলেন।

এইরূপে রাজকুমার গৌতমের সহিত যশোধরার পরিণয় সম্পন্ন হইল।

নবদম্পতীর জন্য নূতন সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হইল। স্রোতস্বতীর ধারে গোলাপী রঙের পাথর দিয়া একটি বাড়ি তৈয়ার হইল। তাহার বড় বড় খিলান এবং অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত নানাবিধ কাঠের সাজের তুলনা হয় না। উদ্যানের এক প্রান্তে খরস্রোতা তটিনী একটি শ্বেত মর্মরের দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দ্বীপের উপরে গ্রীষ্মকালীন প্রমোদভবন নির্মিত হইল। প্রমোদভবনকে স্নিগ্ধ সুশীতল করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি রহিল না। বাড়িটির চারিদিকে নদীগর্ভে অসংখ্য ফোয়ারা রচিত হইয়াছিল—যেগুলি ইচ্ছামত খুলিয়া দেওয়া যাইত। সমস্ত বাতায়নে পাথর অথবা কাঠের জালি লাগানো হইল যাহাতে রৌদ্র ভিতরে প্রবেশ না করে, আব্রু রক্ষা হয়, অথচ ভিতর হইতে বাহিরের সব কিছু অনায়াসে দেখা যায়। গ্রীষ্মাবাসের চারিদিকে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত মনোরম উদ্যান—অসংখ্য প্রকার ফুল ও ফলের গাছে ভর্তি। প্রাসাদের ভিতরে প্রতি হলঘরের পাশে দুজন বসিবার মতো দোলনা টাঙানো ছিল। গরমের দিনে দোলনায় বসিয়া দোল খাইলে সুস্নিগ্ধ বাতাস দেহকে শীতল করিত

—অথবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে দাসদাসীরা চামর-বীজন করিত। রাজপুত্র ও রাজবধূর জন্য সুশ্রী ও হাসিমুখ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া দাসদাসী নিযুক্ত করা হইত। এক জন মন্ত্রীর উপর এই বাছাইয়ের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

সমস্ত বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হইয়াছিল যেন রাজকুমার কখন কাহারও চোখে জল না দেখেন—তাঁহার কানে যেন কোন বেদনার ধ্বনি প্রবেশ না করে। কোন প্রকার রোগ, শোক কিংবা মৃত্যুর দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়া নিষিদ্ধ ছিল। গৌতম কখন নগরে যাইতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে যেন ভুলাইবার চেষ্টা করা হয়—ইহাই ছিল রাজার স্পষ্ট আদেশ।

কিন্তু নিয়তি কাহারও বাধ্য নহে। রাজা মোটেই ভাবেন নাই যে, যখন গৌতমের বৈরাগ্যের সময় আসিবে তখন এই সকল বিধি-নিষেধ তাঁহার মুক্তির বাসনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে। তিনি যে ভাবে গৌতমকে রাখিয়াছিলেন তাহাকে 'জীবন' বলা যায় না—উহা ছিল একটা খেলা কিংবা স্বপ্ন। খেলা এবং স্বপ্ন যতই মধুর হউক, উহা মিথ্যা—উহাতে মানুষের তৃপ্তি হইতে পারে না। মিথ্যার জাল ভেদ করিয়া সত্যকে পাইবার তীব্র বাসনা একদিন-না-একদিন গৌতমের মনে না জাগিয়া গত্যন্তর ছিল না।

অবশেষে তাহাই হইল। সহসা গৌতম একদিন সারথিকে রথ প্রস্তুত করিবার জন্য হুকুম দিলেন এবং বলিলেন তাঁহাকে প্রাচীরের বাহিরে কপিলাবস্তু নগর দেখাইয়া আনিতে হইবে। মূঢ় সারথি আজ্ঞা পালন করিল; আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। রাজা শুনিলে কিরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা ভাবিয়া সারথি মনে মনে প্রমাদ গণিল।

রথ নগরে প্রবেশ করিলে গৌতম চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সত্যিকার মানবজীবনের সহিত এই তাঁহার প্রথম

পরিচয়। তিনি দেখিলেন রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই শিশুরা খেলিতেছে। বাজারের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকানে দোকানীরা পসার খুলিয়া বসিয়াছে এবং খরিদ্দারদের সঙ্গে দর কষাকষি করিতেছে। জহুরী, কুমোর, কাঁসারী প্রভৃতি যা'র যা'র দোকানে বসিয়া কাজ করিতেছে। কোন শিক্ষানবিশ হয়তো হাপরে ফুঁ দিয়া আগুন তাতাইতেছে—যাহাতে ধাতু সহজে গলিয়া যায়। কুমোরের দোকানে অপর শিক্ষানবিশ হয়তো চাকা ঘুরাইতেছে। মুটেরা ভারী ভারী মোট লইয়া যাওয়া-আসা করিতেছে,—তাহাদের চেহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত। কচিৎ কখন কোন সাধু রাস্তা দিয়া যাইতেছেন—হাতে দীর্ঘ দণ্ড, সর্বাঙ্গ ভস্মে সাদা! হ্যাংলা কুকুরেরা রাস্তার উপরেই খাদ্যদ্রব্যের টুকরা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে—হয়তো গ্রামদেশ হইতে শস্য, ফল ও শাকসবজিতে বোঝাই গরুর গাড়ি তাহাদের উপরেই আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেদিকে কুকুরগুলির ভ্রূক্ষেপ নাই।

দু'চার জন বৃদ্ধ ব্যতীত রাস্তাতে স্ত্রীলোক বড় দেখা যাইতেছিল না; কারণ তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল হইয়াছে, মেয়েরা প্রাতঃস্নান সারিয়া তার আগেই বাড়ি গিয়াছেন। কচিৎ দু'একটি বালিকা দেখা যাইতেছিল; হয়তো কোন কারণে দেরী হইয়া গিয়াছে, মুখ ঘোমটাতে ঢাকা, মাথায় জলের কলসী লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

কর্মব্যস্ততাব মধ্যেও রাস্তাঘাটে সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। ভারতবর্ষে পুরুষেবা শাল কিংবা চাদর কাঁধে ঝুলাইয়া পরে। কাহারও চাদর কার্পাসের, কাহারও রেশমের, কাহারও পশমের—কাহারও নীল, কাহারও হলদে, কাহারও বেগুনি ইত্যাদি। মেয়েদের মৃদু পদনিক্কণের অভাবেও রাস্তা একেবারে সৌন্দর্যহীন হয় না; কারণ পুরুষের পোশাকেও বিচিত্র রঙের খেলা আছে এবং তাহারা সদা হাস্যময় ও মুখর। নগর দেখিতে দেখিতে

গৌতম সারথিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্রম, দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা। কিন্তু এগুলিব সঙ্গে এত সৌন্দর্য্য, এত প্রেম, এত আনন্দ জড়িয়ে আছে যে দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও জীবন বস্তুতঃ মধুর বলেই মনে হয়।'

তিনি অত্যন্ত ভাবুকতা ও হৃদয়াবেগেব সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানবেব ত্রিবিধ দুঃখ—জরা, রোগ ও মৃত্যু—মূর্তি ধরিয়া তাঁহাব সম্মুখে দেখা দিল। গৌতমেব জীবনেব মহাসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হইল।

প্রথমে আসিল জরা। একজন অতি বৃদ্ধ অথর্ব ব্যক্তি আসিয়া গৌতমের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মাথায় একগাছিও চুল নাই, মাঢ়িতে একটিও দাঁত নাই, হাত কেবলি কাঁপিতেছে। তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই;—চোখের জ্যোতিঃও বুঝি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার কান আব শুনিতে পায় না। জবা তাহাব দেহকে এতদূর বিকল ও নিষ্ক্রিয় কবিয়াছে যে, উহাকে আর আত্মার যন্ত্র বলা যায় না। তাহাব প্রাণ যেন নিরুপায়ভাবে জড়পিণ্ডেব মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। লাঠিতে ভব কবিয়া একখানি অস্থিচর্মসাব হাত সে গৌতমেব দিকে বাড়াইয়া দিল।

বাজকুমাব তাহাব দিকে ঝুঁকিযা যত ধনরত্ন হাতে উঠে তাহাকে দিলেন। বৃদ্ধ এত পাইল যে, সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। গৌতমের মনে হইল যেন তাঁহাব আত্মা বিষাদসাগবে ডুবিয়া যাইতেছে। ব্যগ্রভাবে তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'একি? একি? ছন্দক, লোকটাব কি হয়েছে?'

ছন্দক কহিল, 'কিছু নয় রাজকুমাব, লোকটা বৃদ্ধ হয়েছে—ওর অনেক বয়স হয়েছে—আব কিছুই হয় নি।' গৌতমের মনে হইল তাঁহার পিতা এবং অনেক অমাত্যও বৃদ্ধ হইয়াছেন—তাঁহাদের মাথার চুল সাদা হইয়াছে। তিনি ছন্দককে বলিলেন—'বৃদ্ধ,—সকল বৃদ্ধেবা তো দেখতে এ রকম নন।'

ছন্দক উত্তর করিল—'হাঁ রাজকুমার, বেশি বুড়ো হোলে সবাইকে এ রকম হোতে হয়।'

বিস্ময়ে এবং ভয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে কি আমার পিতা, যশোধরা এবং আমিও এ রকম···?' সারথি গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, 'রাজকুমার, মানবমাত্রেই জরার অধীন। খুব বেশী বয়স হোলে সবাইকে এই বৃদ্ধের ন্যায় হোতে হয়।'

ভয় ও দুঃখের আতিশয্যে গৌতম চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল যাইতে না যাইতেই আরও ভয়ানক দৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রথের কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল, যাহার গায়ের চামড়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তামার রঙ ধরিয়াছে। ভিক্ষার জন্য যে হাত সে বাড়াইল উহার অনেক অঙ্গুলি গলিয়া পড়িয়াছে। আমরা অনেকেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখিলে ভয়ে চোখ ঢাকিয়া সেখান হইতে পলাইতাম। কিন্তু রাজকুমারের ভয় কিংবা ঘৃণা হইল না। তাঁহার হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। অত্যন্ত স্নেহার্দ্র স্বরে তিনি তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং একটি মুদ্রা তাহার হাতে দিলেন।

গৌতমের দয়া দেখিয়া এবং মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া লোকটি বিস্ময়ে নির্বাক হইল। ছন্দক ব্যস্তভাবে কহিল, 'রাজকুমার, এ লোকটি কুষ্ঠরোগী। এখানে দাঁড়ানো উচিত নয়; আমি তাড়াতাড়ি রথ চালিয়ে যাচ্ছি।'

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকটির কি হয়েছে ছন্দক?'

'যুবরাজ, লোকটি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।'

'ব্যাধি? ব্যাধি কি, ছন্দক?'

'কুমার, ব্যাধি অথবা রোগ মানুষের শরীরকে আক্রমণ করে। কেন করে,—কিরূপে করে—আমরা তা জানি না। রোগ হোলে শরীরের সোয়াস্তি নষ্ট হয়। রুগ্নব্যক্তি প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও শীত অনুভব

করে ; আবার বরফের পাহাড়ে থেকেও গরমে ছটফট করে। কেহ বা রোগের আক্রমণে অসাড় হোয়ে ঘুমোয় ; কেহ বা ব্যাধির তাড়নে পাগলের ন্যায় অস্থির হোয়ে বেড়ায়। কোন ক্ষেত্রে ব্যাধির বিষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে গলে পড়ে—কোন ক্ষেত্রে বা শরীর কেবলি শুকোয় যে পর্যন্ত না চামড়ার থলির ভেতরে হাড়গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। আবার এমনও হয়, রোগ শরীরকে ফুলিয়ে কিম্ভুত-কিমাকার করে তোলে। এরি নাম ব্যাধি। ইহা কি করে আসে, কি করে যায় তা কেউ জানে না। কোন্ মুহূর্তে ইহা আমাদিগকে আক্রমণ করবে তা আগে থাকতে আমরা জানতে পারি না।'

'হায়! এই কি জীবন? একটু আগেও আমি ভাবছিলাম জীবন কী মধুর!' এই কথা বলিয়া গৌতম চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে ছন্দকের দিকে চাহিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, 'জীবন হোতে লোক কি করে নিস্কৃতি পায়? দুঃখের দশা হোতে কে তাদের মোচন করে?"

ছন্দক কহিল—'মৃত্যু। ঐ দেখুন কুমার, কয়েকজন লোক একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নদীতীরে গিয়ে ওটাকে পোড়াবে।'

গৌতম দেখিলেন, চারজন লোক একটা নীচু চারপাই কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। চারপাইয়ের উপর সাদা চাদর দিয়া ঢাকা একটা মানুষের আকৃতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেই আকৃতিতে কোন নড়াচড়া নাই ;—বহনকারীরা হোঁচট খাইলেও চাদরের নীচে কেহ নড়িয়া উঠে না। বাহকেরা বারংবার 'হরিবোল' বলিতেছিল। কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে এই 'হরিবোল'—সে কোন সাড়া দেয় না।

সারথি গম্ভীরভাবে বলিল, 'কিন্তু মৃত্যু যদিও জীবনের জ্বালা জুড়োয় তথাপি মৃত্যুকে মানুষ চায় না—ভালবাসে না। মৃত্যুকে

মানব বন্ধু বলে মনে করে না—বরং মনে করে উহা জরা কিংবা রোগের চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যু অতর্কিতে মানুষকে পাকড়াও করে; মানুষ উহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে;—উহার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।'

শবযাত্রা গৌতম খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল, তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন কেন মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যেন পর পর অনেক চিত্রপট চলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, যে মৃতলোকটি তাঁহার সামনে দিয়া চলিয়া গেল সে আরো অনেক জন্ম পার হইয়াছে—অনেকবার সে জন্মিয়াছে এবং মরিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, এবারকার মৃত্যুর পরেও সে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে আসিবে। 'জন্মিলে মরিতে হয়, মরিলে জনম।' তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ছন্দক, বুঝলাম—সংসার-চক্র কেবলি ঘুরছে; জীবনের আদি-অন্ত নেই। তাড়াতাড়ি ঘরে চল।'

সারথি রথ ঘরের দিকে ফিরাইল। গৌতম আর কিছু বলিলেন না। তিনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। প্রাসাদে ফিরিয়া গৌতম নূতন দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে লাগিলেন। আগে যাহা তাঁহার নিকট সুন্দর ও উপভোগ্য ছিল তাহা এখন ঘৃণার বস্তু হইল। সবুজ ঘাসের গালিচা, মনোরম পুষ্পোদ্যান, কলনাদিনী স্রোতস্বতী—সকলি মনে হইল ছেলে-ভুলানো খেলনা;—এগুলি এতদিন তাঁহার নিকট হইতে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গৌতমের মনে হইল, তিনি এবং যশোধরা এতদিন যে উদ্যানে শিশুর ন্যায় খেলা করিয়াছেন তাহার নীচে ভয়ানক আগ্নেয়গিরি। যে কোন মুহূর্তে তাঁহাদের খেলাঘর অগ্ন্যুদ্গারে ধ্বংস হইতে পারে। এই সম্ভাবনা শুধু তাঁহাদের দুজনের জন্যই নহে; সকলের জন্যই এই বিপদ—সংসারে কাহারও ভোগে মত্ত হইবার হেতু নাই।

সমস্ত মানবজাতির জন্য—আর শুধু মানব কেন—সমস্ত জীবের

জন্য গৌতমের হৃদয় করুণায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'জীবন ও মৃত্যু একটা দুঃস্বপ্ন। কিরূপে আমরা এদের হাত এড়িয়ে মোহনিদ্রা হোতে জাগতে পারি?'

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া মানবের ত্রিবিধ দুঃখ গৌতমকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার আহার নিদ্রা সমস্ত দূরে গেল।

গভীর নিশীথে যখন সমস্ত রাজপুরী নিদ্রামগ্ন তখন গৌতম শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ঘরের ভিতবে পায়চারি কবিতে লাগিলেন। একটি বাতায়ন খুলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। গাছেব সারির ভিতব দিয়া মর্মর শব্দে বাতাস বহিয়া গেল—মনে হইল যেন পৃথিবী শিহরিয়া উঠিল। বস্তুতঃ উহা ছিল বিশ্বের সমস্ত আত্মার আকুল ক্রন্দন। তাহারা বলিতেছিল, 'হে গৌতম, জাগ। তুমি জ্ঞানী, তুমি বুদ্ধ। ওঠ, জগৎকে উদ্ধাব কর।' রাজকুমার সেই আকুল বাণী অবশ্যই শুনিলেন এবং বুঝিলেন। বাহিরে নিস্তব্ধ তারকারাজির দিকে চাহিয়া তিনি মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্বজাতির সনাতন জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হইয়া উঠিল। 'কেন আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি? নিশ্চয়ই এই জ্ঞানের সন্ধানেই বহুলোক ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে যায়,—গায়ে ভস্ম মাখে। তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু সত্যের সন্ধান পায়। তা হোলে তাদের পথই আসল পথ। আমিও সেই পথ ধরেই চলব। কিন্তু এঁরা তো লোকালয়ে ফিরে এসে নিজেদের লব্ধ সত্য প্রচার করেন না। তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সত্যকে গোপন রাখেন, কিংবা শুধু দু'একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে কিছু কিছু বলেন। আমি যদি জগতের রহস্য ভেদ করতে পারি তবে তা লুকিয়ে রাখব না; ফিরে এসে সমগ্র মানবজাতির নিকট তা প্রচার করব। যেমন পণ্ডিতকে বলব—তেমনি যে হীনের চেয়েও হীন তাকেও

আমি বলব। মুক্তির পথ সমগ্র জগতের জন্য নির্বিচারে খুলে দেব।' মনে মনে এই প্রকার বলিয়া গৌতম জানালা বন্ধ করিলেন, এবং চুপি চুপি তাঁহার ঘুমন্ত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গেলেন।

অতি সন্তর্পণে তিনি পর্দা সরাইয়া যশোধরার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। তখনি যেন তাঁহার মনের ভিতরে সত্যিকার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ধর্মপত্নীকে ছাড়িয়া যাইবার কোন অধিকার তাঁহার আছে কি? হয়তো তিনি চিরতরে যাইতেছেন—আর কখন ফিরিবেন না। স্ত্রীর উপর বৈধব্য আনয়ন করা ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজ হইবে না কি? তাঁহার নবজাত পুত্রকেও পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইতে হইবে। বিশ্বের জন্য নিজকে বলি দেওয়া খুব ভাল কাজ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কী অধিকার যে তিনি স্ত্রী-পুত্রকেও বলি দেন?

গৌতম পর্দাগুলি টানিয়া দিলেন এবং আবার জানালার নিকটে গেলেন। বাহিরের দিকে তাকাইয়া তিনি যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, যশোধরা তো সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন। যশোধরার উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় তো তিনি অনেক পাইয়াছেন। গৌতমের মনে হইল, তিনি যে আত্মোৎসর্গ করিতে যাইতেছেন তাহাতে যশোধরারও ভাগ আছে। যশোধরার বিহনে গৌতমের যে দুঃখ হইবে তাহার ফলেই তিনি স্বামীর তপস্যার ও জ্ঞানের অর্ধেক ভাগ পাইবেন।

তাঁহার মনে আর কোন দ্বিধা-সংশয় রহিল না। বিদায় লইবার জন্য তিনি আবার পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গেলেন। আবার তিনি যশোধরার শান্ত মুখশ্রী অবলোকন করিলেন। পত্নীকে জাগাইতে গৌতমের সাহস হইল না; নুইয়া তিনি অতি ধীরে তাঁহার পদচুম্বন করিলেন। যশোধরা ঘুমের ঘোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিলেন; গৌতম তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

নীচের তলায় গিয়া গৌতম সারথি ছন্দককে ঠেলিয়া জাগাইলেন।

নিঃশব্দে রথ প্রস্তুত হইল। আস্তে আস্তে এবং চোরের ন্যায় রথ রাজপুরীর ফটকগুলি একে একে পার হইয়া সদর রাস্তায় পড়িতেই রথের ঘোড়া তীরবেগে ছুটিল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই রাজকুমার বহুক্রোশ দূরে গিয়া পৌঁছিলেন।

প্রভাতে রথ থামাইয়া রাজকুমার নামিলেন। তৎপরে গাত্র হইতে তিনি বহুমূল্য আভরণ সমস্তই খুলিলেন। বস্ত্র, মণি, মুক্তা প্রভৃতি পরিজনবর্গের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ছন্দকের হাতে দিয়া কোন্‌টি কাহাকে দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। গৌতম নিজে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিলেন—পরিধানে গৈরিক, গায়ে ভস্মাচ্ছাদন, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র। ছন্দক আর স্থির থাকিতে পারিল না; অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। 'পিতাকে বলো আমি আবার আসব'—এই সংক্ষিপ্ত বিদায়-বাণী বলিয়া গৌতম নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার অদৃশ্য হইবার পরেও ছন্দক যেখানে ছিল সেখানে স্থাণুর ন্যায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে একান্ত ভক্তি-ভরে সেই জায়গার ধূলি লইয়া নিজের মাথায় ধারণ করিল। তারপর নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে ছন্দক বাড়ির দিকে রথ চালাইল রাজাকে সংবাদ দিবার জন্য।

দীর্ঘ সাত বৎসর গৌতম সত্যের অনুসন্ধানে নানাস্থানে নানা ব্যক্তির নিকট গেলেন; অনেক কঠোর তপস্যা করিলেন। অবশেষে একদা রাত্রিতে যখন এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন তখন জগৎ-রহস্য তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিখিল জ্ঞান তাঁহার নিকট ধরা দিল। তখন হইতে তাঁহার পুরাতন নাম বিলুপ্ত হইল, তিনি 'বুদ্ধ' (অর্থাৎ সম্যক্-জ্ঞানী) নামেই পরিচিত হইলেন।

বুদ্ধত্বলাভের মহাক্ষণে তিনি জানিতে পারিলেন যে তৃষ্ণাই দুঃখের মূল। ভোগবাসনার তৃষ্ণাই জীবকে সংসারচক্রে আবদ্ধ

করিয়া রাখে এবং অশেষ যন্ত্রণা দেয়। তৃষ্ণা ছাড়িলেই মানব মুক্ত হইতে পারে। মুক্তির নাম তিনি দিলেন 'নির্বাণ' এবং যে পথে চলিলে মুক্তিলাভ করা যায় তাহার নাম দিলেন 'শান্তিমার্গ'।

এখন যেস্থান 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিত সেখানেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে এবং উহার পাশে আছে 'বোধিদ্রুম'। যে বৃক্ষের তলে গৌতম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বর্তমান বোধিদ্রুম তাহারই একটি শাখা হইতে জাত। বুদ্ধত্বলাভের পরেও সিদ্ধার্থ কয়েকদিন পর্যন্ত সেই স্থানেই রহিলেন, এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া প্রথমেই তিনি বারাণসীর নিকটে 'মৃগদাব' (বর্তমান 'সারনাথ') নামক স্থানে গেলেন এবং সেখানে পাঁচশত সন্ন্যাসীর সমক্ষে নিজ মত প্রচার করিলেন। তখন হইতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহার বহু শিষ্য জুটিতে লাগিল। কপিলাবস্তু-যাত্রী দুই সওদাগরের নাগাল পাইয়া গৌতম তাঁহার পিতা ও পত্নীকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অচিরে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে গৌতমের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ রাজা এবং যশোধরার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শুদ্ধোধন রাজপুরী সুসজ্জিত করিলেন এবং সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত রাখিলেন। গৌতমের আগমন-প্রতীক্ষায় নগরের সমস্ত লোক যখন রাস্তার দুইপাশে নিশান, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অশ্বারোহী সৈন্যেরা যখন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল, তখন দেখা গেল সর্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং ভিক্ষাপাত্র-করে এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। তিনি রাজার সম্মুখ দিয়া গেলেন। ইনিই তো সেই গৌতম যিনি সাত বছর আগে নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ 'বুদ্ধ' হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন!

বুদ্ধ থামিলেন না। তিনি সবাসরি রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া একেবারে নিজের কামরায় গিয়া স্ত্রীপুত্রেব সম্মুখে হাজির হইলেন। যশোধরাও গৈরিক পরিহিতা! যে প্রভাতে জাগিয়া তিনি জানিলেন, গৌতম গৃহত্যাগ করিয়াছেন সেদিন হইতেই রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিলেন। তিনি শুধু ফলমূল খাইতেন এবং ভূমিশয্যায় শুইতেন। সমস্ত অলঙ্কারপত্র তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন!

যশোধরা নতজানু হইয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন;—তাঁহার বাঁদিকের বস্ত্রখণ্ড চুম্বন করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথা-বার্তা অতি অল্পই হইল। বুদ্ধ যশোধরাকে আশীর্বাদ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। তখন যেন যশোধবা স্বপ্ন হইতে জাগিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন—'যাও বাছা, শিগ্গির যাও, তোমার পিতার নিকট থেকে তোমার উত্তরাধিকার চেয়ে নাও গে।'

মুণ্ডিত-মস্তক ও গৈবিক-পরিহিত অনেক লোক একত্র দেখিয়া বালক থতমত খাইয়াছিল। সভয়ে বলিল, 'মা, কোন্ ব্যক্তি আমার পিতা?'

যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন না, কিংবা তাহার পোশাক ও চেহারা কিছুই বর্ণনা করিলেন না। শুধু কহিলেন, 'জনতার মধ্যে যিনি সিংহতুল্য তিনিই তোমার পিতা।'

বালক তখন সোজা বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিল, 'বাবা, আমার উত্তরাধিকার কি দেবেন দিন।' বালক তিনবার একথা বলিবার পর বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিতে পারি কি?' বুদ্ধ বলিলেন, 'দাও'। আনন্দ তখন বালককে গৈরিক বসন পরাইয়া দিলেন।

তখন তাঁহারা পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন বালকের মাতাও নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা থাকিলেও

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতে চাহেন। কোমল-হৃদয় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, স্ত্রীলোকেরা কি সঙ্ঘে প্রবেশ করতে পারেন না? তাঁরাও কি আমাদের ন্যায় অধিকারী হোতে পারেন না?'

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—'এ প্রশ্ন কেন, আনন্দ? স্ত্রীলোকেরাও কি ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করেন না? তাঁরা কেন শান্তিমার্গে চলতে পারবেন না? আমার ধর্ম, আমার সঙ্ঘ সকলের জন্য। আনন্দ, তবুও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছ।'

যশোধরাও সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীর বাসস্থানের নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটিল। তিনিও শান্তিপথের যাত্রী হইলেন।

কেন ও কীভাবে আমি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করি

ইংরেজ পরিবারে আমার জন্ম এবং সেইভাবেই আমি প্রতিপালিত। অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত আমার শিক্ষাদীক্ষা ইংরেজ বালিকাদের মতোই ছিল। স্বভাবতঃই জীবনের প্রথম থেকে খৃষ্টান ধর্মের মূল নীতিগুলি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিশোরী বয়স থেকে সকল ধর্মের উপদেশের প্রতি আমি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতাম। শিশু যীশুকে ভক্তিভরে পূজা করতাম এবং তিনি স্বেচ্ছায় যে বিপুল আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তার জন্য আমার সমগ্র হৃদয় তাঁর প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ ছিল; তবুও আমার মনে হোত, মানবজাতির উদ্ধারের জন্য তিনি যে ক্রুশে বিদ্ধ হোয়ে জীবন ত্যাগ করেছিলেন, তার তুলনায় আমার ভক্তি বা পূজা যথেষ্ট নয়। অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করবার পর আমার মনে খৃষ্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। অনেক মতবাদ আমার নিকট মিথ্যা বা সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিহীন বলে মনে হোল। সংশয় ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আমার আস্থাও বিচলিত হোতে লাগল। নিজেকে অত্যন্ত অসুখী মনে হোত, তথাপি আমি একান্তভাবে সত্যান্বেষণে উৎসুক ছিলাম। গীর্জায় যাওয়া ত্যাগ করলাম; আবার সময় সময় অন্তরকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে যেতাম গীর্জায়, উপাসনায় তন্ময় হোয়ে অন্তরে শান্তি অনুভব করতে চাইতাম—যেমন ইতিপূর্বে বরাবর করে এসেছি এবং যেমন দেখতাম আমার চারপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা তখনো তাই করছেন। কিন্তু হায়! সত্যকে জানবার জন্য ব্যাকুল বিক্ষুব্ধ আমার অন্তরাত্মার জন্য সেখানে না ছিল শান্তি, না ছিল বিশ্রাম।

এই সাত বৎসর ধরে সংশয়-পীড়িত অবস্থার মধ্যে কখনো

বোম্বাই হিন্দু লেডিজ সোশ্যাল ক্লাবে ২. ১০. ০২ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা

কখনো মনে হোত, হয়তো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলন আমি যে সত্য অনুসন্ধান করছি তার সন্ধান দেবে। সুতরাং একান্ত আগ্রহের সঙ্গে বিশ্বের ও সর্ববিধ পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুশীলন করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে অন্ততঃ একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কিন্তু তার ফলে খৃষ্টধর্মের মতবাদগুলি অধিকতর সামঞ্জস্য বিহীন হোয়ে দেখা দিল। ঠিক এই সময় সহসা বুদ্ধের একখানি জীবন চরিত আমার হস্তগত হয়। ঐ জীবন চরিত পাঠ করবার পর জানলাম যে, শিশু যীশুর জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আর এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর আত্মত্যাগ কোন অংশে যীশু অপেক্ষা কম উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই প্রিয় শিশু গৌতম আমার চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে এবং আরও তিন বৎসর ধরে আমি তন্ময় হোয়ে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করি। ক্রমশঃ আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, মানবের মুক্তির জন্য বুদ্ধ-প্রচারিত বাণী খৃষ্টধর্ম প্রচারিত মুক্তিব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সত্যানুসারী।

এইবার আমার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ এল। আপনাদের বড়লাট (Viceroy) লর্ড রিপনের এক জ্ঞাতিভ্রাতা একদিন তাঁর গৃহে চা-পানের আমন্ত্রণ করলেন এবং জানালেন, ঐদিন ভারত থেকে আগত এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেতে পারি। হয়তো সেই সন্ন্যাসী সত্যান্বেষণের জন্য ব্যাকুল আমার অন্তরাত্মাকে সাহায্য করতে পারেন। সেখানে যে সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করি তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ—পরবর্তীকালে আমার গুরু। তাঁর উপদেশ আমার সংশয়ক্ষুব্ধ চিত্তকে চির-ঈপ্সিত শান্তি প্রদান করে। অবশ্য একদিন বা দুদিনের সাক্ষাতে সকল সংশয় বিদূরিত হয়নি। মোটেই না, তাঁর সঙ্গে আমার বহু অন্তরঙ্গ আলোচনা হয় ও দীর্ঘ একবছরের উপর আমি তাঁর উপদেশ অনুধ্যান করি। তার পর তিনি আমাকে ভারতবর্ষে গমন করতে বলেন, উদ্দেশ্য যোগিগণের

দর্শনলাভ এবং যোগবিষয়টির স্বীয় উৎপত্তি স্থলে ও যথার্থ পরিবেশের মধ্যে অধ্যয়ন। অবশেষে আমি সেই ধর্মবিশ্বাস লাভ করি, যার উপর অবিচল চিত্তে নির্ভর করা যায় এবং আত্মার ক্রমোন্নতির ফলে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হোয়ে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এতক্ষণ ধরে আপনাদের নিকট আমি নিবেদন করেছি, কেমন করে এবং কেন আমি এই ধর্ম গ্রহণ করি। যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে আমি সানন্দে আরও কিছু বলতে পারি।

জগতের সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুমহান্ ধর্মের জন্মদাত্রী রূপে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। আমি এই দেশকে ভালবাসি যেখানে মহান্ হিমালয় পর্বতশ্রেণী চির বিরাজমান; যেখানে তরঙ্গায়িত পর্বতমালা বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই সেই দেশ, যেখানে অন্তঃপুরজীবন সরল ও অনাড়ম্বর; যেখানে পারিবারিক আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানে নারীগণ নিঃস্বার্থভাবে, বিন্দুমাত্র আত্মপ্রচার না করে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে শিশির-স্নিগ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রিয়জনের সেবায় ব্যাপৃত থাকেন; এই দেশেই মাতা ও মাতামহী-পিতামহীগণ পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনের প্রতি পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করে থাকেন; এবং এই আত্মসুখ-উদাসীনতা ও নিঃস্বার্থ সেবাই ভারতীয় নারীকে সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হে আমার ভগিনীবৃন্দ, আপনাদের সকলের প্রতি আমি একান্ত ভালবাসা অনুভব করি, কারণ আপনারা এই প্রিয় ভারতভূমির কন্যা। আপনাদের প্রত্যেকের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে এই মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন। এই সাহিত্যই আপনাদের উন্নত করবে। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে উহা ধরে রাখুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনের সরলতা ও গাম্ভীর্য একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অটুট রাখুন। প্রাচীনকালে

এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল এবং যা অদ্যাপি আপনাদের গৃহে বিদ্যমান সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

পাশ্চাত্যের আধুনিক আদব-কায়দা ও আড়ম্বর সমূহ এবং তার আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা যেন আপনাদের বিনম্র সৌজন্য নষ্ট না করে। যে সুন্দর পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁদের প্রতি নির্ভরপরায়ণ প্রিয়জনের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় স্নেহপূর্ণ বিবেচনার পরিচয় দেন, এবং কনিষ্ঠগণ সন্তানোচিত কর্তব্য পালনের দ্বারা বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তা যেন নষ্ট না হয়। আমার এই আবেদন কেবল হিন্দু ভগ্নীদের প্রতি নয়, মুসলমান ভগ্নীগণকেও আমার এই অনুরোধ। আপনারা সকলেই আমার ভগ্নী, কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশ রূপে গ্রহণ করেছি, এবং যেখানে আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যেতে আশা করি, আপনারা সকলেই সেই দেশের কন্যা।

হিন্দু নারীগণের প্রতি খোলা চিঠি

মাননীয়া ভদ্রমহোদয়াগণ,

আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আমি কতখানি দুঃখিত তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনাদেরও অনেক দূর থেকে অনর্থক আসতে হোল। আমি বুঝেছি, আমার গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশতঃই আপনারা দলে দলে টোণ্ডামণ্ডলম্ হাই স্কুল হলে সমবেত হয়েছিলেন। যদি আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হোত এবং আপনাদের নিকট বর্ণনা করতে পারতাম, পাশ্চাত্যে আমাদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের অর্থ কী, এবং স্বদেশবাসীর উপর তাঁর কী প্রচণ্ড আশা ছিল, তাহলে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করতাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষগণ অপেক্ষা নারীগণের উপর বেশী নির্ভর করছে। আর আমাদের সকলের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। একমাত্র ভারত-ললনাই প্রাচীনকালে সানন্দে মৃত-স্বামীর চিতায় আরোহণ করত, কোন কঠোর হস্তই তাকে নিবৃত্ত করতে পারত না। সীতা ভারতের নারী ছিলেন। সাবিত্রীও তাই। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করেছিলেন যে উমা—তিনিই ভারতীয় নারীর যথার্থ প্রতিমূর্তি। স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতেন যে, এমন কোন করণীয় কাজ ছিল কি যা নারীগণ করতে সমর্থ ছিলেন না? সকল দেশেই জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি এই দুই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। মেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত

১৯০২ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত।

হয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে দিন কাটাতে হয়েছে। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি ও মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত। হে ভারতীয় মাতা ও বধূগণ, অপনাদের এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করাচার্য তাঁদের জননীর কাছে কতদূর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মতো শান্ত, নীরব জীবন যাপন করে গিয়েছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।

আজ আমাদের দেশ ও ধর্ম দারুণ দুর্দশায় উপনীত। স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহূর্তে তাঁর কন্যাদের বিশেষভাবে অহ্বান করছেন —তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসব হন। কী করে তা সম্ভব হবে? আমাদের সকলেরই এই প্রশ্ন। প্রথমতঃ, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা পুনরায় জাগিয়ে তুলুন। এ-ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নয়। ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান্ আদর্শ নেই; যদি এখানেই তা নষ্ট হোয়ে যায়, তবে আর কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মীর আবির্ভাব হবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত

বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আসুন, আমরা সকলেই উপলব্ধি করি স্বদেশ আমাদের জন্য কী করেছে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নন? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করব না?

প্রিয় জননী ও ভগিনীগণ, আমার মনে হয়, আমার গুরুজী এই সকল কথাই আমার চেয়ে আরও সুন্দর ভাষায় আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতেন। একান্ত অযোগ্য আমাকে সম্মান দেখিয়ে আপনারা যে তাঁকেই সম্মান দেখিয়েছেন, সেজন্য আবার আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের নিকট সতত অনুরোধ, যিনি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করে আপনাদের স্বদেশবাসী করেছেন, তাঁর জন্যই—যে এই সুন্দর ও পবিত্র ভূমিকে ভালবাসে ও আপনাদের সেবা করবাব আকাঙ্ক্ষা পোষণ কবে, সেই আমাকে আপনাদের কনিষ্ঠা ভগ্নীরূপে স্মরণ করবেন ও আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। এই সঙ্গে আমি স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চাতে সর্বদা অবস্থিত তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সেই জগজ্জননী কালী, যাঁর শক্তি এই দুই মহামানবের মধ্য দিয়ে কাজ করেছিল এবং নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে যে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে, তার মধ্যেও কাজ করবে—তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তাঁদের নামে এবং মহামায়ার কৃপার উপর ভরসা করেই আমি নিজেকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি।

আপনাদের চির স্নেহানুগতা
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দাশ্রিত নিবেদিতা
কাসল কার্ণন, ট্রিপ্লিকেন
২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯০২

ভারতীয় মনের কাছে উচ্চ বিষয় বা তত্ত্বের আদান প্রদান দোকানদারি মাত্র। বস্তুতঃ কোন লাভের আশায় যে ব্যক্তি আত্মত্যাগ করে, সকল দেশেই সে অবজ্ঞার পাত্র। এই কারণে গুরুভক্তির সঙ্গত দাবী হচ্ছে, হয় আমরা 'সবটুকু দেব, না হয় কিছুই দেব না।' প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ না আমরা মনে প্রাণে উপলব্ধি করি যে, এক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই ঋণী, ততক্ষণ যথার্থভাবে কিছুই দেওয়া যায় না। যদি আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে যে, গুরু আমাদের প্রতিপক্ষ, তাঁর হাত থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অবশ্য রক্ষা করতে হবে, তাহলে কেন আমরা তাঁকে কোন কিছু নিবেদন করতে যাব? তেমন কোন মনোভাবের লেশমাত্র অন্তরে পোষণ করলে গুরুকে কিছু নিবেদন করা দুর্বলতা ব্যতীত কিছু নয়। যখন সমস্ত দেবার পরেও মনে হবে যে, কিছুই আমার দেবার মতো সম্বল নেই, বুঝতে হবে তখনই নিজেকে শিষ্যরূপে সমর্পণের শক্তি লাভ হয়েছে। যাঁর জন্য 'সর্বস্ব' অর্পণও অতি অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্য বলে বোধ হবে, কেবল তাঁকেই আমাদের গুরু বলে সম্বোধন করবার অধিকার জন্মায়। যখন তিনি আমাদের দৃষ্টিতে মহত্তম অধিকার লাভের, সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্মভূত, তখনই কেবল আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের আহ্বান পেয়েছি; আর আমাদের দৃষ্টিতে উল্লিখিত উচ্চস্থান অধিকার করবার পরে তাঁর জন্য আত্মনিবেদনের কোন সীমারেখা টানা কি সম্ভব?

বিশ্বস্ততার আবেগে অনুপ্রাণিত কোনও সৈনিক যেমন নিজের জীবন বিপন্ন হবে জেনেও তার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে অনুসরণ করে জ্বলন্ত অগ্নিদগ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করে, যেমন কর্তব্যের অন্ধ আবেগে পরিচালিত ইঞ্জিনচালক প্লাবন এবং অনলের মধ্যেও তার ইঞ্জিনের পাশে অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি যে নিজের জীবন

উৎসর্গ করেছে তারও কোন বিকল্প চিন্তা থাকা উচিত নয়। 'যে লাঙ্গলে হাত রেখে পিছন ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত নয়।'

সখের কৃষক সম্পর্কে উক্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ বাণীগুলির অন্যতম। এই ভদ্রলোক কৃষক প্রতিকূল ঋতুর ইঙ্গিত পেলেই নিদারুণ নৈরাশ্যে কৃষিকার্য ত্যাগ করেন। কৃষক পরিবারেই জন্ম-গ্রহণ করেছে এমন খানদানী চাষা ফসল উৎপন্ন না হোলেও বছরের পর বছর কৃষিকার্য চালিয়ে যায়। অন্য কিছু করা তার কল্পনার বাইরে। তার সমগ্র জীবনের চিন্তাধারা বীজ বপন ও শস্য সংগ্রহের কল্পনার সঙ্গে জড়িত। কখন আশা ভঙ্গ হলেও কুকুরের মতো নাছোড়বান্দা অভ্যাসটি অব্যাহত থাকে।

গুরুর প্রতি যে ভক্তি ও ভালবাসা আমাদের থাকা উচিত সেটি আমাদের পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক অপেক্ষা মহত্তর। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তি তার পিতার সঙ্গে কোন চুক্তি করতে পারে; কিন্তু মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কখন তার আচার্যের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে না। অগ্নিশিখা কি কখনও আর একটি অগ্নি-শিখার সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করতে পারে? যখন তারা পরস্পরের সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হয় তখন সমস্ত বনভূমিকে দগ্ধ করতে ছুটে চলে। 'তুমি এতদূর অগ্রসর হতে পার—এর বেশী নয়,' এই বলে কি কোন আদর্শবাদী তাঁর আদর্শকে সীমাবদ্ধ করতে পারেন? না, তা হয় না। একবার আত্মসমর্পণ শুরু হোলে—মন, হৃদয় ও আত্মার সর্বস্ব দিলেও মনে হয় কিছুই দেওয়া হোল না। দেওয়াই যেখানে আসল লক্ষ্য সেখানে 'দেওয়ার পরিমাণ' বিচারের বিষয় হোতে পারে না।

অপর পক্ষে গুরু কিছুই দাবী করেন না। শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। গুরু কেবল আদর্শের সন্ধান দেন। গুরু-শিষ্য বন্ধনের সঙ্গে দাসত্ব বন্ধনের এক বিরাট পার্থক্য। না, গুরুর মতো এমন কেউ নেই—যিনি এতটা স্বাধীনতা দেন, যাতে শিষ্যের মধ্যে

আদর্শ স্বাধীনভাবে বর্ধিত হোতে ও পরিণতি লাভ করতে পারে। শিষ্যের কাছে যা দাবী করা যায়, ভক্তিমান শিষ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে চায়। সময় হোলে গুরু স্বয়ং শিষ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। এ অবস্থা গুরু নিজেই সৃষ্টি করেন; শিষ্যকে চাইতে হয় না।

গুরুর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভেই শিষ্যের শক্তি প্রতিষ্ঠিত। যদিও উভয়ে একই সাধারণ আদর্শ অনুসরণ করছেন—সেক্ষেত্রেও একথা সত্য। আধ্যাত্মিক রাজ্যে গুরুপরম্পরাযুক্ত না হোয়ে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী হওয়া অপেক্ষা পিতৃ-পরিচয় হীন সন্তান হওয়া ভাল। কত শীঘ্রই না এই প্রতিভা বিনষ্ট হোয়ে যায়! একেবারে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যায়। যে ব্যক্তি অনুরূপভাবে আত্মদানের কোনও সীমা নির্দেশ করে, সে কোনদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে না। এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক নিন্দনীয়?

যদি আমরা আর কিছুই শিখতে নাও পারি, আমরা যেন নিজেকে বিলিয়ে দিতে, সেবা করতে ও ত্যাগ করতে শিক্ষা করি। আমরা যেন আমাদের অন্তর থেকে 'দোকানদারির' শেষ রেশটুকুও নির্মূল করতে পারি। আত্মানুশীলনের জন্য নয়, পরন্তু আদর্শের জন্যই আমাদের ভাল-মন্দ সব নিয়ে যেন আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করতে পারি। প্রেমের জন্যই প্রেম, কর্মের জন্যই কর্ম, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের এই-ই হোল শ্রেষ্ঠ বার্তা।

মহাদেবের কাহিনী

লোকালয়ের বাইরে নির্জন বন্য অঞ্চলসমূহে যে কোন সময়ে মহাদেবের দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটতে পারে। কারণ ঐ সব অঞ্চল তাঁর অতি প্রিয় বিচরণ স্থল। একবার যদি তাঁর দর্শন পাওয়া যায়, তাহলে আব ভুল করবার উপায় থাকে না। অথচ তাঁকে দেখলে ধনী কিংবা ক্ষমতাশালী বলে মনে হয় না। তাঁর সর্বাঙ্গ শুভ্র ভস্মাবৃত, পরিধানে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র, মস্তকে উন্নত দীর্ঘ জটাজুট। তাঁর এক হাতে ভিক্ষাপাত্র, অপর হাতে সুদীর্ঘ ত্রিশূল দণ্ড। কখনও বা দেখা যায় তিনি দ্বিপ্রহরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন।

হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখরগুলি চির তুষার মণ্ডিত। এই নিস্তব্ধ, শান্ত, শীতল উচ্চ প্রদেশে শিবের অধিষ্ঠান। প্রকৃতির সেই নির্জনতার গভীরে তন্ময়ভাবে তিনি উপবিষ্ট, অনন্ত ধ্যানে সমাহিত। মহাদেবের ললাটস্থিত দ্বিতীয়ার চন্দ্র যখন পর্বত শিখরে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করে, তখন যাঁরা তাঁর উপাসক, তাঁদের কাছে তিনি জ্যোতিরূপে প্রতিভাত হন। প্রকৃতই তিনি জ্যোতির্ময়, কায়াহীন, তাই তাঁর কোন ছায়া দেখা যায় না।

মানস সরোবরের উর্ধ্বে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অবস্থিত কৈলাস পর্বত মহাদেবের শৈলাবাস। আর সেখানে ভাবের গভীরতম স্তরে অবগাহন কবে বিরাজ করেন তিনি। কথিত আছে, তাঁর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়। সেই মহাদেবের কিন্তু নিজস্ব বলতে কিছু নেই। রাজত্ব, পিতৃত্ব, সম্পদ, ক্ষমতা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের কোন কিছুই মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভোগে প্রলুব্ধ করতে পারে না। তাঁর একমাত্র কামনা সকল জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করে জ্ঞানালোক দান। শোনা যায়, একদা তাঁর ধ্যান এত প্রগাঢ়

হয়েছিল যে, যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হোল, তখন চরাচর বিশ্ব লুপ্ত, আর যাবতীয় পদার্থ বিনাশ করে তিনি একাকী দণ্ডায়মান। তারপর সমগ্র বিশ্ব থেকে অন্ধকার বিদূরিত ও সর্বলোকের হৃদয় থেকে অজ্ঞান বা পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে দেখে তিনি সেই চরম নির্বাসনার শূন্যতার মধ্যে উর্ধ্ববাহু হোয়ে মহানন্দে 'ব্যোম, ব্যোম' সঙ্গীত ধ্বনির সঙ্গে নৃত্য শুরু করলেন। মহাদেবের এই নৃত্যই ভারতে প্রলয় নৃত্য বলে অভিহিত। আর সেজন্যই 'ব্যোম! ব্যোম! হর! হর!'—এই ধ্বনি সহকারে তাঁর অর্চনা করা হয়।

মহাদেবের মুখমণ্ডল দর্শন করা মাত্র তাঁকে চিরদিনের মতো চিনে নেওয়া যায়। সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। জ্ঞানের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত তাঁর বারেক দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট, তাঁর করুণ, কোমল, শুভ নয়নের এক পলক চাহনি যদি আমাদের ওপর পড়ে, তাহলে যাঁকে দেখলাম তিনি যে স্বয়ং শিব তা আমরা আর ভুলতে পারব না। মহাদেব কখনো ক্রুদ্ধ হোতে পারেন এ কথা চিন্তাও করা যায় না। 'রজত গিরি সদৃশং' সেই মহাদেব মানুষের মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষ্য করে থাকেন—তাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে অথবা নেই। আমাদের অপরাধ বা ভ্রম যাই হোক—তিনি কেবল আমাদের কাছে তার কারণ উদ্ঘাটন করতে চান—যাতে আমরা অন্ধকারে দিশেহারা হোয়ে ঘুরে না বেড়াই। অসীম তাঁর করুণা, বিন্দুমাত্র মলিনতার ছায়া বা কলঙ্কের দাগ তাতে নেই।

জাগতিক বিষয়ে তিনি অনাড়ম্বর, তাঁর পূজার্চনার জন্য বলতে গেলে তিনি কিছুই দাবী করেন না, এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে ভোলানো যায় অতি সহজে। বিল্বপত্র, জল ও একমুষ্টিরও কম কয়েক দানা তণ্ডুলই তাঁর পূজার উপকরণ। আর যে ভাবেই তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হোক তিনি গ্রহণ করবেন। যেমন ব্যথা ভরা অশ্রুজল তাঁর কাছে প্রায়ই পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পবিত্র তীর্থ জল বলে গৃহীত হয়। একদা তিনি নিশীথকালে এক রাজার

শিবিরে প্রহরীর কাজে রত ছিলেন, এমন সময় শত্রুসৈন্য আক্রমণ করে তাঁকে নিহত করবার চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তগণের সঙ্গে ছিল বেলকাঠের যষ্টি এবং ঐ যষ্টি দ্বারা তারা বারংবার মহাদেবকে প্রহার করে। মহাদেব কিন্তু স্মিতহাস্যে ঐ আঘাত পূজা বলে গ্রহণ করেন এবং হস্ত প্রসারিত করে তাদের মস্তকে আশিস্ বর্ষণ করেন।

যারা সমাজে পরিত্যক্ত, ভবঘুরে, অভিভাবকহীন কেবল তাদেরই তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাঁর একমাত্র সেবক হোল অনুগত নন্দী। হস্তী বা অশ্ব পৃষ্ঠে তিনি কদাপি আরোহণ করেন না, তাঁর বাহন হোল এক জীর্ণ, বৃদ্ধ ষাঁড়। ক্রূর সর্পকুল সকলের নিকট অনাদৃত, তাই তিনি তাদের কণ্ঠ বেষ্টন করে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে যারা কুটিল, কুব্জ, পঙ্গু ও তির্যকচক্ষু তাদের তিনি অতি আপন জন জ্ঞান করেন। অসহায়, পঙ্গু ও দরিদ্র হোলে সহজেই মহাদেবের হৃদয়ে স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যিনি কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন না, যিনি কেবল সব দিয়েই যান, পরিবর্তে কিছু গ্রহণ করেন না, সেই পশুপতির নিকটে যে অকপট হৃদয়ে শরণ গ্রহণ করে, সে কখন তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় না। যদি আমরা সরলভাবে প্রার্থনা করি, অথবা কাতর ভাবে আমাদের প্রয়োজন জানাই, তিনি খুসী হোয়ে তাঁর আপন সত্বার সমস্ত মাধুর্য ও উজ্জ্বলতাসহ নিজেকেই দিয়ে দেবেন।

তবে শিব কেবল এইরূপেই মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হন না, অনেক সময়ে সেই চরম জ্ঞান ও আমাদের মধ্যে অন্তরায় হোয়ে দাঁড়ায় আমাদের অতি প্রিয় বস্তু। কিন্তু মহাদেব হলেন অজ্ঞানের বিনাশকারী, তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হবেন খড়্গ হস্তে, আর আমাদের চোখের সামনেই বিনাশ করবেন আমাদের পরম প্রিয়জনকে। সেই মুহুর্তে তাঁর ললাটের মধ্যদেশে দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন তৃতীয় নয়ন জ্বলে ওঠে ও সমস্ত ভণ্ডামী, প্রতারণা ও মিথ্যার

মর্মভেদ করে। আর সেই প্রদীপ্ত নয়নের বহ্নিদ্বারা যা কিছু অসত্য, অসার তা মুহূর্তে তিনি দগ্ধ করে ভস্মীভূত করেন। জাগতিক বিষয়ে তিনি অজ্ঞ বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাঁকে কিছুতেই প্রতারিত করা চলে না। এই দিক থেকে তাঁকে বলা হয় রুদ্র বা ভয়ঙ্কর। 'মধুরং মধুরাণাম্, ভীষণং ভীষণানাম্'—এই বলেই দিনের পর দিন লোকে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়।

তার সম্পর্কে এই জাতীয় কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের যে স্বতঃসঞ্জাত ধারণা, উক্ত কাহিনীগুলি তার অর্ধ সত্য মাত্র। বস্তুতঃ ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি দুটি জিনিস—এক হোল অন্তর্দৃষ্টি, যাকে ভারতীয় ভাষায় বলা হয় জ্ঞান, আর এই জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি বা বিকাশ হলেন সেই শিব বা মহাদেব। কিন্তু অনেকেই আবার অপ্রতিহত ক্ষমতা, অমিত উদ্যম বা প্রাণশক্তি ও আমাদের চারিপাশে অবস্থিত দৃশ্যমান এই জগতকেই মনে করেন ঈশ্বর। বস্তুতঃ এই উভয়কে পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না। তাই জগতের আদ্যাশক্তিরূপে শিবের চিরসঙ্গিনী হলেন মহাশক্তি। সতী, উমা এবং মহাকালী রূপে সেই মহাশক্তির নানা চিত্র ও কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনিই গৌরী, হেমাঙ্গিনী, সুন্দরী—গিরিতুষারে প্রতিফলিত নবোদিত সূর্যের কিরণছটা সদৃশ। অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতিমূর্তিস্বরূপ মহাদেব, যিনি মানব সমাজে শিব নামে পরিচিত, তাঁরই পত্নী এবং অনুগত পূজারিণী রূপে উমা চিরকাল কৈলাসে বসবাস করেন।

প্রিয়তম

আমি যেন সর্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ। আমার প্রিয়তমই অতিপ্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধ্য দিয়া চাহিয়া আছেন, এই দ্বারে করাঘাত করিতেছেন। প্রিয়তমের কোন অভাব নাই; তথাপি তিনি মানুষের অভাবের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসেন, যাহাতে আমি তাঁহার সেবার সুযোগ পাই। তাঁহার ক্ষুধা নাই, তথাপি প্রার্থী হইয়া আসেন, যাহাতে আমি তাঁহাকে দিতে পারি। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, যাহাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু যাহাতে আমি তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাহাতে আমি দান করিতে পারি। প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার। হাঁ, আমি একান্তভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া তুমি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াও।

পথঘাট পরিষ্কার রাখার প্রস্তাব

(নারীগণের প্রতি নারীর উক্তি)

প্রাতঃকালে ফকীরেরা আমাদের দুয়ারে এসে গেয়ে যায়,—

সকাল বেলা ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাবেলা বাতি।
লক্ষ্মী বলেন সেইখানেতে আমারই বসতি॥

গৃহিণীরা আদর করে ভিক্ষা দেন আর এই উপদেশপূর্ণ শ্লোকটি বউ ঝিকে শোনান। ঘরদোর পরিষ্কার রাখবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বাল্যকাল থেকেই শিখি। ঘর সাজানো, যথাস্থানে যথা-যোগ্য সামগ্রী রাখা, ইতস্ততঃ এটা ওটা ফেলে না রাখা, জিনিস-পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, এসব আমরা নারী, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। ঘরদোরের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা দেখতে আমরা ভালবাসি এবং আয়াস-সাধ্য ও সময় ব্যয় হোলেও, সে কাজে যত্ন নিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। কেন? এর প্রয়োজনই বা কি! তা জানি বা না জানি, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাদের প্রিয়। বিবেচনা করে দেখলে এই কার্যে পারিবারিক বিশেষ মঙ্গল। রন্ধন পাত্রে কলঙ্ক থাকলে আহার্যদ্রব্য বিষাক্ত হয়, এমন কি, সেই বিষে সপরিবার ধ্বংসও হোতে পারে। চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই একথা পুনঃ পুনঃ বলে থাকেন। গৃহের এক পার্শ্বে জঞ্জাল থাকলে গৃহ এরূপ দূষিত হয় যে, তার থেকে ওলাউঠা ও প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং গৃহে জঞ্জাল রাখার অর্থ যত্নপূর্বক ঐসব রোগকে গৃহে স্থান দেওয়া। আবর্জনাই উৎকট রোগের সুখশয্যাস্বরূপ। প্রত্যূষে উঠে আমরা গৃহদ্বার ও জানালা উন্মুক্ত করে সূর্যোদয় দেখি। গৃহের মধ্যে সূর্যের রশ্মি প্রবেশ করে, ধীরে ধীরে বাতাস চলাচল করে, গৃহের সমুদয় দ্রব্য সূর্য-কিরণে উত্তপ্ত ও পরিশুষ্ক হয় এবং গৃহ আনন্দধাম হোয়ে ওঠে।

যে গৃহে সূর্য প্রবেশ করে না, প্রভাত বায়ু বিচরণ করে না, তার অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ; সে গৃহ স্যাঁতসেঁতে, অপরিচ্ছন্ন ও পীড়ার আবাসভূমিতে পরিণত হয়। একটি প্রবাদ বাক্য আছে—

পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ।
দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, বাড়ি করগে ভেড়ের ভেড়ে॥

বাক্যটির সার্থকতা এই, পূর্বদিক খোলা থাকলে গৃহের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করবে, পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ পীড়িত করবে না, উত্তরের তীব্র বাতাস কাঁপুনী ধরাবে না, দক্ষিণ পবনে শরীর স্নিগ্ধ হবে। পরিজনবর্গের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। যে গৃহে স্বাস্থ্য নেই, সেখানে লক্ষ্মীও অবস্থান করেন না। যেখানে শোক, সেখানে উপার্জনের অবকাশ কোথায়! যাতে পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, এমন কাজ আমাদের দায়স্বরূপ, আমরা আনন্দের সঙ্গে সে দায় বহন করি। আমাদের প্রিয়জনের মঙ্গল সাধন ইচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করে, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা অন্তঃপুর-বাসিনী মাত্রেই প্রস্তুত।

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের গৃহটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে যেরূপ যত্নশীল, আপন পরিজনবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখেন জনসাধারণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ও শহরের পারিপাট্য বিধানে সেরূপ যত্ন ও লক্ষ্য নেই। কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শহরের পারিপাট্যরক্ষা আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। যে পথে আমরা প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাই, সে পথটি যদি যথাযথ পরিষ্কৃত না হয়, যদি সেখানে আবর্জনার স্তূপ ও নানা পচা, নোংরা জিনিস বিকৃত ও বিশ্রীভাবে পড়ে থাকে, তাতে আমাদেরই বিপদ। যখন ঐ অপরিচ্ছন্নতার দরুণ, পল্লীর কোনও গৃহস্থের বাড়ি প্লেগের কুৎসিত পক্ষচ্ছায়ায় অন্ধকারময় হয়, তখন কি আমাদেরই পরিজন

ও সন্তানবর্গের সঙ্কটকাল উপস্থিত হয় না? জীবনে মরণে মানুষের দায়িত্ব কেবল নিজের ও পরিবারের জন্যই নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল বা অমঙ্গলে, সমাজের মঙ্গল বা অমঙ্গল।

আমাদের নিজ নিজ গৃহ যেন আমাদের প্রিয় রাজ্য। সেখানে গৃহরক্ষার গৌরব সম্রাজ্ঞীর মতো বিরাজমান, সেখানে সর্বদাই সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন আমরা স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করি, তখন যদি দেখি পথ-ঘাটও আমাদের গৃহের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর তাহলে কি আমরা আনন্দ বোধ করি না? যখন ইষ্টমূর্তির ধ্যানে আমাদের চিত্ত তন্ময়, তখন পথ-ঘাট শুচি অবস্থায় থাকলে যে ঐ ধ্যানের সহায়ক হয় তা কুলবধূ মাত্রেই সত্য বলে স্বীকার করবেন। এই জন্যই কল্যাণময়ী জননী তাঁর গৃহ প্রাঙ্গণের ন্যায় পথ-ঘাটও পরিমার্জিত দেখতে ইচ্ছা করবেন। এ শুভ ইচ্ছা কি সুসম্পন্ন করা যায় না? পথ-ঘাট মার্জিত রাখবার জন্য আমাদের সাহায্যের কি প্রয়োজন? যদি সরকারী সম্মার্জনকারীদের কাজের উপর আমাদের দৃষ্টি থাকে, তারা কিভাবে কাজ করছে লক্ষ্য করি, তাহলে তারা অচিরেই গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজের নিজের কাজে যথোচিত মনোনিবেশ করবে। যদি পল্লীর সকলে প্রতিনিয়ত একত্র হোয়ে কি কি ত্রুটি ঘটছে সে বিষয়ে স্থির করি এবং আমাদের ন্যায্য প্রয়োজন মিউনিসিপ্যাল সভায় যাঁদের উপর কার্যভার অর্পিত তাঁদের জ্ঞাপন করি, তাহলে বাধ্য হোয়ে মিউনিসিপ্যাল সভা আমাদের প্রস্তাব শুনবেন। সরকারী পথ যদি ভালরূপে সম্মার্জিত না হয়—তা কতক পরিমাণে আমাদেরই দোষে ও সে দোষ সহজে সংশোধন করা যায়। যে সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে সুচারুরূপে কার্য সম্পন্ন হয় সেগুলি অতি সামান্য আয়াসসাধ্য।

প্রত্যূষে পাঁচটা থেকে দশটা পর্যন্ত পথের আবর্জনাসমূহ তুলে নিয়ে যাবার জন্য ময়লা-গাড়ি ঘুরে যায়। সুতরাং প্রতি গৃহস্থের

উচিত, রন্ধনশালার আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট বস্তু, পাতা, ডাঁটা, এটা সেটা, পরিত্যক্ত খাদ্য, ভাঙ্গা পাত্র প্রভৃতি প্রতিদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে গৃহের বাহিরে ফেলে দেওয়া। অনেকেরই অমনোযোগ-বশতঃ ময়লাফেলা গাড়ি আসবার পূর্বে ঐ সব আবর্জনা ফেলা হয় না। বাড়িতে প্রত্যেকটি ভোজ অনুষ্ঠানের পর উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য দাসদাসীরা পথে ফেলে দেয়, ফলে রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয়। দাসদাসীকে বারণ করে এই বীভৎস দৃশ্য সহজেই দূর করা যায়। অনেক পরিত্যক্ত বস্তু আমরা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারি। বিশেষ দুটি জিনিস পুড়িয়ে ফেলা নিতান্ত প্রয়োজন এবং কখনই রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা উচিত নয়। প্রথম—ছেঁড়া কাগজ। ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পথ ঢেকে থাকলে ঝাঁট দেওয়া কঠিন। যে পুরস্ত্রী ঐ দৃশ্য দেখেননি তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ঐ কাগজের টুকরাগুলি একেবারে পরিষ্কার করে নিয়ে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। ইতস্ততঃ ছেঁড়া কাগজ গলে পড়ে রয়েছে—এ দৃশ্য অত্যন্ত ঘৃণাজনক। ঐসব পুড়িয়ে ফেললে আর জঞ্জাল হয় না। দ্বিতীয় বস্তু—চিকিৎসার আবর্জনা। এগুলি পুড়িয়ে ফেলা অতিশয় কর্তব্য, যেমন—বাড় বাঁধার চিড়, পুলটিস, দেহের অন্যান্য দুষ্ট দ্রব্য। এসব পুড়িয়ে না দিলে অপরের বিপদের কারণ হোয়ে ওঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পবিত্র অগ্নি ব্যতীত দেবার্চনায় অর্পিত পুষ্পগুলির রাখবার স্থান আর কোথায়? প্রতিগৃহে জ্বালানি কাঠ বা কয়লা স্বচ্ছল না হোতে পারে, কিন্তু অবস্থার আয়ত্তের মধ্যে যতটা হিতকর করা যায়, তা আমরা নিশ্চিতই করতে পারি। পরিষ্কার ছাই, চুন ও আলকাতরা যেভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, আমরা কি সেভাবে ব্যবহার করি? অনেক গৃহের আবর্জনা বাধ্য হোয়ে রাস্তার ধারে রাখতে হয়। যেখানে মাটি বেশ শুষ্ক সেখানে ঐ আবর্জনা রাখলে পরিষ্কার করবার পক্ষে সুবিধাজনক। যে গলিতে মেথর আনা-গোনা

করে, সেই গলির কোণে বা যেখানে জলের নল ফেটে গিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকে সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখেন। ফলে ঐ জঞ্জাল থেকে পচা রস মাটিতে প্রবিষ্ট হয় এবং শীঘ্রই জায়গাটি আরও কদর্য ও দুর্গন্ধযুক্ত হোয়ে ওঠে। কিন্তু ঐ অবস্থায় শুষ্ক চুন বা ছাই, মাটি ও আবর্জনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। জঞ্জাল ফেলার ঝুড়িতে বেশ করে আল্‌কাতরা দেওয়া উচিত এবং জঞ্জাল ফেলার পর প্রতিদিন তাতে ছাই দেওয়া প্রয়োজন। এরদ্বারা ঝুড়ি অপরিষ্কৃত হোতে পারে না, এবং পচা জিনিসও লেগে থাকে না। আমাদের বোসপাড়ায় তিনটে আধার আছে আবর্জনা ফেলবার। প্রতিদিন যে সব আবর্জনা জমে সেগুলি সহজেই কাছের ময়লাধারে ফেলা যায়। এই উপায় অবলম্বনে ময়লা বহনের কাজ বিশেষ সহজ হয় এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করার আশাও করা যায়। কিন্তু যদি ঐভাবে জঞ্জাল ফেলবার আধার ব্যবহৃত না হয়, সকলে যদি এভাবে কাজ না করেন, তাহলে আমাদের পরিচ্ছন্ন থাকবার সব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হবে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বৃন্দাবন বসুর লেনে ১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যরক্ষার অফিস আছে। এবং ঐ অফিসের কর্মচারিগণ বোসপাড়ার পরিমার্জনা সম্বন্ধে যা যা অভাব তা শুনতে প্রস্তুত এবং পূরণ করতে সম্মত। ঐ ব্যাপারে যার যা অভিপ্রায় ১৭নং বোসপাড়া লেনে লিখে পাঠিয়ে দিলে ঐ অফিসে জানানো হবে। আমার নিশ্চিত ধারণা, যদি আমরা সাধারণের পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করি এবং যথাসাধ্য আমাদের পল্লীতে এ বিষয়ে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করি, তাহলে প্রত্যেক হিন্দু পল্লীর রাস্তা ও গলি শীঘ্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং আমরাও ঐ অবস্থা দেখে চিত্তপ্রসাদ লাভ করব।

—নিবেদিতা,

১৭নং বোসপাড়া লেন, কলিকাতা।

চিত্র পরিচিতি

ভারতমাতা

এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে, ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের বহুবিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্রবাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, আকার প্রকারেও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্তিটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারি বাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্নস্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানস নেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেই-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মাতার মধ্যে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা ঐ চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে। কুহেলিকার মতো অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তেমনভাবেই তাঁহার চারিটি বাহু ও (তাঁহার) অনন্ত প্রেম তাঁহাকে সাধারণ জগৎ হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্বদেহাবৃত পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এইসকলের মধ্য দিয়া তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না ?—প্রাচীন কালের ঋষি-দিগের নিকট বৈদিক উষা যেমন ছিলেন ?

সেণ্ট জেনেভীভ্

সেণ্ট জেনেভীভ্ প্যারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী। এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্যারিসের প্যান্থিয়নের দেওয়ালে Puvis de Chavannes কর্তৃক অঙ্কিত সেণ্ট জেনেভীভের জীবনচরিত বিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর ইহা অন্যতম। ফরাসীরা তাঁহাদের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিগণের চির বিশ্রামস্থল এই মহান্ উপাসনা মন্দির নানা পৌর ও ঐতিহাসিক প্রাকার চিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন,—আমরা যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আমাদের মিলন মন্দিরকে (Federation Hall) ঐভাবে অলঙ্কৃত করিতে পারি।

এই বিশেষ ছবিটি একখানি প্রাচ্য ছবি হইতে পারিত। এই প্রাচীনা সাধিকা নারী অবগুণ্ঠনাবৃতা। সত্য বটে, এই অবগুণ্ঠন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, কোন প্রাচ্য গৃহিণীর নহে। তথাপি ইহাতেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে। আমরা নিদ্রিত নগরীর অলিন্দের ছাদ, গৃহগুলির সমতল ছাদ, এবং টাইল আচ্ছাদিত অট্টালিকাসমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের তুলসী-গাছের মতো গৃহের প্রাঙ্গণে গোলাপগাছ ও গৃহের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দীপ রহিয়াছে। সেণ্ট জেনেভীভের মুখ ও মূর্তি অনায়াসে কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মূর্তি হইতে পারিত। ঠিক এই ছাঁচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা জানি না কি?

এই চিত্রখানি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পৌর মনোভাবের সুন্দরতম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থে রাত্রি জাগরণ ও পরার্থে প্রার্থনা নারীর শাশ্বত বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য। এই জীবনোদ্দেশ্য এই চিত্রে আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। অতীতে গৃহস্থাশ্রমে ও ধর্মমন্দিরে নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা ও বিস্তৃততর অনুভূতির আলোকে, তিনি

পৌরজন ও জাতির উপর প্রসারিতা প্রেমস্পন্দনশালিনী, কল্যাণ ধ্যাননিমগ্না, প্রার্থনাশক্তিরূপিণী হইবেন।

সতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত 'সতী' চিত্র অতি সুন্দর ও সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণ হইয়াছে। বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা সতী মহত্তম আত্মোৎসর্গের সময়ও সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতা; তিনি যে অসাধারণ কিছু করিতেছেন, তাহা তিনি মোটেই অনুভব করিতেছেন না। অগ্নিশিখাসমূহ ভীষণ রাক্ষসের জিহ্বার মতো লক্‌লক্ করিয়া উর্দ্ধে বিস্তারিত হইতেছে। তিনি সেই অগ্নিশিখা-সিংহাসনে নির্ভয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ইষ্টদেবতার আরাধনার সহিত অশ্রুপাত বা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির সংমিশ্রণ নাই। তাঁহার চক্ষু আর কিছু দেখিতেছে না—নিম্নস্থ অগ্নিশিখা, বা যে সকল প্রিয়জনকে তিনি ছাড়িয়া যাইতেছেন, কিছুই তাঁহাব চোখে পড়িতেছে না—তিনি কেবল তাঁহারই পবিত্র মূর্তি দেখিতেছেন, যাঁহার সহিত তিনি অচিবে মিলিত হইতে যাইতেছেন। তাঁহার চিত্ত স্থির, শান্তিতে প্লাবিত। ইহা মিলনের মুহূর্ত। তিনি বিচ্ছেদের কথা জানেন না।

এই সম্পূর্ণ নির্ভীকতায়, আত্মগৌরবানুভূতির সম্পূর্ণ অভাবে, আমরা নারীচরিত্রের মহিমা সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার কি আশ্চর্য সাক্ষ্য পাই! অন্যান্য দেশে লোকে ধর্মবিশ্বাসের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানবিস্তারের অধিকার লাভ ও রক্ষার জন্য, বা এবম্বিধ অন্য কোন মহৎ ব্যাপারের জন্য, যাহা করিয়াছে, ভারতে তাহাই কুসুম কোমলা নারী দাম্পত্য প্রেমের জন্য সহস্রগুণ অধিকবার করিয়াছে! যাঁহারা এরূপ মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সর্বথা পূজনীয়া। যে জাতির মধ্যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহাদের সাহস ও নিষ্ঠা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সহমরণ প্রথায় তাহা আর দেখা দিবে না, দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আমাদের জাতিগত এই সাহস ও নিষ্ঠা ভবিষ্যতে অনেক রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বব্যাপী ঘটনায় আবার দেখা দিবে।

পত্রাবলী

ভারতবর্ষ

২২শে মে, ১৮৯৮

প্রিয় মিসেস হ্যামণ্ড,

অনেক কথা আছে যা তোমাকে আমার বহুপূর্বেই বলা উচিত ছিল, কারণ আমি চাই আমার চিঠিগুলি পড়ে যেন তোমার মনে হয়, তুমি বরাবর ভারতবর্ষেই আছ। দেখতে পাচ্ছ, আমি এখন হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়ায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমাদের লণ্ডনের বন্ধুটি (মিঃ স্টার্ডি) দীর্ঘকাল আগে বাস করে ধ্যানধারণায় কাটিয়েছিলেন এবং এখান থেকেই গতবৎসর আমি 'প্রত্যাদেশ' লাভ করি। আমার এত বিস্ময় লাগে যে, এই স্থানটি পৃথিবীর কত কাছে! সমতলের শেষ রেলওয়ে স্টেশন কাঠগোদামে পৌঁছুতে আমাদের ট্রেনে ছ' রাত্রি ও এক দিন লেগেছে। সেখান থেকে গাড়ি ও ডাণ্ডির সাহায্যে হ্রদের তীরে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর স্থান নৈনীতালে এসে উপস্থিত হই। তারপর দু'দিনে আরও বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে এখানে (আলমোড়ায়) এসে পৌঁছেছি। হয়তো স্থানটিকে পৃথিবীর খুব কাছে বলা যায় না। কিন্তু বরাবর সমস্ত পথটুকু বড় বড় ঢাকা গাড়িতে অতিক্রম করায় মনে হয় একবারও যেন দূরে যাইনি, আর এই ছোট্ট পার্বত্য দুর্গটির দূরত্ব ও নির্জনতাও যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না।

অনেকবার ভেবেছি, তোমাকে সেই মহিলার কথা বলব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, নাম সারদা। প্রথমেই বলতে হয়, পঞ্চাশের মধ্যে বয়স এমন একজন হিন্দু বিধবার মতো তাঁর পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়ীটি প্রথমে কোমর পর্যন্ত স্কার্টের মতো জড়ানো। তারপর সারা দেহ বেষ্টন করে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে, যেন পাশ্চাত্য দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন। যখন কোন পুরুষ মানুষ তাঁর সঙ্গে কথা

বলেন তিনি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তিনি এই শুভ্র অবগুণ্ঠন তাঁর মুখে অনেক দূর পর্যন্ত নামিয়ে দেন। তাছাড়া তিনি সোজাসুজি কথা বলেন না; আর একজন অধিক বয়স্কা মহিলাকে প্রায় ফিসফিস করে কিছু বলেন। উক্ত মহিলা উচ্চৈঃস্বরে তাঁর কথাগুলি পুরুষদের কাছে পুনরাবৃত্তি করেন। এর সঙ্গে তোমাকে কল্পনা করতে হবে যে, তিনি সর্বদাই মেঝেয় একটি ছোট মাতুরের উপর বসে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো তেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু তাঁকে ভাল করে জানলে বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ! তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। এত শান্ত, স্নেহশীলা, আবার ছোট বালিকার মতো সদা উৎফুল্ল। বরাবরই তিনি ছিলেন বিশেষ রক্ষণশীলা। আশ্চর্য, দু'জন পাশ্চাত্য-বাসিনীকে দেখবার পরমুহূর্তে তাঁর রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রইল না! অতিথিদের সব সময়েই ফল দেওয়া হয়। তাঁকেও দেওয়া হোল—সকলকে আশ্চর্য করে তিনি ঐ ফল গ্রহণ করলেন! তাঁর এই আচরণ আমাদের সকলকে মর্যাদা দান করেছে, আর আমার ভবিষ্যৎ কার্যের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করে তুলেছে, আর কিছুই তেমন পারত না। তাঁর মহিমার একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারি—তাঁর কলকাতা অবস্থান কালে চৌদ্দ-পনেরো জন উচ্চ বর্ণের মহিলা তাঁর পরিচর্যা করেন, এবং তিনি অপূর্ব কৌশল ও ভালবাসা দ্বারা তাঁদের সব সময় শান্তির মধ্যে রাখেন। একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হোয়ে তাঁকে বাংলায় যীশু জননী মেরীর গান (Magnificat) পড়ে শোনালেন। তুমি যদি দেখতে কী ভাবেই না তিনি তা উপভোগ করলেন! সত্যই তিনি শক্তিরূপিণী ও মহানুভবা রমণীগণের অন্যতমা, যদিও নিতান্ত সরল ও অকপট।

আমি তোমাকে বলতে পারি না, এই ধ্যানের ভাবটি আমার মধ্যে কত গভীরভাবে বর্ধিত হচ্ছে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে কাউকে বলা যায় না। এ কেবল একা একা দেখবার এবং অনুভব করবার।

এই পাহাড়ের বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত বিশেষ করে নক্ষত্রালোক, যেন শান্তির রহস্যে ভারী হোয়ে ওঠে—যা বর্ণনা করে বোঝাতে পাবব না।

এখানে এক ধরনের পাইন বৃক্ষ আছে যাকে বলা হয় দেওদার, অনেকটা লার্চ (Larch) ও সিডাব (Cedar) এর মতো বিরাট মহিমময় এবং ইংলণ্ডের শরৎকালীন কালোজামের (black-berry) মতো মিষ্ট গন্ধে পরিপূর্ণ। এই উচ্চ প্রদেশে আমাদের চারিদিকে দেওদার বৃক্ষগুলি এখানকার ভাষাহীন গভীরতাকে গভীরতর করে তুলেছে। তুষাবের প্রভাবও অনুরূপ। সামনে বিস্তৃত ধূসর বর্ণের পর্বতমালার উপবে তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ শিখরের মহিমময় আবির্ভাব—যাকে উপেক্ষা করা যায় না। আমরা যে বারান্দায় বসে এই শোভা দেখছি তার চারিদিকে গোলাপের কুঞ্জ। গুহাই এ দৃশ্য দেখবার পক্ষে যথার্থ স্থান।

জাতি বিদ্বেষ বলতে কি বোঝায়, ইংলণ্ডে বসে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। পৌরুষের কাছে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না। আজ সকালে একজন সাধু সংবাদ পেয়েছেন যে, স্বামীজীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছে। স্বামীজী সংবাদটি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। আমি কিন্তু এর উপর গুরুত্ব আরোপ না কবে পারি না। স্বামীজীর কাজে হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করলে বুঝব গভর্ণমেণ্ট উন্মাদ, কারণ গভর্ণমেণ্টের এই কাজ সমগ্র দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলবে, আর আমি যে এ দেশে একজন অতিশয় রাজভক্ত মহিলা (এখানে আসবার পূর্ব পর্যন্ত আমার আনুগত্যের গভীরতা সম্বন্ধে কখনও সংশয় ছিল না), সেই আমি সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে দাঁড়াব। কিন্তু আশা করা যাক, আমরা এই সব সন্দেহের পরিবর্তন করতে পারব। ইতি—

তোমার
মার্গারেট

কলিকাতা
৬ই জুন, ১৮৯৮

প্রিয় মিসেস হ্যামণ্ড,

গতকাল তুপুরের দিকে মিঃ গুড্উইনের মৃত্যু সংবাদ বহন করে টেলিগ্রাম আসে। আমাদের সকলেরই দিনটা খুব খারাপ কেটেছে। আমিই তাঁকে সব শেষ দেখি। মাদ্রাজে ঐ দিন কী সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই করেছিলেন! এবং এই সৌজন্যবোধ সম্পূর্ণভাবে তাঁরই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যে সব হিন্দুরা তাঁকে জানতেন তাঁদের শোক স্পষ্টতঃ আন্তরিক। একটা সান্ত্বনা এই যে, পৃথিবীর অন্যতম একটি চমৎকার জায়গা উতকামণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—মাদ্রাজের মতো সাংঘাতিক জায়গায় নয়। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্লেগ অথবা টাইফয়েডের মতো ভয়ঙ্কর ব্যাধিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, যদিও কাজ করতে করতে ও জলবায়ুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর সেবা ও ভক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে দিয়ে চলে যাওয়া—ভারতবর্ষের আগামী যুগে একজন ইংরেজই প্রথম স্থান অধিকার করে থাকবেন। এমন এক পরিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশে ধূপ, ফুল ও সুন্দর সঙ্গীতই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপহার।

অনেক কিছুই শিখছি। প্রথমেই বলি, আমি স্বীকার করতে আরম্ভ করেছি যে, হয়তো আধ্যাত্মিকতায় ইংরেজ রমণী ইংরেজ পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যে কোন হিন্দু পুরুষ ইংরেজ রমণী ও পুরুষ উভয়ের চেয়েই এ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। একটা নির্দিষ্ট অবস্থা আছে তাকেই আখ্যা দেওয়া যায় আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করা প্রয়োজন। মানুষের ভালবাসা লাভের জন্য হৃদয় যেমন আকুল হোয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি করে অন্তরাত্মা হাহাকার করে ভগবানকে লাভ করবার জন্য। এতদিন ধরে যা

মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলে বোধ হয়েছিল, প্রকৃত অহমিকা-শূন্যতার অত্যুগ্র শুভ্র জ্যোতির তুলনায় তা নিতান্তই হাল্কা ও শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত কিছুই নয়। এ সবই আমি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলি পরিষ্কাররূপে দেখতে এত সময় লাগল! আপাততঃ এর বেশী আর কিছু বুঝতে পারছি না। মানুষের জীবন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অতীত ধারণাগুলিকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি—অথচ দেখছি, মহাপুরুষগণ সেগুলি উড়িয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর তাঁরা কি একেবারে ভ্রান্ত হোতে পারেন? বর্তমানে আমি কেবল অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছি, এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করছি ও প্রমাণ খুঁজছি। আশা করি একদিন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করব, আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হোয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তা অপরকে দান করতেও পারব। একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হোয়ে গেছে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।…

শুনে থাকবে কলকাতায় আবার প্লেগের আবির্ভাব হয়েছে। হয়তো এ সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে তুমিই সব শেষ সংবাদ রাখ। কারণ এখানে কদাচিৎ সংবাদপত্র আসে। গ্রীষ্মকালে অবস্থা তত খারাপ না হোতেও পারে, এবং শীতকালে যদি প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয় তখন মঠ নিজেদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল খুলবে।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরকে ভালবাসবে, এ আমার জীবনের স্বপ্ন। ইংলণ্ডের প্রতি সুবিচার করতে হোলে বলতে পারি—ইংলণ্ডের সন্তানগণ নানাভাবে সুচারুরূপে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতবর্ষের সেবা করছে, কিন্তু তাদের সেবার ধরন এমন যাতে ভারতের কাছ থেকে প্রীতির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অপর পক্ষে বলতে গেলে প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতা দাবী করছে। ইটালী অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে, গ্রীস তুরস্কের কাছ থেকে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কাছ থেকে মুক্তি চাইছে। ভারত মুক্তিলাভ করলে আগামী

শতাব্দীতে হিন্দুগণই হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষ হোয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শান্তিস্থাপন করতে পারবে। আপাততঃ ভারতের সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক শান্তিলাভের একমাত্র সম্ভাবনা শক্তিশালী কোন তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব দ্বারা। এই তৃতীয়পক্ষের অবস্থান বহু দূরে এবং স্থানীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রাশিয়া হোলে নিশ্চয়ই মনে করত শাসনকর্তা ও বিচারপতিদের প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। চরম লজ্জার বিষয় যে, আমরা ঐরূপ কোন প্রয়োজন গ্রাহ্য করি না (অশিক্ষিত অপরাধীদেব তাদের অজ্ঞাত ভাষায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, নিশ্চয়ই এটা নিষ্ঠুরতার সূক্ষ্ম নিদর্শন!)। অপরদিকে হয় স্বৈরতন্ত্র না হয় সন্ত্রাসবাদ এই দুই অবস্থায় পড়ে রাশিয়ার নিজস্ব রাজনৈতিক পরিকল্পনা অবিকল এশিয়াভাবাপন্ন। আর কোন পন্থা না জানায় সে ভারতবর্ষকে কোন রাজনৈতিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করতে পারে না। নিশ্চয় এই সব ভাবনা দ্বারা তোমাকে উত্যক্ত করে তুলছি।

নিজেকে এত সুখী মনে হচ্ছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতা

কলিকাতা
৫ঠা জানুয়ারি, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস্ হ্যামণ্ড,

তোমার প্রশ্নের জবাব আমি কোনদিনই দিতে পারিনি। তোমাদের কথাই ঠিক, আমার এখানকার কাজ সাময়িকই বটে, অবশ্য একাজ হঠাৎ ছেড়ে দেব বলে ভাবিনি। যে কোন কারণেই হোক, আমার দৃঢ় প্রতীতি হচ্ছে যে, আমাদের ইংরেজ জাতির অন্তরের গভীর ভাবগুলি প্রকাশের সুযোগ আমি পাবই এবং

শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, আমার কর্ম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি আমার মহিলা বিদ্যালয়ের কথা বলছি না; তবে একাজ করতে গিয়ে আমাকে যে এদেশবাসীর অন্তরে প্রবেশ করে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য আবিষ্কার এবং তাৎপর্য বিবৃত করতে হবে, তারই কথা বলছি। এসব কথা তোমার কাছে যতটা অসম্ভব মনে হয়, আমার কাছেও ততটা-ই, কিন্তু কার্যতঃ অসম্ভব হবে না।

বাংলা ভাষায় প্রভূত রত্ন দেখতে পাচ্ছি। তোমার স্বামী এ ভাষাটা শিখলে অনুবাদ করে বেশ অর্থোপার্জন করতে পারতেন। একখানা নাটক পড়ছি। আমি বুঝতেই পারি না, কেন এসব জিনিসের কথা আগে আমরা শুনতে পাইনি। সকল দিক থেকে বিচার করলে এ নাটকখানা ইব্‌সেনের (Ibsen) ব্রাণ্ডেব (Brand) সঙ্গে তুলনীয় হোতে পারে। ইংরেজ জাতিব মধ্যে শুধু কি কর্মচারী এবং ধর্মপ্রচারকেরাই বাংলা শেখে? তাদেব মধ্যে এমন কি একজনও নেই যে এদেশের সাহিত্যের রস গ্রহণ করবার আকর্ষণ অনুভব করে? আমি একথা বিশ্বাস করিনে।

কী দেশই না এটা! এ দেশে যে সকল লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের চরিত্র বর্ণনা করে তোমায় একদিন একখানা চিঠি লিখব। এখানকার একঘেয়ে সমষ্টিবদ্ধ একান্নবর্তী পরিবার এবং নিরক্ষর মহিলা-সমাজের জীবন-পটের উপর মাঝে মাঝে ঠিক উপন্যাসেরই মতো ব্যক্তিত্বের এক একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং সে চিত্রের মধ্যে সব সময়েই পরিস্ফুট হয় ধর্মভাব। এখনও পর্যন্ত খাঁটি জড়ের পূজা যাকে বলে তেমন একটা কিছু আমার নজরে এসেছে বলে মনে হয়না, কিন্তু সবাই যখন বলছে যে ভারত পৌত্তলিকতাপূর্ণ, তখন এ-কথাটার যাথার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখব। ইতি—

তোমার
নিবেদিতা

কলিকাতা
১২ই মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড,

কাল রাত্রে একজন সন্ন্যাসী দেখা করতে আসেন। তাঁকে বলি, 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমি একবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি মঠে ফেরবার সময় সন্ধ্যা ৬টায় আমাকে বজরায় তুলে নিতে রাজী হলেন, অবশ্য যদি আমি ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে পারি। স—সঙ্গে গেলেন, রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় সঙ্গে থাকবেন বলে। সুতরাং আমরা রওনা হোয়ে রাত্রি আটটায় মঠে পৌঁছাই। স্বামীজী এক গাছতলায় ধুনীর পাশে বসেছিলেন। আমার মনে হোল, কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করার সময় উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে। তাই আমি বজরার ছাদে যেখানে কম্বল বিছিয়ে বসেছিলাম, স্বামীজীই সেখানে এলেন দেখা করতে। আমাকে দেখামাত্র স্বামীজী বললেন, 'মার্গট, কোন্ পথে সব চেয়ে কম বাধা আসবে সে সম্বন্ধে আমি বহুদিন ধরে ভেবে আসছি, এবং মনে হচ্ছে ওটা নিতান্তই ভুল। এ-কথাটা কেবল তুলনামূলকভাবেই বলা চলে। আমি অন্ততঃ ঐ সম্বন্ধে আর চিন্তা করব না। জগতের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন খাঁটি ব্যক্তির ইতিহাস। যখন কোন ব্যক্তি যথার্থ খাঁটি হবে তখন সমগ্র জগৎ তার পদানত হতে বাধ্য। আমার আদর্শ সম্পর্কে আমি আর কোন আপোষ করব না। আমাকে এবার স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে।' স্বামীজী এর দ্বারা আমাকেও কাজের স্বাধীনতা দিলেন। আর সত্যিই এটা একটা সন্ন্যাসী সঙ্ঘরূপে গড়ে উঠতে চলেছে, কতকগুলি দুর্বল চিত্ত ব্যক্তিকে সুবিধাপ্রদানের জন্য নয়।

তারপর আমরা প্লেগ সম্বন্ধে কথাবার্তা বললাম। এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছে এবং বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়ছে। কয়েকটি প্লেগ আক্রান্ত জায়গা থেকে মঠের কাছে অনুরোধ এসেছে শুশ্রূষাকাজের জন্য যেন দু-তিনটি ছেলেকে পাঠানো হয়। স্বামীজী বলছেন, স্বতঃপ্রণোদিত হোয়ে যারা এই কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে চাইছে, এ রকম দু-তিনজনকে তিনি বাংলা দেশের নানা জায়গায় পাঠাবেন। তারা জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি সঞ্চার করবে এবং সব সময় ঐ সংক্রান্ত নির্ভুল সংবাদ মঠে পাঠাবে। ছেলেদের মধ্যে একজন বলেছে, 'সর্বপ্রথম যে এই কাজে শরীর পাত করবে, সে ঐ মহৎ সেবাকার্যের স্তম্ভস্বরূপ হোয়ে থাকবে।'

আগামী ২৫শে মার্চ শনিবার আমাকে আজীবন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেবার জন্য অনুরোধ করা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হোয়ে বললেন, পূর্বদিন সকালে দুজন ব্রহ্মচারীকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেছেন।

অন্যান্য কথাব মধ্যে স্বামীজী বললেন, 'প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বরূপ আমরা এখনও জানি না। যখন সেই যুগের উদয় হবে তখন আর দেখবার প্রয়োজন থাকবে না, কোন্ পথে সবচেয়ে বাধা কম আসবে। তখন প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে মহৎ কাজ করবার। আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত বা অন্যকিছুও নয়। আমার উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।' আমি বললাম, 'স্বামীজী, আমি আপনাকে এই কাজে সাহায্য করব।' স্বামীজী বললেন, 'তা জানি।'…

তোমার
নিবেদিতা

কলিকাতা
২রা মে, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস হ্যামণ্ড,

চারিদিকে কাঁসর ও ঘণ্টা বাজছে—কারণ, এখন সন্ধ্যারতির সময়। এই সময় আমি ছাদে গিয়ে স্থির হোয়ে শুয়ে শুয়ে দেখি, এক এক করে তারাগুলি ফুটে উঠছে। যখন নেমে আসব তখন আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব। এই সময়টিকে আমি বলি 'শান্তির লগ্ন'! মনে হয় সব জটিলতা সমাধানের সময়। কিন্তু আজ রাত্রে আমাকে নীচে নামতে হবে, কাজেই শুতে যাবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সন্ধ্যারতির অর্থ এই যে, আলো জ্বালবার সময় হয়েছে। এখনি ভৃত্যরা আলোগুলি জ্বেলে আনবে, অন্তঃপুরে মহিলারা কোন পট অথবা গৃহদেবতার মূর্তির সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করবেন। সারদাদেবীর বাড়িতে—যাকে সন্ন্যাসিনীদের মঠ বলা চলে—এখন সবাই ধ্যানে বসেন। ঘণ্টাখানেক অথবা দু-ঘণ্টা ধরে মহিলারা নিঃশব্দে মালা জপ করছেন দেখতে পাবে। আর শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে যে তাঁর কাছে বসে থাকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি এখন ঐসব চেষ্টা করছি না। স্কুলের কাজ ছাড়া আমার হাতে এখন অনেক লেখার কাজ জমে আছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার (sanitation) বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি কাজ তো আছেই। ইংলণ্ডের মতোই এখানেও মনে হয়, সময় এত অল্প!

ধ্যান করতে শেখাবার সময় স্বামীজী ঈশ্বরের নাম এবং সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন, যতক্ষণ না আমাদের মন অন্তর্মুখী হোত। আমার মনে হয়, কখন কখন কোন একটি কথার মধ্য দিয়ে এক ঝলক আলো মনকে তন্ময় করে দিতে পারে। কিন্তু সব সময় আমি ভাবি এসব বিষয়ে আগে থাকতে

মতলব আঁটা কোন কাজের নয়। ঐ অবস্থা চাইলেই কি আসে? জানি না।···ইতি

তোমাদের
নিবেদিতা

অ্যান আরবর
৩রা জানুয়ারি, ১৯০০

স্বামী বিবেকানন্দ সমীপেষু,

গতরাত্রে আপনার প্রেরিত আমার জন্মদিনের কবিতাটি পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি যাই বলি না কেন, সবই কেমন গতানুগতিক শোনাবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি আপনাব সুন্দর ইচ্ছাটি ফলবতী হয় তবে আমার হৃদয় ভেঙে যাবে।

এখানে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে একমত—'চিনি হোতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' এমন কি, ভগবানকেও কোনভাবে জানতে চাই না, যে চিন্তা আমাব পিতাকে পাওয়ার বহু উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করবে না, তেমন কোন বিষয় চিন্তা কবাও আমার পক্ষে হাস্যকর।

আমি জানি, গুরুকে চিন্তা করবার তত প্রয়োজন নেই—বিশেষ ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর গুরু লীন হোয়ে যান। কিন্তু গুরু-সান্নিধ্যের আনন্দ মহত্তর এই আশ্বাস ব্যতীত তেমন মুহূর্তেও আমি পরমানন্দ অনুভবের কথা ভাবতে পারি না।

আমি যেন অসম্ভব কথা বলবার ও যা চিন্তার বিষয় হোতে পারে না এমন কোন চিন্তা করবার চেষ্টা করছি—তবে আপনি ভাল করেই জানেন, আমি কী বলতে বা কোন্ ভাব প্রকাশ করতে চাইছি।

আগে ভাবতাম আমি ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই—আরও সব সুন্দর সুন্দর নৈর্ব্যক্তিক ধারণা পোষণ করতাম—এখন ঐ সব আদর্শের উচ্চশিখর থেকে নিশ্চিতভাবে অবতরণ করেছি এবং বর্তমানে আমি যে সব কাজ করতে চাই সে কেবল পিতার অভিপ্রায় বলে।

এমন কি, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও যেন একটা প্রতিদান চাওয়া। আচার্যদেব, আমি চিরকাল শুধু সেবার জন্যই সেবা করতে ব্যাকুল—একটা তুচ্ছ দীনহীন জীবনের জন্য নয়।

আর একটি বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে জানি এবং ঠিক সময়ে জানা প্রয়োজনও, তা হোল অচিরেই আপনি সহস্র সহস্র সন্তান লাভ করবেন যারা আরও মহৎ, আরও যোগ্য এবং তারা আপনাকে আমার চেয়ে অনন্তগুণ বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে।[১] ইতি—

আপনার কন্যা
মার্গট

নরওয়ে
১৯শে জুলাই, ১৯০১

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড,

এখানে নরওয়ে আমি একলা রয়েছি। তুমি জাপানের যে কাগজপত্র পাঠিয়েছিলে তা পড়ে অগাধ আনন্দ পেয়েছি।...তোমার সম্বন্ধে উল্লেখ দেখে খুব ভাল লেগেছে। এর থেকে বোঝা যায়, জাপানীরাও সহানুভূতি চায়।...আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে আমেরিকা, নরওয়ে এবং এখন কিছুটা জাপানের কাছ থেকেও

১ স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আশীর্বাণীপূর্ণ একটি কবিতা প্রেরণ করেন। পত্রখানি তার উত্তরে লিখিত।

এ-কথা শুনে যথেষ্ট সাহস লাভ করেছি যে, আমি জাতীয় আদর্শ যথাযথ ব্যক্ত করতে পেরেছি। নিশ্চয়ই আমি স্বামীজীর কাছ থেকে কিছু খাঁটি জিনিস পেয়েছি, না হোলে এটা হোতে পারত না।

এখন ভারত সম্পর্কে তুমি কি এটা অতিশয়োক্তি মনে করবে যদি আমি বলি যে, আমি এখন এমন কিছু আয়ত্ত করেছি বলে অনুভব করছি, যা এ পর্যন্ত কেউ করেনি ? হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যখন স্বামীজীর লেখা পড়ি, তখন তার বিশালতা আমাকে স্তম্ভিত করে ; কিন্তু তারপর সামলে নিয়ে ভাবি, এই মুহূর্তে ভারতের পক্ষে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—অদূরপ্রসারী তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও স্পষ্ট আকুল আহ্বান —হয়তো স্বামীজীর জ্ঞানের বিপুলতাই তার অন্তরায়। হয়তো আমার অজ্ঞতা, গভীরতার অভাবই আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। অবশ্য স্বামীজীর বাণীই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বকালোপযোগী তা কি আমি ভাবি না ? খুব ভাবি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, এ বাণী এত বিরাট যে, একপুরুষে তার ধারণা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডে এই 'বোস ওয়ার'[১] ব্যক্তিগত ও সাধারণ অবনতির রূপ স্পষ্ট করে তুলেছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যদি তিনি এ সময়ে ইংলণ্ডে থাকতেন, অনেক কিছুই করতেন—না করে থাকতে পারতেন না। কিন্তু ইংলণ্ডের কথা বলতে গেলে মনে হয়, ইংলণ্ড অথবা তার মধ্যে যা কিছু মহত্ত্ব ছিল অন্ততঃ সেটা ধ্বংস হোয়ে গেছে। কোনদিন একটা বিরাট জাতির ওপরের দিকে এই ধরনের অসার অতি বুদ্ধিমান (?) লোক ছিল না। এর চেয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের খাঁটি বিশ্বস্ততা ও সাধাসিধেভাব বহুগুণে ভাল।

---

১ সরকারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সংগ্রামকে নিবেদিতা 'বোস ওয়ার' (Bose war) বলে অভিহিত করতেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন সম্পর্কে এখানে একখানা বই আছে। তাতে জনসন নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। যখন তিনি Nashville অবরোধ করেছিলেন তখন তাঁর এক সহকর্মী সমস্ত সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবার সংকল্প করেন। জনসন তখন বলে উঠেছিলেন, 'আমি ধার্মিক নই, কিন্তু আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বাইবেলে আমার বিশ্বাস আছে এবং Nashville যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে আমি নরকে যাব।' ভেবে দেখ কী ধরনের লোক? ভারতবর্ষে যদি কয়েকজনও এরকম লোক থাকত? যাক্ আমাদের এখন চেষ্টা করে যেতে হবে। আমি বিশেষ করে পুণায় যেতে চাই, সুবিধা হোলে রামাবাঈএর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমি তোমাকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলছি যে গভর্নমেণ্ট ভারতের জন্য যাই করুক না কেন, তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার মতে কোন কাজ যতই উৎকৃষ্ট বলে মনে হোক, যদি তা দেশের লোকের দ্বারা না হোয়ে থাকে, তো তার ফল মন্দই হয়। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, এক সময় ব্যক্তির পক্ষে যেটা সত্য বলে মনে হয়েছিল, একটা জাতির পক্ষেও তাই সত্য। শিশুকে অঙ্কন বিদ্যা শেখাবার জন্য অনেক চিত্রকর নিযুক্ত করতে পার এবং তারা হয়তো শিশুর আঁকা ছবিটিকে তুলি বুলিয়ে চমৎকার করে দিতে পারে; কিন্তু শিশুর নিজের হাতে আঁকা সামান্য হিজিবিজির মূল্য এই রকম হাজার হাজার ছবির চেয়ে অনেক বেশী। যে-কোন দেশের পক্ষেও একই কথা। তারা নিজেরা যেভাবে গড়ে ওঠে, তাই ভাল। আর তাদের জন্য যা কিছু করে দেওয়া হয়, সবই রঙচঙে সাজানো জিনিস।

ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না। আমি কেবল শিখছি। চারাগাছটি কেমন করে বেড়ে ওঠে, তাই দেখবার চেষ্টা করছি। যখন সেটি ঠিকভাবে বুঝতে পারব, তখন জানব যে, বড়জোর ওটিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ভারতবর্ষ স্বাধ্যায়ে

মগ্ন ছিল। একদল দস্যু এসে আক্রমণ করে তার জমি-জারাত ধ্বংস করলে। তার চট্‌কা ভাঙল। দস্যুর দল তাকে কিছু শেখাতে পারে কি? না, ভারতবর্ষকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে, ফিরে যেতে হবে স্বস্থানে। মনে হয়, এই ধরনের একটা কিছু করাই হবে ভারতের পক্ষে যথার্থ কার্যসূচী। তাই যতদিন পর্যন্ত সরকার বিদেশী, খৃষ্টানদের সঙ্গে ও ঐ সরকারের দালালদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। ভারতের পক্ষে যা কিছু ভারতীয়, তা যতই অর্থহীন ও তুচ্ছ হোক, আমার কাছে নমস্য। আর যা কিছু, যদি একটু ভাল করে, মন্দ করবে অনেক বেশী, এবং তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। হাঁ, আমাব পথও কিছু ক্ষতি করবে, কিন্তু দেশের লোকদেব পক্ষে হবে প্রাণের জিনিস। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাদেরই নিজস্ব জিনিস হবে, অন্য কারও চাপানো নয়। এ ধরনের ক্ষতি আমি গ্রাহ্য করি না। তাদের এ ক্ষতির প্রয়োজন আছে।

ভারত, হে ভারত, আমার স্বজাতি তোমার যে মর্মান্তিক ক্ষতি করেছে, কে তার প্রতিকার করবে? তোমার যারা শ্রেষ্ঠ সন্তান, যারা সর্বাপেক্ষা সাহসী এবং তীক্ষ্ণ স্নায়ুবিশিষ্ট তাদের উপর এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উৎকট অপমান বর্ষিত হচ্ছে, কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে?

ইংলণ্ডে বসে ভারতের জন্য কিছু করার প্রচেষ্টা কী মূর্খতা বলে এখন মনে হয়, তা তোমাকে বলে উঠতে পারব না। সময়ের কি প্রচণ্ড অপব্যয়। তোমার কি মনে হয়, ক্ষুধার্ত নেকড়েকে শিশুর মতো শান্ত-শিষ্ট করা যায়? ছোট খুকীর মতো নম্র-মধুর করে তোলা যায় তাদের? ইংলণ্ডে বসে ভারতের জন্য কাজ করার অর্থ এই। ইংলণ্ডেও কাজের প্রয়োজন আছে এবং করা উচিত, কিন্তু সে কাজ কী ধরনের? স্বামীজী, ডক্টর বসু, মিঃ দত্তের মতো ব্যক্তির ইংলণ্ডে আসা প্রয়োজন, তাঁরাই ইংলণ্ডকে

দেখাবেন, ভারত কী এবং কী হোতে পারে। তাঁদের উচিত, লক্ষ লক্ষ বন্ধু, শিষ্য, অনুরাগীর দল সংগ্রহ করা। তারপর আজ থেকে বিশ বছর পরে, যখন এক প্রবল আঘাত হানা হবে (আমি জানি সে আঘাত আসবেই), তখন হঠাৎ ইংলণ্ডে একদল নরনারী দেখা যাবে, যারা পূর্বে নিজেদের কখনও ঐভাবে বিচার করেনি। তারা হঠাৎ জেগে উঠবে, এবং বলবে, 'তফাৎ যাও, এরা নিশ্চয় স্বাধীন হবে।'

কিন্তু এ হোল ইংলণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত, ভারতের জন্য এ কাজ নয়—বুঝলে? অন্ততঃ আমি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হইনি। ঈশ্বর করুন, যেন স্বামীজী বোঝেন যে, তিনি ঐজন্য জন্মেছেন। কিন্তু তাঁর জগতে আসার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি কি জানি? সেটা আমাদের পরিমাপের বাইরে।

ওঃ, ভারতে আমরা কত কী না চাই! কী চাই না? আমরা চাই, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা আমাদের হোয়ে আমাদের বাণী বহন করুক। আমরা চাই প্রকৃতির যে সংগঠন-শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তাকে যথাযথ কাজে লাগাতে। বৃক্ষরোপণ, শিশু-গণের শিক্ষাবিধান, ভূমিকর্ষণ, এ সব আমি ভুলে গেছি ভেব না। কিন্তু তার সঙ্গে আকুল আহ্বান, জনতার উন্মাদনা, আর প্রাণ-বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তাও চাই। আমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে হতাশ হোয়ে পড়ি; কিন্তু যখন ভাবি, এখনই যথার্থ সময়, আর আমরা নয়, স্বয়ং মহামায়া কর্মে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন আবার সাহসে বুক বাঁধি।

আমাদের কাজ হোল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, যেখানে খুশী নিয়ে যাক আমাদের। যে সব কথা জেনেছি, তার সব যেন বলতে পারি, যথা সময়ে যেন উপযুক্ত কাজ করতে পারি।

আমরা কি আশা করতে পারি যে বিফল হব না? আমার কাজ হোল নিজে দেখা ও অপরকে দেখানো। বাকী আপনিই হবে।

স্বপ্ন দেখতে পারাটাই সঙ্কটকাল। এখন হয়তো বুঝতে পারবে আমার কী মনে হয়। আমার কাছে একজন মিশনরী ঠিক সাপের মতো, যাকে পায়ের চাপে মাড়িয়ে ফেলতে হবে। যে মিশনরী যত ভাল কাজ করছে, সে তত ভয়ঙ্কর লোক—অন্ততঃ আমার কাছে তাই।

ইংরেজ কর্মচারিগণ মূর্খ, ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খেলা করছে, আর যা কিছু নিজে গড়ছে, তার জন্য ঢাক পেটাচ্ছে। দেশীয় খৃষ্টান তার স্বদেশে বিশ্বাসঘাতক। এই সকল ব্যক্তি, আরও সব ক্রীতদাস, বেতনভোগী গুপ্তচর ও ভাড়া-করা লোকদের জন্য ভারতবর্ষের সময় নেই, প্রয়োজনও দেখি না। যে কাজ তাকে রক্ষা করবে, বা ঠিক পথ দেখাবে, তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। কংগ্রেস বোকামী সত্য, এমনকি কতকটা ক্ষতিকরও; কিন্তু মিঃ টাটার পরিকল্পনা, অথবা সোরাবজীর ব্যবসার চেয়ে দশহাজার গুণ ভাল। স্বামীজীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মূলকথাটি ধরতে পেরেছেন—জাতীয় ভাবে মানুষ গঠন।

কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না, ভারত যদি একবার সচেতন হয় নিজেকে রক্ষা করবার জন্য, তাহলে সে যাকে খুশী, এখানেই হোক বা সেখানেই হোক, নিযুক্ত করতে পারে—সে বিদেশী বা খৃষ্টান যাই হোক, আসে যায় না। আপাততঃ তারা তার মুখ চেপে ধরে আফিম-মেশানো ঠাণ্ডা সরবত খাওয়াচ্ছে, আর তারই নাম দিয়েছে 'শিক্ষা'।

আশা করি, তোমার বিশাল হৃদয়ে আমার এই সব ভাবনা আশ্রয় পাবে। যদি তোমার মনে হয়, আমার সমস্তই ভুল, সবই সর্বনেশে, আমি কেবল তোমার পাদস্পর্শ করে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজের পথে যাত্রা করব। যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, তাকে আমায় রূপ দিতেই হবে।

আমি জীবনচরিত লিখেছিলাম, কাজটি অসম্ভব বিশাল। এখন

মিঃ স্টেড সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এর মধ্যে ভারতবর্ষই প্রাধান্য লাভ করেছে, বসুর (জগদীশচন্দ্র বসু) বর্ণনা অতি অল্পই আছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জীবনীটি স্বীকৃতি লাভ করবে এই আশায় আমি আগাগোড়া আবার লিখছি। আমি 'Lambs among Wolves' (নেকড়ে বাঘেদের মধ্যে ভেড়ার দল) এই নাম দিয়ে মিশনরীদের আক্রমণের এক বিস্তৃত উত্তর লিখছি। প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, যদি পত্রিকাগুলিতে এর স্থান না হয় তবে মিঃ জেন্‌স্ এটির মুদ্রণের ভার নেবেন।

এখন মিঃ দত্ত (রমেশচন্দ্র দত্ত) আমাকে যে পুস্তকখানি লিখবার ভার দিয়েছিলেন তার কাজে ব্যাপৃত, এবং এইমাত্র জাতি (caste) সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে। স্বামীজী বলেন যে, তিনি কেবল অস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি বোঝেন; আমিও দাবী করতে পারি না যে বিষয়টি প্রাঞ্জল করতে পেরেছি। তবু ঐ সম্বন্ধে স্বামীজীব বিবৃতি পাঠ করবার পূর্ব পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে বেপরোয়া দম্ভ প্রকাশ করেছি।

মিঃ গেডিজের কাজ যে আমাকে কতখানি সাহায্য করেছে বলতে পারি না। চিরদিনের মতো নীরব হোয়ে যাবার পূর্বে কতখানি কাজে লাগাতে পারব তাও জানি না। ডঃ বসুর কাজের ওপর যে আক্রমণ চলছে তাতে যথেষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ভারতের বিরাট কাজের এখনও বাকী আছে। শারীরবৃত্তবিদদের মেজাজ এত বিগড়ে গেছে যে, তারা ঠিক যেন একদল চড়ুই পাখীর মতো—এই একবার তাঁরা তাঁর আবিষ্কারের ফলাফলে আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ে পড়ছেন, আবার পর মুহূর্তে ধাতস্থ হচ্ছেন। কারণ অক্সফোর্ড থেকে বার্চ (Burch) বলছেন যে, বসু একটা পুরোণো এক্সপেরিমেণ্টের পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং সংস্পর্শের অনিশ্চয়তা থেকে (due to uncertainty of contact) একটা ফলাফল বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বার্চের মন্তব্য বসুকে জানাতে

সাহস না করলেও, বার্চ যে চিঠিটা তাঁদের লিখেছেন, তার দ্বারা দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হোয়ে এবং তাঁদের যে সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তার বলে বেচারী হিন্দুকে সোজা কলকাতায় ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও চিন্তা নেই। এভাবে ভারতবর্ষকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

ভারতীয়দের নিজস্ব সরকার যদি ঐ বিজ্ঞান কার্যের ভার গ্রহণ করত তাহলে সে ব্যবস্থা কতই না আনন্দের হোত। ঐ কাজ রক্ষা করবাব মতো উদার হৃদয় ইংরেজ জাতির নেই।

তোমাকে বলা বাহুল্য বার্চ যে বিষয়ের সম্ভাবনা চেপে রাখবার চেষ্টা করছেন, ডঃ বসু তা নিজেই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তিনি বিষয়টি প্রমাণের জন্য নতুন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থারও উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু বার্চ এইসব পরীক্ষা কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন নি।

ভালবাসা নিও। ইতি—

নিবেদিতা

কলিকাতা

১৬ই জুলাই, ১৯০২

প্রিয় মিস ম্যাকলাউড,

স্বামীজীর একখানা জীবনী লিখবার জন্য লোকে আমায় পরামর্শ দেয়। কিন্তু আমার মনে হয়, জীবনী লিখবার আগে বহু সময় অতীত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জীবনচরিত এত সরল, এত মহৎ, এত ভারতের হৃদ্‌স্পন্দন পূর্ণ এবং এত অভ্রান্তরূপে অবতারের কাহিনী হবে। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে যে কোনও সময় আমি আরম্ভ করবো। তুমি কি জান অন্তিম দৃশ্যটি আদর্শের দিক দিয়ে

কী মহিমময় হয়েছিল। এমন কি, স্বামীজীর শত্রুরাও নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। সান্ধ্য ধ্যানের শেষে জীর্ণ বস্ত্রের মতো নিঃশব্দে শরীরটিকে পরিত্যাগ করা। 'হর, হর, হর, উচ্চারণ করে মহনীয় মৃত্যুকে বরণ করাই আমার কাম্য' বহুদিন পূর্বে তাঁর মুখে শোনা এই কথা আমার মনে পড়ছে এবং তাঁর সেই কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। সমস্ত সুব্যবস্থিত রেখে সবুজ জয়মাল্য ও অম্লান ঢাল হস্তে তিনি চলে গেলেন।

আমি মনে করি, ক্ষুদ্র শিষ্য থেকে মহৎ শিষ্যকে পৃথক করবার অন্যতম লক্ষণ হোল গুরুর ব্যক্তিগত দিক অপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিক দিকটাকে বিশ্লেষণ করবার শক্তি অর্জন করা। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

যা হবার কথা ছিল তার থেকে প্রত্যেক বিষয় এখন কত বিভিন্ন, এবং আমার যে অন্যভাবে কাজ করা উচিত, সে সম্বন্ধে সাধুগণ এত নিশ্চিত। অথচ আমি যা করতে চাই তা ছেড়ে অন্যরূপ কিছু করতে পারি না। আমি যদি তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেতাম! তুমি কি জান না, মঠ এই কয়দিন শোকে ও পূজায় মগ্ন আছেন এবং পীড়ার সময় যে সব কথা বলা হয়েছিল তাদের মোহাবেশ থেকে প্রত্যেকেই অপসৃত হতে চাইছেন? এ কথার চিন্তা করেও আমি আবদ্ধ ও ভীত অনুভব করছি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের নিজেদের পথ প্রস্তুত করে নেবেন।

স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছা, আমার সংগৃহীত সমস্ত অর্থ একখণ্ড জমির ওপর শ্রীশ্রীমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণের কাজে অর্পণ করি। সুতরাং অবশ্যই আমি যা কিছু সংগ্রহ করতে পারি তাঁর হাতে দিতে চাই। আমার বার্ষিক আয়ের ওপরেও আমি কিছু জমা রাখব, কারণ বাড়ির জন্য আমার অনেক কিছু করবার আছে এবং ওটা অসমাপ্ত রাখা বিজ্ঞজনোচিত হবে না। আমি এও অনুভব করছি যে, মেয়েদের মধ্যে কাজ করবার জন্য আমাকে সামান্য কিছু

অর্থ সঞ্চিত রাখতেই হবে যদিও আমার গৃহে মেয়েদের রাখবার সম্ভাবনা আর রইল না। তারপর, যদি আমাকে কিছু কাজ করতেই হয়, তাহলে সেজন্য যাতায়াত খরচের অর্থও কিছু জোগাড় করতে হবে।

আগামী শনিবার বক্তৃতা দিতে কয়েকদিনের জন্য যশোহর যাচ্ছি। আমাদের জন্য, এবং সর্বোপরি কাজের জন্য তুমি সুস্থ হোয়ে ওঠো। এই বিশ্বাস জাগ্রত রাখতে হবে যে, এই আমাদের নির্ধারিত কর্ম, এ ছাড়া আর কিছু নেই। সর্বোচ্চ ন্যায় অনুসরণের মধ্যে বিশ্বাসের কোনও অভাব নেই বা থাকতে পারে না। ইতি—

নিবেদিতা

১৬ জুলাই, ১৯০৬
(আনুমানিক তারিখ)

প্রিয় মিসেস বুল,

হিন্দুধর্মের পৌরাণিক উপাখ্যান (Cradle Tales of Hinduism) প্রায় শেষ হয়েছে। জুলাই-এর শেষে একখানি পুস্তক ইংলণ্ডে পাঠাবার আশা রাখি। একই সময়ে যাতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আমেরিকায় ছাপাতে পারেন, তার জন্য আপনাকেও একখানি পুস্তক পাঠাব। আমরা স্থির করেছি, এই গ্রন্থের জন্য এককালে যদি একশত পাউণ্ড পাওয়া যায় এবং রয়ালটি বাবদ বই পিছু দুই সেণ্ট অথবা এক পেনি পেলে ভালই হবে।

২য়—এর পরে স্বামীজীর জীবনীটি সম্পূর্ণ করতে চাই—পরবর্তী প্রকাশন হবে 'তীর্থযাত্রীর ডায়েরী' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

৩য়—ভারতীয় জীবন ধারার (Indian Studies) উপর একটি পুস্তক লিখবার কথা ভাবছি। এগুলি হবে স্টেট্‌সম্যানে (The Statesman) প্রকাশিত রচনাবলীর অনুরূপ।

৪র্থ—আরেকখানি পুস্তক হয়তো ভারতীয় জাতীয়তার উপর (on Indian Nationality),—এখনি ঠিক বলতে পারছি না—যা 'মা কালীর কাহিনীর', (Kali Series) মতো চটি ধরনের পুস্তক হবে।

৫ম—ভারতীয় ইতিহাসের পদক্ষেপ (Footfalls of Indian History) নামে ভারতবর্ষের পৌরবিজ্ঞানের উপর একখানি পুস্তক।

৬ষ্ঠ—'শিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধমালা।

৭ম—কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ—হয়তো পাশ্চাত্য দেশীয় আদর্শের উপর। তবে এটি বোধহয় করা যাবে না। কারণ কোন জাতির কাছে অপর এক দেশ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া আমার সুবিধা হয় না; আবার সম্ভব হতেও বা পারে। যাই হোক, অবসর সময় ঐ বিষয় লিখে কাটানো যায়।

তাছাড়া আপনি জানেন, আমি ডক্টর বসুর জীবনীর জন্য খসড়া প্রস্তুত করে রেখে যেতে চাই।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে স্বামীজীর জীবনচরিত রচনাই হবে প্রধান কাজ। পঞ্চমটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর জীবনী বাদ দিয়ে তাঁর বার্তার মর্মবাণী চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ কোন্ পুস্তকের ভিতর দিয়ে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হবে—তা আমি বলতে পারি না।

আপনি জানেন, অর্থের ব্যাপারে আমি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করে যেতে চাই :

ক্রিস্টীনকে তার কাজের (ভারতীয় নারীজাতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) জন্য এক হাজার পাউণ্ড, তাছাড়া স্বামীজীর রচনাবলী থেকে আমার অংশ, আমার পুস্তকগুলি এবং প্রতিশ্রুত দু'হাজার পাউণ্ড, যদি তা কখনও আমার হাতে আসে, অথবা অনুরূপভাবে কোনও অর্থ যদি ভবিষ্যতে পাওয়া যায়—এ সবই দিতে চাই।

জাতির উদ্দেশ্যে (To the Nation) আমি এক হাজার পাউণ্ড রাখতে চাই—যার সুদ থেকে ভারতের কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক প্রাচ্যরীতিতে অঙ্কিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ কার্টুন চিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনজন ফরাসি ও মার্কিন শিল্পীকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা না যায়, অথবা একই শিল্পী একাধিকবার ঐ পুরস্কার লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, তবে প্রতি বৎসর পুরস্কার স্থগিত রাখা যেতে পারে। তবে কার্টুনটি সস্তা কাগজে ছাপার যোগ্য হওয়া চাই।

মুরল ধারায় (Mural Painting) অঙ্কিত চিত্রের আধুনিক সংস্করণ হোল সস্তা কাগজে ছাপা ছবি। একই ব্যক্তি তিনবার শ্রেষ্ঠ কার্টুন-শিল্পী বলে ঘোষিত হোলে তাঁকে অন্যতম দলনিরপেক্ষ বিচারক (Umpire) রূপে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভারতীয় ষ্টাইল বলতে আমি বুঝি য়ুরোপীয় প্রভাবিত চিত্র অপেক্ষা পুরাতন পুঁথিপত্র বা ভাস্কর্য প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত প্রাচ্য দেশীয় রীতির প্রতি অধিক প্রাধান্য দেওয়া। য়ুরোপীয় চিত্রের বেলায় প্রাগ্-র‍্যাফেল (Pre-Raphaelite) বা মধ্যযুগের Puvis de Chavannes, Boulet de Mouvel, Rossetti প্রভৃতি শিল্পিগণের রীতির অনুসরণ। আমি কেবল হাত ও চোখ দিয়ে আঁকা ছবি চাই না—আমি চাই চিত্রগুলির মধ্যে ভাব থাকবে (pictures with ideas)—যার পিছনে মস্তিষ্ক ও হৃদয় কাজ করবে।

জাতি যদি কখনও আমার নামে একটি স্মৃতি-তহবিলে (Memorial Fund) কোন অর্থ প্রদান করে তাহলে আমি চাইব যে, সে অর্থ যেন ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে অথবা যাদুঘরে রক্ষিত বৌদ্ধযুগীয় ভাস্কর্যের অনুলিপি (copy) প্রস্তুত করবার জন্য পুরস্কাররূপে ব্যয় করা হয়। বৈজ্ঞানিক (ডক্টর জে. সি. বসু)

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, একথা তিনি মনে রাখবেন এবং যথা সময়ে বলবেন। অনুলিপিগুলি যে কোন বস্তু দিয়েই করা যায়, তবে আয়তনে বিরাট হওয়া চাই।

জাতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয় আমার অতি প্রিয় স্বপ্ন। ভারতে যখন প্রাচীন শিল্পকলার পুনরুত্থান হবে তখনই তার একটি শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে উঠবার সূচনা দেখা দেবে।

বিজ্ঞান চর্চার জন্য—প্রতিশ্রুত অর্থের অবশিষ্ট তিনহাজার পাউণ্ড থাকবে। ঐ অর্থ আমার বন্ধুর হাতে থাকবে এবং তিনি প্রধানতঃ আমার অভিপ্রায় মতো দুই ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্যয় করবেন। তবে তাদের **ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার** (Indian Science) জন্য সর্বোচ্চ যোগ্যতা থাকা চাই।

আমার পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বলতে গেলে সবই স্বামীজীর। তিনিই আমাকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরই কাজের জন্য (অর্থাৎ ভারতীয় নারীর শিক্ষার জন্য) তার আয় প্রদত্ত হবে এবং সে কাজের দায়িত্ব কৃষ্টীন নিয়েছে।

আয়র্ল্যাণ্ডকে স্মরণ করতে পারলে আনন্দিত হতাম, কিন্তু সে কাজ আমার নয়। কৃষ্টীনের যদি ইচ্ছা হয় তবে সে সামান্য অর্থ তার জন্য রাখতে পারে। কিন্তু ঐজাতীয় কাজ অপরের অভিপ্রায় ও বিবেচনা অনুযায়ী হবে, আমার নয়।

আশাকরি আপনি এইসব পরিকল্পনা সমর্থন করবেন। ইতিমধ্যে আমি যে বিশেষ কিছু উপার্জন করতে পারব সে ভরসা করি না। যদিও আপনি সে বিষয়ে অন্য মত পোষণ করলে সুখীই হব। এইজন্য আমি সত্যই ভেবেছিলাম, আমাকে ভিক্ষা করে, বক্তৃতা দিয়ে একটি তহবিল গঠনের চেষ্টা করতে হবে। ইতি—

আপনার
মার্গট

পুনশ্চ,—আপনি নিজগৃহে পৌঁছে আনন্দিত হয়েছেন জেনে খুবই কৃতজ্ঞ। কথাটা খুব সত্যি নয় কি? যদিও প্রায় অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাত থাকে তবুও জন্মভূমি, মাতৃভূমির জন্য যে গভীর আবেগ—কখনো কোলাহলময়, কখনো শেষের সেই মধুর শান্ত মুহূর্ত, এগুলিই জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের অন্যতম। আপনিও এটা অনুভব করছেন। কিন্তু আত্মিক দৃষ্টিতে নরওয়ে (Norway) বোধ হয় আপনার স্বদেশ। যদিও ত্রিশ বৎসর বয়সে, অনন্ত গুণে বেশী আপনার আর এক জগতে আমার জন্মান্তর ঘটেছে, তবু আমিও ডিভনশায়ার ও আয়র্ল্যাণ্ডের 'প্রিমরোজ ফুল' দেখবার আকুলতার মধ্যে সেই আবেগ অনুভব করি। একথাও সত্য, যেখানে জীবন সঙ্গীতের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার সেই মূল সুরটি সর্বদা ধ্বনিত হয় না, সে সঙ্গীত সত্য, সুমিষ্ট ও যথার্থ হতে পারে না।

নিবেদিতা

c/o শ্রীমতী ওলি বুল
স্টুডিও হাউস, ১৬৮ ব্রেটল
কেম্ব্রিজ মাস
২৭ শে অক্টোবর, ১৯০৮

প্রিয় পিসী মেরী,

১৫ই মে তারিখে লেখা আপনার সুন্দর, সুদীর্ঘ পত্রখানির এতদিন উত্তর দেওয়া হয় নি।...

স্বামীজী সম্বন্ধে যে বিবরণ আমি লিখতে শুরু করেছিলাম তা প্রায় শেষ করে এনেছি। আশা করছি, বড়দিনের পূর্বেই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত সমাপ্ত হবে। এই কাজ শেষ হয়ে গেলে দিন-পঞ্জী (Diaries) ও চিঠিপত্র থেকে কিছু বিবরণ ও তাঁর

(স্বামীজীর) রচনাবলীর মায়াবতী সংস্করণের জন্য কিছু জীবনী-মূলক তথ্য ভারতবর্ষে ছাপাবার আশা রাখি। তাহলেই মনে হয় আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা শেষ হবে। তবে আমি আশা করি এই তিনটি কাজের অনুমতি পাব। বর্তমানে আমি শ্রীমতী লেগেটের অনুরোধে ও মঠের অনুমতিক্রমে তাঁর কিছু চিঠিপত্র সংগ্রহ করছি ছাপানোর উদ্দেশ্যে। য়ুম (Yum)কে অনুগ্রহ করে আপনি যে কয়েকখানি চিঠি দিয়েছিলেন তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতাংশ এই পত্রাবলীর মধ্যে থাকবে। প্রথমবার ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ থেকে চলে যাবার পূর্বে তিনি আপনাদের চার জনকে যে অপূর্ব পত্রখানি লিখেছিলেন—সেই পত্রখানি সম্পূর্ণ অথবা তার কিছু অংশ—যদি আমাকে দিতে পারেন, তাহলে বড়ই কৃতজ্ঞ হব।

আপনাকে বলা উচিত যে, আমি পত্রে কখনও নাম বা ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করি না, বরং কেটে বাদ দেবার ব্যাপারে আমি নির্মম। কিন্তু আপনার কাছে লেখা পত্রগুলিতে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন সবচেয়ে বেশী। ঐগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পত্র বলে আমি পেতে চাইছি। একখানি মাত্র পত্র তার ব্যতিক্রম। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে ১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে য়ুমকে লেখা তাঁর পত্রখানি হোল ঐ ব্যতিক্রম—সে যেন সমাধিমগ্ন ব্যক্তির কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ আরও বেশী কিছু আমাকে দিতে পারেন, আর আমার এই চাওয়াটা যদি অতিরিক্ত লোভ বলে মনে না করেন তবে বড় কৃতজ্ঞ হব।

যে প্রস্তর থেকে ছাঁচ নিয়ে (Lithographical) স্বামীজীর ছবি তোলা হয়েছিল শ্রীমতী হেলের মাধ্যমে যদি সেই প্রস্তরখণ্ডটি আমরা খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে মঠের কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞ হবেন। আপনি যখন ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ একেবারে ছেড়ে চলে যান, তখন আমাকে বিজ্ঞাপনের চল্লিশখানি অনুলিপি দিয়েছিলেন—

ঐগুলি শত শত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডটি যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবে তার মূল্য অনেক।

ইসাবেলের মৃত্যু সংবাদে আমি বিশেষ দুঃখিত। ইংলণ্ড আসার পূর্বে আমি এ-সম্বন্ধে কিছু শুনিনি। আমি নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, সংবাদটি এত অপ্রত্যাশিত।

হ্যারিয়েটদ্বয় ও আপনার জননীকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আপনাদের সঙ্গে যে সুন্দর দিনগুলি কাটিয়েছিলাম তা কখনই ভুলতে পারিনি। ১৮৯৯-১৯০০ সালে আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে কত ভাল, সদয় ও মধুর ব্যবহার করেছেন তাও ভুলে যাইনি। ইচ্ছা করে আবার আপনাদের সঙ্গে মিলিত হই। নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কথা বলবার থাকবে।...

না, আজকাল আমি সবই (গো-মাংস ব্যতীত) খাই। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যার ফলে 'সবকিছু'র পরিবর্তন ঘটেছে।...

আগামী বসন্তকালে ভারতে ফিরে যাব বলে আশা করছি। না, বাস্তবিকই আমি মনে করি না যে, ভারতবর্ষ থেকে দূরে থেকে আমি অর্ধেক বা এক-দশমাংশও কাজে লাগি। ফিরে যাবার জন্য—আবার সেই ছোট্ট গলিতে ফিরে গিয়ে কাজে মগ্ন হওয়ার জন্য আমি একান্ত অধীর।...

প্রিয় পিসী মেরী! এ পত্রখানির উত্তর না দিয়ে বছরের পর বছর ফেলে রাখবেন না। আপনার অযোগ্য ভাইঝির উপর কৃপা করবেন। ইতি[১]

সতত আপনার অনুরক্তা
মার্গট

১ মেরী হেলকে স্বামীজী 'ভগ্নী' সম্বোধন করিতেন তাই নিবেদিতা তাঁহাকে 'aunt' অর্থাৎ পিসী বলিতেন।

৭ কেম্ব্রিজ, মাস (Mass)
১৭ই নভেম্বর, ১৯০৮

মিষ্টি মা আমার,

আজ ভোরবেলায় আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি, আর কিছু ভাবতে পারছি না—তুমি শুয়ে আছ অসুস্থ শরীরে মিন্-এর বাড়িতে। তোমাদের ওখানে এখন হয়তো বেলা এগারোটা। মাগো, যদি শুধু একটিবার তোমাকে কোলে তুলে নিতে পারতাম, তোমাকে আরাম দিতে পারতাম! ছোট্ট মা আমার, ভগবান যে সব জায়গা জুড়ে আছেন। তিনিই তো সব বন্ধন মোচন করবেন, সহজ করে দেবেন তোমার চলার পথ! আহা, আমার ছোট্ট মা বেচারী! যদি শুধু যন্ত্রণাটুকু তোমার না থাকত! আবার আমার ইচ্ছে করছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর উদ্যান-বাটীতে একত্র বাসের সেই বিচিত্র কাহিনী তোমাকে শোনাই—যে কাহিনী শুনে মানুষ বুঝতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরই বস্তুতঃ সব হয়েছেন—আমরা তা মানি অথবা না-ই মানি। মাগো, তাঁরা তোমায় কত না সাহায্য করতেন্! শুধু একটু স্পর্শ, এক পলকের চাহনি—একটিবার মাত্র দর্শন—তাতেই তোমার সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত, আর তুমি পেতে শান্তি, শুধুই শান্তি আর অতল আনন্দ।

প্রিয় মা, আমাদের মধ্যে কেবল প্রেমই একমাত্র সত্য। ধন্য, ধন্য, মা, তুমি ধন্য, তোমাকে আমরা সবাই ভালবাসি। আর তুমি! তুমি আমাদের কত-ই না ভালবাস! কত ভালবেসেছ, কত কী করেছ, কত কষ্ট সহ্য করেছ আমাদের জন্য—এত বছর ধরে, তার জন্যে বিন্দুমাত্র অভিযোগ কখন করনি। এই ভালবাসাটুকুই সত্য, তার বাইরের প্রকাশভঙ্গী নয়। আহা, আমার চিঠিখানা যখন পৌঁছুবে তুমি হয়তো তখন যন্ত্রণায় এত কাতর যে চিঠিখানি তোমাকে পড়ে শোনানোও যাবে না। আমি সারাক্ষণ তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, শুধু প্রার্থনা আর প্রার্থনা।

তোমার ব্যথা যদি না থাকত মাগো, যদি তোমার ব্যথাটুকু আমি নিয়ে নিতে পারতাম।

বেচারী মা আমার, আমার মিষ্টি মাগো! সত্যিকারের ভালবাসা সর্বদাই শান্ত, নীরব, আর যখনই আমি প্রার্থনাকক্ষে যাই, তোমার জন্যে প্রার্থনা করি, আমার মনে কী গভীর শান্তি নেমে আসে! আমি তখন একেবারে শান্ত-নীরব হোয়ে যাই, আর সেই শান্তি আমি পাঠিয়ে দিই তোমার উদ্দেশ্যে। মিষ্টি মা আমার! ভগবান তোমাকে তাঁর ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখুন।

'এ জগৎ স্বপ্নবৎ, ভগবানই একমাত্র সত্য।'

'শিব! শিব! পার কর মেরা নেইয়া।'

তোমারই
মার্গট

কলিকাতা
২০শে জানুয়ারি, ১৯১০

প্রিয় এস. সারা,

আপনার পত্র থেকে জানতে পারলাম, আপনি পঞ্চাশ পাউণ্ড পাঠিয়েছেন। এইমাত্র ব্যাঙ্ক থেকে রসিদ পেলাম। আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আপনার বোঝা হোয়ে পড়ব, এই চিন্তায় আমি অত্যন্ত ভয় পাচ্ছি। কিন্তু ঐ অর্থের প্রয়োজন ও সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। চারিদিকে কতই না প্রয়োজন? আর আমি যত জিনিস কিনতাম, কৃষ্টীন তার চেয়ে অনেক বেশী কেনে। আমি জানি, আপনি বলবেন সে ঠিকই করছে, যথার্থ বুদ্ধির কাজ করছে। অর্থ কৃচ্ছ্রতার চেয়ে স্বাস্থ্য বড়, যদিও তা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ।

স্বামীজীর জন্মদিন এসে পড়ার পূর্বেই 'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি (The Master as I Saw Him)' বইখানি প্রকাশ করবার কাজে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বসুর জীবন চরিত আগামীকাল রাত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টি বড় কাজ শেষ হবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দ্বিতীয় জীবনচরিতটি আপনাকে নিরাশ করবে, কিন্তু যদি আপনি জানতেন, কত রকম বিভীষিকা ঠেকিয়ে চলতে হয়েছে। আমার মনে হয়, আজকালকার দিনে জীবন-চরিত লেখা হয় না। পঞ্চাশ বছর পরে মর্লের লেখা গ্লাডস্টোনের জীবনীও কেবল তথ্যমূলক গ্রন্থে পরিণত হবে। এই সব বিষয়ে বিজ্ঞানের আদর্শ সাহিত্যকে নষ্ট করেছে এবং আমরা কেবল পুঞ্জীভূত তথ্য সংগ্রহের কাজে নিজেদের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখছি। আমার মনে হয়, আমার মতো আপনিও তাঁর কাজের বিশালতা উপলব্ধি করবেন। ইতি—

নিবেদিতা

১৭, বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলিকাতা
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১০

প্রিয় এস. সারা,

স্বামীজীর জীবন চরিত সম্বন্ধে আপনার উচ্চ ধারণা ও স্নেহপূর্ণ সুন্দর পত্রখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। গতকাল ছিল স্বামীজীর জন্মতিথি। এক কপি বই তাড়াতাড়ি করে আমার জন্য তৈরী করা হয়েছিল, যাতে মঠে নিয়ে গিয়ে স্বামীজীর ঘরে সোফার উপর রাখতে পারি। আপনার জন্য আর একখানি আজ বিকালে পাব আশা করছি। লংম্যানস ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পুস্তকখানি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

আমি এ কথা জেনে সত্যই খুশী হয়েছি যে, অপর সকলে বইখানি গ্রাহ্য করে না। কারোর কাজের খোলাখুলি আলোচনা আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়; কিন্তু এই কপট বিনয়ের সঙ্গে পারা যায় না। যেহেতু তার ফলে কাজে কতটা সাফল্য হোল বা একেবারেই হোল কিনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকতে হয়। এ কথা জানতে পারলে ভাল হোত যে, তারা সত্যিকারের কোন দোষ খুঁজে পেয়েছে, না কেবল বইখানি বিশেষ উৎকৃষ্ট বলে ধারণা করতে পারছে না।

শেষোক্ত স্থলে হোতে পারে বইটি অজান্তেই সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় দৃষ্টিকোন থেকে লেখা বলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাদের গভীর জ্ঞান আছে তারাই এর সমাদর করবে। আমি অবশ্য আশা করেছিলাম, এর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা সর্বজনীন এবং যতক্ষণ বেঁচে থাকব বইটির আরও উন্নতি ও সম্প্রসারণ করতে আমি বদ্ধপরিকর।

কিন্তু আপনার ভালবাসা ও সমাদরের জন্য আমি প্রগাঢ়ভাবে কৃতজ্ঞ।

নিবেদিতা

পত্রাংশ

বোসপাড়া লেন
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯

'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' (The Master as I Saw Him) পুস্তকটির প্রকাশন ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবার জন্য স্বামী সারদানন্দ এখন ঐ গ্রন্থটি হাতে নিয়েছেন। বড়দিন বা নববর্ষে তোমাকে পুস্তকটি পাঠাবার আশা রাখি। খুব চমৎকার হবে না ? ম (কথামৃতকার শ্রীম) আমাকে তাঁর Gospel (ইংরেজি ভাষায় রচিত কথামৃত) সংশোধন করতে দিচ্ছেন। প্রত্যেক শনিবার সকালে তিনি আসেন, তাঁকে এত নম্র দেখব প্রত্যাশা করিনি। স্বামী সারদানন্দ মুদ্রণ কার্য ও বিতরণের ব্যয় বাবদ অগ্রিম অর্থ সাহায্য করছেন এবং প্রকাশনের জন্য কোন অর্থ নিচ্ছেন না। উনি বলছেন, বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে ওঁদের উপহার হবে ঐ অর্থ। আমার মনে হয়, এটি ওঁদের খুবই ভদ্রতা। আমি এখন বুঝতে আরম্ভ করেছি, প্রকাশকদের কতখানি করতে হয়।

১৭নং বোসপাড়া লেন
৩রা মার্চ, ১৯১০

আজ আমরা তোমাকে কি খবর দেব, তা তুমি কখনও অনুমান করতে পারবে না। গতকাল লেডি মিণ্টো (তদানীন্তন বড়লাট পত্নী) আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিসেস প— নামে একজন মার্কিন মহিলা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। ছোট্ট ভদ্রমহিলাটি ভারী মিষ্টি স্বভাবের, তাঁর যৌবন কাল অতিবাহিত হয়েছে বস্টনে, বর্তমানে একজন ইংরেজের সঙ্গে পরিণীতা। স্পষ্টই

বোঝা যায়, বেশ ধনী, তাই তাঁর সব কাজই বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমেরিকান মৌলিকত্ব তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান। মোট কথা এই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটেছে। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। বসু খুব স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ ইদানীং পুলিশের উপদ্রব বেড়েই চলেছিল, তাই তিনি চাইছিলেন আমরা কয়েকজন রাজকর্মচারীকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি। র‍্যাভির বন্ধু স্যার গাই ফ্লীটউড উইলসন (Sir Guy Fleetwood Wilson) ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখায় বসু উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হোয়ে উঠছিলেন। এমন সময়ে এই ব্যাপার ঘটল যার ফল অনেক বেশী কার্যকরী ও আমাদের কল্পনার অতীত। ঠিক স্বামীজীর ব্যবস্থার অনুরূপ। অবশ্য লেডি মিণ্টোর নিজের দলের লোকজনের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করা হবে না। তাঁর স্বামী (বড়লাট লর্ড মিণ্টো) অবশ্য জানেন, তা ছাড়া ঘটনাটি গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা পাড়ার মধ্যে কথাটি রটিয়ে দেব। আর তার মূল্য সর্বাধিক তা তুমি সহজেই বুঝতে পারছ।

৬ই এপ্রিল, ১৯১০

অনেক খবর আছে, কিন্তু চিঠিতে আলোচনা অসম্ভব। মধুর-স্বভাবা লেডি মিণ্টোর আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝে গত সপ্তাহে আমাকে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হোল। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে না ডেকে বাড়িতে দেখা করতে বলে বিশেষ বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বারান্দায় বসে নিরিবিলিতে আমরা তাঁর সঙ্গে চা খেলাম। তিনি অতি চমৎকার লোক। অবশ্য জানি না, তাঁর এই আচরণের সঙ্গে অন্তরের যোগ কতটুকু। তবে আমাদের আলাপ-আলোচনা বেশ চলছিল এবং আরো

চমৎকার হোত যদি না তিনি বলতেন যে, দেশী পাড়ায় বাস করা তিনি অপমানজনক বলে মনে করেন। অবশ্য কতকটা হচ্ছে মাননীয়া (মিণ্টো) মহোদয়ার বন্ধুদের দরুণ। 'লেখা চালিয়ে যান'— লেডি মিণ্টো শেষ এই কথা আমাকে বলেছিলেন।

জেনোয়া
৩০শে নভেম্বর, ১৯১০

আপনি যখন এই পত্রখানি পাবেন, তখন জন্মদিনের মধ্যে সেরা অ াদের প্রিয় ৩০শে নভেম্বর তারিখটি এসে যাবে।

অনন্তকাল ধরে ঐ দিনটি ধন্য হোক—ঐ শুভ দিনটিকে অনুসরণ করে ফিরে আসুক মাধুর্য ও পবিত্রতায় পূর্ণ আরও বহু বহু দিন। বাইরে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের খোদাই করা বিরাট প্রতিমূর্তি, তাঁর নামের নীচে শুধু লেখা আছে 'লা পাত্রে' (দি ফাদার)। আমি সেই অনাগত দিনটির কথা ভাবছিলাম, যখন ঐ কথাগুলি আপনার নামের নীচে নীরব বাণী হোয়ে থাকবে। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ইতিমধ্যেই আপনি এক হোয়ে গেছেন তাঁর সঙ্গে, এক হোয়ে গেছেন সেই সব মহৎ অভিযাত্রীদের সঙ্গে যাঁরা নিজ নিজ জাতির কল্যাণ সাধনায় অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন।

চির বিজয় লাভ করুন। জাতির সম্মুখে আপনার জীবন আলোক বর্তিকার মতো পথ দেখাক, তাদের কল্যাণে প্রদীপের মতো নিবেদিত হোক। আপনার অন্তর শান্তিতে পরিপূর্ণ হোক। আপনিই আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিক—আবিষ্কার করে চলেছেন নব নব জগৎ।[১]

১ শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত